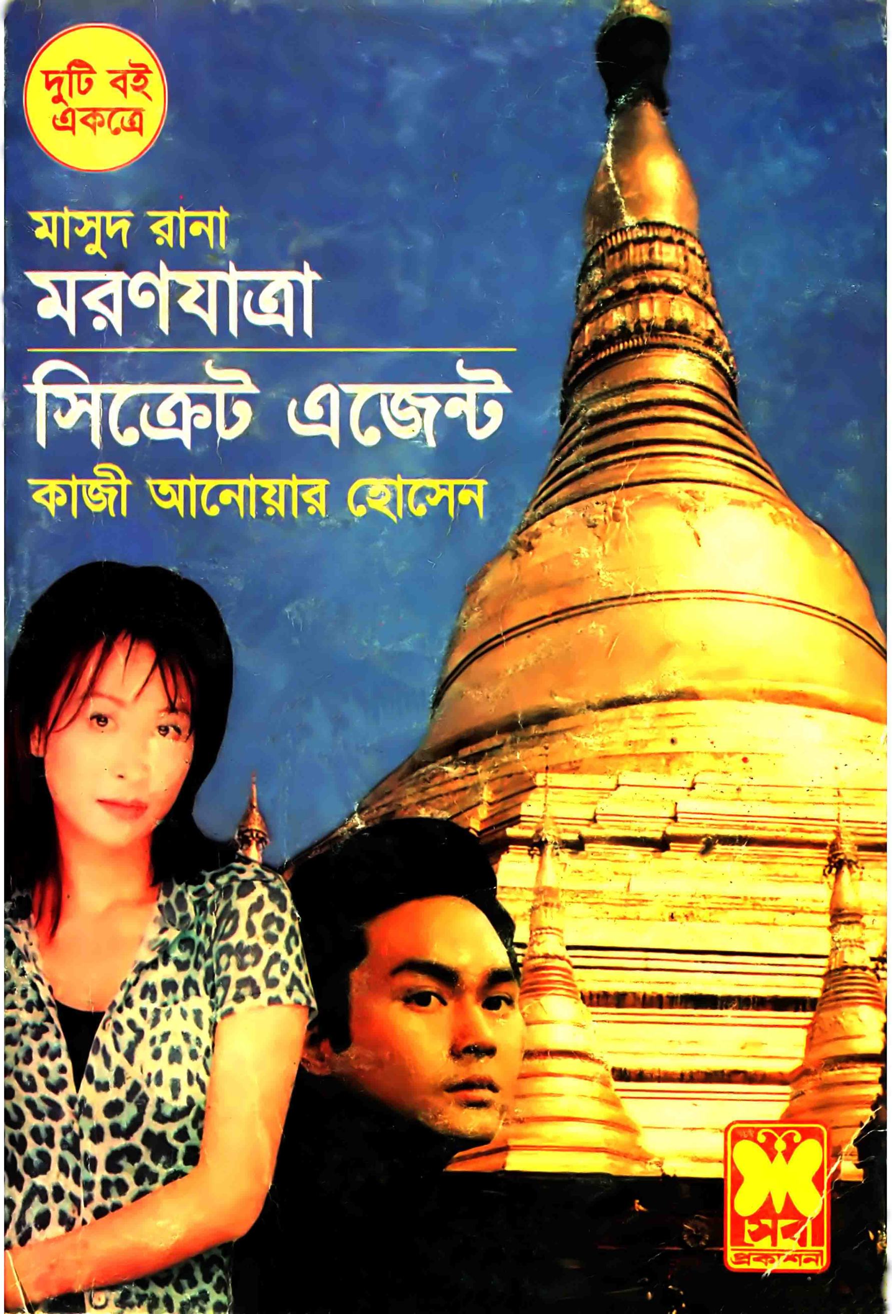
দুটি বই একত্রে

মাসুদ রানা

মরণযাত্রা

সিক্রেট এজেন্ট

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

দুটি বই একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

মরণযাত্রা

বারোশো প্যাসেঞ্জার নিয়ে জেনেভা থেকে রওনা হলো ট্রেনটা, ঊনত্রিশ ঘণ্টার যাত্রা, গন্তব্য স্টকহোম। যাত্রীদের মধ্যে এমথ্রীএক্স ভাইরাসে আক্রান্ত ইরাকী স্পাই ইব্রাহিম দানু আছে, যে ভাইরাসের কোন প্রতিষেধক নেই।
যাত্রীদের মধ্যে মাসুদ রানাও আছে। সবাই আক্রান্ত।
রানা যদি কিছু করতে না পারে, এমন কী নিজের মৃত্যুও যদি ঠেকাতে না পারে, ওকে কি দায়ী করা যাবে?

সিক্রেট এজেন্ট

পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স আইএসআই কি বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোয় নিজেদের চর বসিয়ে রেখেছে? মায়ানমারের রাজধানী ইয়াঙ্গুনে পা দিয়েই মোক্ষম একটা ফাঁদ পাতল মাসুদ রানা, তবে রানার ভুলে গেলে চলবে না যে ওদেরও একটা প্ল্যান আছে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা - ২৮৪ + ৩১২

মরণযাত্রা + সিক্রেট এজেন্ট

<u>লেখকঃ</u> কাজী আনোয়ার হোসেন

<u>কৃতজ্ঞতায়ঃ</u> শামীম ফয়সাল

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

মাসুদ রানা

মরণযাত্রা

সিক্রেট এজেন্ট

(দুটি বই একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7632 X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

১ম প্রকাশ ১৯৯৯

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M-M)
জি. পি. ও বক্স ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.anebooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
MARONJATRA
SECRET AGENT
Two Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

বিয়াল্লিশ টাকা

সস্তায় মাসুদ রানার বই: ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৪৫/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৪১/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	২৮/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৪১/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৩৮/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	২৮/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৩৭/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৪/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৩১/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩২/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	২৭/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	২৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৩৫/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৩০/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৪/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪০/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৩৫/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৪৪/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৬১-৬২	আক্রমণ (একত্রে)	৪১/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৪৫/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪০/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা (একত্রে)	৪০/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৫৮/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৩৬/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-

১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৪১/
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৩৫/
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪২/
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৪/
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৫২/
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৪/
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২	৩৪/
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ (একত্রে)	৩৯/
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৫/
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩১/
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪০/
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২	৫০/
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৪৬/
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৩৭/
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২	৩৮/
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৩৭/
১৯৫-১৯৬	ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ (একত্রে)	৩৬/
১৯৭-১৯৮	তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/
১৯৯-২০০	ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/
২০১-২০২	আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৩৯/
২০৩-২০৪	অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/
২০৫-২০৬-২০৭	জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/
২০৮-২০৯	সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/
২১০-২১১	গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৭/
২১৭-২১৮	অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/
২১৯-২২০	দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/
২২১-২২২	কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/
২২৩-২২৪	কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/
২২৫-২২৬	নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/
২৩৪-২৩৫	অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/
২৩৬-২৩৭	ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/
২৩৮-২৩৯	নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/
২৪০-২৪১	সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৪/
২৫৮-২৬৫	রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/
২৭০-২[illegible]	অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৭/
২৭২-২৭৩	মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৬/
২৭৯-২৮২	মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৪৭/
২৮১-২৭৭	আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪২/
২৮৩-২৮৮	দুর্গম গিরি+ভূকম্পের ত্রাস	৩৮/
২৯২-২৯৮	রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/
২৯৯-২৭৮	কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪০/

মরণযাত্রা

প্রথম প্রকাশ:১৯৯৯

এক

লেক জেনেভার উত্তর পাড়ের দুই বর্গমাইল জঙ্গল কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, ভেতরে নিরীহদর্শন দু'তলা একটা বিল্ডিং আছে, মাথায় একই সাইনবোর্ডে ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও ইংরেজিতে লেখা: 'ন্যাটো'স অ্যান্টিডোট রিসার্চ সেন্টার'। যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করার দু'বছর পর এই রিসার্চ সেন্টার খোলা হয়, বলা হয় গালফ ওঅর সিনড্রোম-এর কারণ আবিষ্কার ও প্রতিকার বিধানই এর মূল উদ্দেশ্য। কাঁটাতারের বেড়ার গায়েও সাইনবোর্ড আছে, তাতে লেখা–'বিপজ্জনক এলাকা, দূরে সরে থাকুন'।

আমেরিকানদের কাছে গালফ ওঅর সিনড্রোম আজও একটা বিরাট রহস্য হয়ে রয়েছে। কুয়েত সীমান্ত ও ইরাকের মূল ভূখণ্ড থেকে যুদ্ধ শেষ করে দেশে ফিরে আসার পর সৈনিকরা অদ্ভুত এক অবসাদে আক্রান্ত হয়। সংখ্যায় তারা খুব কম হওয়ায় প্রথমে ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। কিন্তু দিনে দিনে এদের সংখ্যা বাড়তে থাকায় একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো। কমিটি গোপন রিপোর্ট পেশ করল পেন্টাগন আর ন্যাটোর সদর দফতরে। তাতে বলা হলো, ইরাক আক্রমণে ন্যাটোর যে-সব সদস্য রাষ্ট্রের আর্মি ও এয়ার ফোর্সের লোকজন অংশগ্রহণ করেছিল তারা প্রায় সবাই এই অদ্ভুত রহস্যময় রোগে আক্রান্ত হয়েছে। রোগের লক্ষণগুলো এরকম: অসম্ভব ক্লান্তিবোধ, সারাক্ষণ বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরা, ক্ষুধামান্দ্যা, রোগ-প্রতিরোধ শক্তি কমে যাওয়া, চুল পড়ে যাওয়া, ঘুম কম হওয়া, ঘুমালে দুঃস্বপ্ন দেখা ইত্যাদি। কমিটিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখার বিশেষজ্ঞরা ছিলেন, তাঁরা আক্রান্ত লোকজনকে পরীক্ষা করে কোন রকম বিষাক্ত কেমিকেল বা ভাইরাস খুঁজে পাননি, অথচ রিপোর্টের উপসংহারে মন্তব্য করলেন, কুয়েত সীমান্ত থেকে পিছু হটার সময় ইরাকীরা নিশ্চয়ই এমন কোন ধরনের কেমিকেল বা বায়োলজিক্যাল পদার্থ ফেলে আসে যার দ্বারা আক্রান্ত হয় ন্যাটোর আর্মি ও এয়ার ফোর্সের সদস্যরা। তাদের সন্দেহ, এ এমন একটা বিষ বা ভাইরাস, মানব শরীরে সংক্রমিত হবার পর দৃশ্যমান কোন প্রতিক্রিয়া হয় না, এবং দু'তিনদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক নিষ্কাশন পথ দিয়ে নিঃশেষে সব বেরিয়ে যায়। সেজন্যেই অনেক দেরিতে শুরু করা প্যাথলজিক্যাল টেস্টে কিছু ধরা পড়ছে না। বিষ বা ভাইরাস শরীর থেকে বেরিয়ে গেলেও, ইমিউন সিস্টেমে ক্ষতিসাধনের যে প্রক্রিয়া শুরু করে গেছে তা থেমে থাকেনি, ফলে রোগী ক্রমশ আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে, তার রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, কেউ কেউ মৃত্যুর কোলেও ঢলে পড়ছে। কমিটির সব ক'জন বিশেষজ্ঞ এই ধারণার সঙ্গে একমত হতে পারেননি, তাঁদের কেউ কেউ এই রোগের জন্যে দায়ী করেছেন এক ধরনের

মানসিক বিপর্যয়কে। তবে প্রথম ধারণাটাই পেন্টাগন আর ন্যাটো মহলে জনপ্রিয়তা পায়। তারই ফলশ্রুতিতে জেনেভায় ন্যাটোর অ্যান্টিডোট রিসার্চ সেন্টার খোলা হয়েছে। তবে এনএআরসি আসলে স্রেফ একটা ভাঁওতা বা লোক দেখানো ব্যাপার মাত্র। নাটের গুরু যুক্তরাষ্ট্রের আসল উদ্দেশ্য হলো ইরাকের ওপর পাল্টা আঘাত হানা, প্রতিশোধ গ্রহণ। রিসার্চ সেন্টারের সাইনবোর্ডে যা-ই লেখা থাকুক, এখানে প্রতিষেধক তৈরিটাকে প্রায় কোন গুরুত্বই দেয়া হয়নি। গুরুত্ব দেয়া হয়েছে মারাত্মক এক ধরনের ভাইরাস তৈরির ওপর। সেই ভাইরাসের নাম মাল্টিপল্ এক্সএক্সএক্স।

এমথ্রীএক্স ভাইরাসের একটা ইতিহাস আছে, সেটা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি ভয়াবহ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে প্রথম এটা তৈরি করেছিল জার্মানীর ইহুদি বিজ্ঞানীরা সুরক্ষিত গোপন একটা ল্যাবে। তৈরি করতে পারলেও, নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। ল্যাবের ভেতর ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ায় বিজ্ঞানী ও গবেষক-কর্মীরা সবাই মারা যায়। ইউরোপের সৌভাগ্যই বলতে হবে, কর্তৃপক্ষ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে সময়ক্ষেপণ না করে পেট্রল ঢেলে গোটা ল্যাব ও আশপাশের কয়েকটা বিল্ডিঙ পুড়িয়ে ফেলে, থিসিসটা সহ। পরে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল, তাতে বলা হয় এমথ্রীএক্স-এর ক্ষতি করার প্রবণতা এত বহুমুখী এবং এত দ্রুতগতিতে বংশবৃদ্ধি ঘটায়, কোন কারণে ল্যাবটা পুড়িয়ে ফেলতে দেরি করলে এক হপ্তার মধ্যে গোটা ইউরোপ 'নো ম্যান'স ল্যান্ড'-এ পরিণত হত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার সময় হিটলারের খুব ইচ্ছে হলো আবার ভাইরাসটা তৈরি করা হোক, কারণ ব্রিটেনকে জনবসতিহীন একটা দ্বীপে পরিণত করতে হলে এটা তাঁর দরকার। তাঁর নির্দেশে নির্জন পাহাড়ী এলাকায় একটা গবেষণাগার তৈরি করা হলো। বন্দী ইহুদি বিজ্ঞানীদের নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে, বলা হলো হয় এমথ্রীএক্স তৈরি করতে সফল হও, নয়তো গুলি খেয়ে মরো। বিজ্ঞানী আর প্রহরীদের অক্সিজেন মাক্স ও রাবারের নিশ্ছিদ্র সুট দেয়া হলো, ভাইরাস আবিষ্কার সম্ভব হলে তারা যাতে সংক্রমিত না হয়। সময় বেঁধে দেয়া হলো তিন মাস।

ইহুদি বিজ্ঞানীরা এমথ্রীএক্স তৈরিতে সফল হলেন, কিন্তু অক্সিজেন মাক্স বা রাবার সুট তাঁদেরকে রক্ষা করতে পারল না। আক্রান্তদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সময় বেঁচে ছিল একজন জার্মান গার্ড—আটচল্লিশ ঘণ্টা। এমথ্রীএক্স ল্যাবের আশপাশে জঙ্গল ঢাকা পাহাড়ের একবর্গ মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে সময় নেয় মাত্র কয়েক ঘণ্টা। ভাইরাস নিশ্চিহ্ন করার জন্যে জঙ্গলেও আগুন ধরানো হয়।

জার্মানরা দু'বার ব্যর্থ হলো। কিন্তু তাতে উৎসাহ না হারিয়ে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের সময় পেন্টাগন আমেরিকায় এমথ্রীএক্স তৈরির সিদ্ধান্ত নিল। ইতিমধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক-এর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, পেনিসিলিনের সাহায্যে প্রায় সব ধরনের ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলা যায়। ভাইরাস-প্রুফ প্রোটেকটিভ সুটও বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। সিলিন্ডার থেকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন পাবার পদ্ধতিরও অনেক উন্নতি ঘটেছে। সবচেয়ে যেটা আশার কথা, হসপিটাল বা ল্যাবকে জীবাণু-মুক্ত রাখার কৌশল মানুষের আয়ত্তের মধ্যে চলে এসেছে। এত সব আধুনিক সুযোগ-সুবিধে থাকা সত্ত্বেও আমেরিকানরা সরাসরি এমথ্রীএক্স তৈরি করার ঝুঁকির মধ্যে গেল না,

তারা প্রথমে জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিং ও কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন ভাইরাস তৈরি করল, তারপর অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে দেখল সেগুলোকে মারা যায় কিনা। সময় লাগলেও, নতুন আবিষ্কৃত প্রতিটি ভাইরাসকে দমন করার প্রতিষেধক খুঁজে পেল তারা। যখন দেখা গেল সম্ভাব্য যে-কোন ভাইরাসের প্রতিষেধক তাদের কাছে আছে, শুধু তখনই এমথ্রীএক্স ভাইরাস তৈরির কাজে হাত দেয়া হলো।

এমথ্রীএক্স-এর থিসিস বা ফর্মুলা তৈরি করেন জার্মানীর ইহুদি বিজ্ঞানীরা, তবে সেটা পুড়িয়ে ফেলা হয়। পুড়িয়ে ফেলা হলেও ইহুদি বিজ্ঞানীদের অনেকেই ফর্মুলাটা মুখস্থ করে রেখে ছিলেন, ফলে হিটলারের নির্দেশ পালনে সমর্থ হন তাঁরা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানী হেরে গেল, ইহুদি বিজ্ঞানী যে-ক'জন বেঁচে ছিলেন তাঁদেরকে মুক্ত করে নিয়ে আসা হলো আমেরিকায়। তাদের মধ্যে অন্তত একজন বিজ্ঞানী ছিলেন, যিনি দীর্ঘ ফর্মুলাটা মুখস্থ বলতে পারতেন। বলাই বাহুল্য, পেন্টাগন কর্তৃপক্ষ তাঁকেই এমথ্রীএক্স তৈরির দায়িত্ব দিয়েছিল।

সব রকম সতর্কতামূলক ও সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও পেন্টাগনের ল্যাবে এমথ্রীএক্সকে বেশিক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। ল্যাবের ভেতর বিশেষ ধরনের অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করা হয়, বিজ্ঞানীদের পরনে ছিল অত্যাধুনিক প্রোটেকটিভ সুট, অথচ তারপরও মাত্র ছ'ঘণ্টা সংক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়। ল্যাবটায় কাজ করছিল বিশজন বিজ্ঞানী ও সহকারী, আরও ত্রিশজনের মত ছিল গার্ড, সবাই তারা শেষ পর্যন্ত মারা যায়। প্রজেক্টটা ব্যর্থ হলেও, এক্সপেরিমেন্টটা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পায় পেন্টাগন। ল্যাবে কি ঘটছে তা বাইরে থেকে সারাক্ষণ মনিটর করা হচ্ছিল, ফলে ল্যাব ও লাশগুলো পুড়িয়ে ফেলার আগে পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সবই রেকর্ড করে রাখা হয়। সেই রেকর্ড থেকে এক্সপেরিমেন্ট ব্যর্থ হবার কারণগুলোও সনাক্ত করা সম্ভব হয়। তবে ভাইরাসটার ভয়াবহতার কথা মনে রেখে পেন্টাগন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আর কোন গবেষণা না চালাবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এত বছর পর, গালফ ওঅর সিনড্রোম-এর রহস্য ভেদ করতে না পেরে, ইরাকের ওপর এমন খেপাই খেপেছে পেন্টাগন, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে নতুন করে এমথ্রীএক্স তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

কাজটায় অনেক ভেবে-চিন্তে হাত দিয়েছে পেন্টাগন। ইরাক ধ্বংস হয়ে যাক, এটা তারা চায়। কিন্তু চায় না লোকে বলুক ইরাককে আমেরিকা ধ্বংস করেছে। সেজন্যেই এমথ্রীএক্স তৈরির কাজে ন্যাটোকেও তারা জড়িয়েছে। প্রস্তাবটা তোলা হয় ন্যাটোর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সচিব পর্যায়ের গোপন বৈঠকে। আমেরিকা প্রস্তাব দেয়, এমথ্রীএক্স তৈরির প্রযুক্তি তারা যোগান দেবে, গবেষক হিসেবে কাজ করবে তাদের বিজ্ঞানীরা, এমনকি বেশিরভাগ খরচও তারা বহন করবে। ভাইরাসটা তৈরি করার পিছনে যুক্তি হিসেবে বলা হয়, জঙ্গী মনোভাবাপন্ন মৌলবাদী ইসলামী রাষ্ট্রগুলো নানা ধরনের কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল উইপন তৈরি করছে, সে-সবের প্রতিষেধক তৈরির পাশাপাশি নিজেদের হাতেও মারাত্মক ধরনের একটা ভাইরাস থাকা দরকার। প্রস্তাবে ইরাককে ধ্বংস করার কথা একবারও উচ্চারণ করা হয়নি। তবে শর্ত জুড়ে দেয়া হয়, এক্সপেরিমেন্ট সফল হলে ভাইরাসটা

নিরাপদে সংরক্ষণের জন্যে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে রাখা হবে। প্রস্তাবে আরও বলা হয়, ন্যাটোর গঠনতন্ত্র অনুসারে প্রজেক্টের খরচ হিসেবে যে সদস্য রাষ্ট্র যত বেশি টাকা চাঁদা দেবে সেই রাষ্ট্রের তত বেশি লোককে কাজে লাগানো হবে।

জেনেভায় ন্যাটোর 'অ্যান্টিডোট রিসার্চ সেন্টার'-এ কাজ করছে পঞ্চাশ জন লোক। তাদের বেশিরভাগই আমেরিকান। প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী আছেন একুশজন, সতেরোজনই আমেরিকান, নেতৃত্ব দিচ্ছেন জিম পোলাক হোয়াইটহেড। তুরস্কও নেটোর সদস্য, তবে তাদের চাঁদার পরিমাণ সবচেয়ে কম হওয়ায় মাত্র দু'জন লোককে এই প্রজেক্টে নিম্ন পদে চাকরি দেয়া হয়েছে–তাদের নাম ইব্রাহিম দানু ও ফয়েজ রামদান। এই প্রজেক্টে যারা কাজ করছে তাদের সবার ইতিহাস সিআইএ-কে দিয়ে চেক করানো হয়েছে। তুর্কী দু'জন মুসলমান হওয়ায় সিআইএ তাদের চোদ্দগুষ্টির ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করেছে, তবে সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পায়নি। কৃতিত্বটা ইরাকী কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর, কারণ 'অ্যান্টিডোট রিসার্চ সেন্টার'-এর নামে আমেরিকা নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে যাচ্ছে এই সন্দেহ হওয়ায় অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এবং অতি সূক্ষ্ম কৌশলের মাধ্যমে প্রজেক্টে ঢুকিয়ে দিয়েছে নিজেদের দু'জন স্লীপার এজেন্টকে। ইব্রাহিম দানু আর ফয়েজ রামদান পরিবার শত বছর ধরে তুরস্কের অধিবাসী, তাদের পরিবারের কেউ কোনদিন ইরাকে যায়নি, প্রবাসী কোন ইরাকী তাদের কারও সঙ্গে কখনও দেখাও করেনি। বহু বছর আগে এই দুই তুর্কীকে দলে টানে ইরাকী ইন্টেলিজেন্স। তাদেরই নির্দেশে তুরস্কে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় ওরা। লেখাপড়া বেশি নয়, ফলে ক্যাপটেনের চেয়ে বড় পদমর্যাদা তাদের কপালে জোটেনি। সুইস ব্যাংকে তাদের নামে প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার জমা হয়, পঞ্চান্ন বছর বয়েস হলে টাকাটা তারা তুলতে পারবে। এই বিপুল টাকার বিনিময়ে একটাই কাজ করতে হবে তাদেরকে, ইরাকী কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর স্লীপার এজেন্ট হয়ে থাকা, অর্থাৎ অপেক্ষা করা। সময় ও প্রয়োজন হলে তাদেরকে হয়তো কোন কাজ করতে বলা হবে। আবার এমনও হতে পারে যে পঞ্চান্ন বছর পুরো হয়ে যাবে, কিন্তু কোন কাজ করতে হবে না।

ওদের বয়স যখন চল্লিশ, সুইস ব্যাংকে প্রত্যেকের নামে জমা পড়েছে দশ লাখ মার্কিন ডলার, এই সময় কোড মেসেজের মাধ্যমে নির্দেশ এল, তোমাদের জন্যে কাজ পাওয়া গেছে–তুর্কী সেনাবাহিনীতে যারা ক্যাপটেন তাদেরকে নেটোর একটা প্রজেক্টে স্বেচ্ছাসেবক হবার আবেদন জানাতে বলা হবে, তোমরা তালিকাভুক্ত হও।

বেতন বেশি হলেও প্রজেক্টটা বিপজ্জনক, কাজেই ইব্রাহিম দানু আর ফয়েজ রামদান ছাড়া আর কেউ স্বেচ্ছাসেবক হতে চায়নি। তালিকাভুক্ত হবার পরই পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয় ওরা, তার আগে কেউ কাউকে চিনত না। তুর্কী সেনাবাহিনীর তরফ থেকে ওদের দু'জনকে প্রথমে পেন্টাগনে পাঠানো হয়, সেখানে তাদেরকে প্রথম দফা জেরা ও পরীক্ষা করা হয়। ইতিমধ্যে সিআইএ তাদের সম্পর্কে সম্ভাব্য সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছে। পেন্টাগন থেকে ওদেরকে পাঠানো হয় সিআইএ সদর দফতরে, সেখানে আরেক দফা ইন্টারোগেট

করা হয়। সবশেষে পাঠানো হয় জেনেভায়, ন্যাটোর 'অ্যান্টিডোট রিসার্চ সেন্টার'-এ, প্রজেক্টের গার্ড হিসেবে।

দু'বছর হলো এখানে কাজ করছে ওরা। জঙ্গলের ভেতর কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা ল্যাব ভবনের কোথায় কি আছে না আছে সব তাদের নখদর্পণে। এই দু'বছর ভুলেও তারা ইরাকী ইন্টেলিজেন্স-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। কাজটা বুঝিয়ে দেয়ার সময়ই বলে দেয়া হয়েছে, পরিস্থিতি অনুসারে করণীয় স্থির করতে হবে, যোগাযোগ করে নির্দেশ চাওয়ার ঝুঁকি নেয়া যাবে না। তবে দায়িত্ব পালনে ফাঁকি দেয়ার কোন সুযোগ নেই। পরিস্থিতির দাবি অনুসারে কর্তব্য স্থির করতে না পারলে ইরাকী ইন্টেলিজেন্স সুইস ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ তো করবেই, সময় ও সুযোগ মত তাদেরকে হত্যাও করা হবে।

দু'বছর এখানে চাকরি করার পর গতকাল ওরা জানতে পেরেছে পরিস্থিতি কি দাবি করছে। প্রজেক্ট বিজ্ঞানীদের ধারণা, ইংরেজি ছাড়া বিদেশী অন্যকোন ভাষা ওরা জানে না, ফলে ওদের সামনে ফ্রেঞ্চ আর জার্মান ভাষায় কথা বলেন তাঁরা। দানু আর রামদান এই দুই ভাষায় দক্ষ নয়, তবে শুনে বুঝতে পারে। বিজ্ঞানীদের আলাপ থেকে তারা জানতে পেরেছে, আগামী হপ্তায় ল্যাব থেকে এমথ্রীএক্স-এর দুটো ফাইলই আমেরিকায় পাঠিয়ে দেয়া হবে। এই ভাইরাসের প্রতিষেধক তৈরি করা সম্ভব হয়নি, কারণ হিসেবে দায়ী করা হচ্ছে ফ্যাসিলিটির অভাবকে। ফাইল দুটো পেন্টাগনের একটা ল্যাবে রাখা হবে, সেখানে অত্যাধুনিক সব রকম ফ্যাসিলিটি আছে, সেখানে নাকি এরইমধ্যে প্রতিষেধক তৈরিতে পেন্টাগনের বিজ্ঞানীরা সফল হতে চলেছেন। যে যুক্তিই দেখানো হোক, ল্যাবের সবাই বুঝতে পারছে আমেরিকা আসলে নেটোর সদস্য রাষ্ট্রগুলোকেও বিশ্বাস করতে পারছে না, সেজন্যেই এমথ্রীএক্স নিজেদের দেশে নিয়ে রাখতে চাইছে তারা। তাদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কারও কিছু বলারও নেই, কারণ ল্যাব প্রধান আমেরিকান বিজ্ঞানী জিম পোলক হোয়াইটহেডের কথার ওপর কথা বলার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি।

গতকালই দানু আর রামদান সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, ফাইল দুটো আজ তারা চুরি করবে। এই দিনটা বেছে নেয়ার কারণ হলো, আজ রাত একটা থেকে ওদের ডিউটি শুরু হবে। সকাল আটটা পর্যন্ত ডিউটি, তারপর নতুন পালা বদল ঘটবে, অথচ তখনও ল্যাব বা অফিস স্টাফ পৌঁছুবে না। তারা সবাই আসবে ন'টার সময়।

ল্যাবটা আন্ডারগ্রাউন্ডে, ডিউটি না থাকলে সেখানে কারও নামা নিষেধ। রাত একটা থেকে ওরা চারজন রয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ডে। দানু আর রামদানের কাজ টহল দিয়ে বেড়ানো, তবে মূল ল্যাবে ঢোকা ওদের জন্যেও নিষিদ্ধ। বাকি দু'জন ব্রিটিশ, রাসেল ও ডুগার্ড—তারা কমপিউটর অপারেটর। তাদের কাজ ল্যাবে কেউ ঢুকছে কিনা দেখার জন্যে মনিটর স্ক্রীনে চোখ রাখা। কমপিউটরের নিরাপত্তা বিধানও তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। অ্যাকসেস কোড জানা থাকলে যে-কেউ কমপিউটর অপারেট করে এমথ্রীএক্স ভাইরাস তৈরির ফর্মুলার ওপর চোখ বুলাতে পারবে।

গোপনে ট্রেনিং পেয়েছে দানু আর রামদান, এখানকার পরিস্থিতি যতই বিপজ্জনক হোক, কিভাবে কি করতে হবে তার একটা নিখুঁত ছক তৈরি করে নিয়েছে তারা, কাজ শুরু করার পর ঘড়ির কাঁটা ধরে এগোবে।

ল্যাবে ঢুকতে হলে প্রোটেকটিভ সুট পরতে হবে ওদেরকে। স্টোর রুমটা আন্ডারগ্রাউন্ডেই, প্রয়োজন হতে পারে ভেবে ডুপ্লিকেট চাবি অনেক আগেই সংগ্রহ করে রেখেছে ওরা। কিন্তু স্টোরে ঢোকার সময় কর্মপিউটর রুম থেকে মনিটরের স্ক্রীনে ওদেরকে দেখতে পাবে অপারেটররা। সঙ্গে সঙ্গে নীল অ্যালার্ট বাটনে চাপ দেবে তারা, এক মিনিটের মধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ডে নেমে আসবে আমেরিকান একটা সৈন্য দল, তাদের পরনে থাকবে প্রোটেকটিভ সুট, হাতে সাবমেশিন গান। নিচে নেমে দানু আর রামদানকে গ্রেফতার করবে তারা।

তারমানে, স্টোরে ঢোকার আগে কমপিউটর অপারেটরদেরকে খুন করতে হবে। শুধু স্টোরে ঢোকার জন্যে নয়, কমপিউটর থেকে এমথ্রীএক্স-এর ফর্মুলা ফ্লপি ডিস্কেটে কপি করার জন্যেও খুন করার প্রয়োজন হবে।

ল্যাব সেকশনটা আন্ডারগ্রাউন্ডের শেষ প্রান্তে। ভেতরে ঢুকতে হলে ইস্পাতের গেট খুলতে হবে। সেটা কমবিনেশন লক দিয়ে বন্ধ করা। গত দু'বছর ধরে গেটটাকে খুলতে ও বন্ধ করতে দেখেছে ওরা, পাশে দাঁড়িয়ে থেকে কমবিনেশন কোড মুখস্থ করে রেখেছে। সাউন্ড ও এয়ারপ্রুফ ইস্পাতের গেটের ভেতর ল্যাবে তৈরি করা হয়েছে বিশেষ অ্যাটমাসফিয়ার। শূন্যের চেয়ে পঞ্চাশ ডিগ্রী সেলসিয়াস নিচে ওখানকার তাপমাত্রা। এটাই এই ল্যাব-এর বৈশিষ্ট্য। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে ফ্রিজিং পয়েন্টের পঞ্চাশ ডিগ্রী সেলসিয়াস নিচে রাখা হলে এমথ্রীএক্স নিষ্ক্রিয় বা নির্জীব হয়ে থাকে। তারপরও সাবধানের মার নেই ভেবে বিজ্ঞানী ও ল্যাব-কর্মীরা প্রোটেকটিভ সুট না পরে ল্যাবের ভেতর ঢোকে না। ওরাও ঢুকবে না।

আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, রাত একটা থেকে ওদের সঙ্গে যে দু'জন অপারেটর ডিউটি দিচ্ছে তাদেরকে ওরা মারবে না। কারণ তাতে কোন লাভ নেই। শুধু পালা বদলের সময় আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে ওপরে উঠতে পারবে ওরা–সকাল আটটা থেকে ন'টার মধ্যে। তার আগে এই অপারেটর দু'জনকে মেরে ফেললে লাশ হয়তো লুকিয়ে ফেলা যাবে, কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে ওপরে ওঠার জন্যে আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তখন নতুন গার্ড আর নতুন অপারেটরও আসবে। তারা এসে যদি দেখে অপারেটররা কমপিউটর রুমে নেই, কি জবাব দেবে ওরা?

পালা বদলের সময় গার্ড আর অপারেটররা পরস্পরের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করে, যাদের পালা শেষ হলো তারা সাধারণত দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েই ওপরে উঠে যায় না। বিশেষ করে সকালের পালা বদলের সময় এটা ঘটে। বিজ্ঞানী আর ল্যাব-কর্মীরা আসে ন'টায়, মাঝখানে এক ঘণ্টা সময় পাওয়া যায়, খোশ-গল্প করে সেটারই সদ্ব্যবহার করা হয়। নতুন যারা আসে তারা স্যান্ডউইচ আর ফ্লাস্ক ভর্তি কফি নিয়ে আসে, সবাই মিলে খাওয়াদাওয়া করে। তখনই হয় কফিতে বিষ মিশিয়ে নয়তো অন্য কোনভাবে নতুন আসা দু'জন গার্ড আর দু'জন

কমপিউটর অপারেটরকে খুন করতে হবে। চারজনকে একসঙ্গে খুন করা খুব কঠিন কাজ, বিশেষ করে কফিতে যদি বিষ মেশানো সম্ভব না হয়। দানু পরামর্শ দিল, প্রথমে গার্ড দু'জনকে, কমপিউটর রূম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে—এমন কোন জায়গায়, যেখানে মনিটর স্ক্রীন কাভার করে না। এটা যে খুব কঠিন কাজ, তা নয়। গার্ড দু'জনকে তারা টয়লেটের ভেতর নিয়ে যেতে পারে, ভেতরে আলো জ্বলছে না বা কমোড-এর পানি নামছে না বলে। ওদের লাশ টয়লেটে রেখে ফিরে আসতে পারে কমপিউটর রূমে। তখন সেখানে থাকবে চারজন অপারেটর—দু'জন নতুন, দু'জন পুরানো। ওরা দু'জন, প্রতিপক্ষ চারজন—নাহ্, সম্ভব নয়।

অনেক আলোচনার পর প্ল্যানটা বদলানো হলো। খুব বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে, তবে অন্য কোন উপায়ও নেই। বিষই একমাত্র সমাধান।

ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক আটটার সময় পালা বদল শুরু হলো। করিডরের শেষ মাথায় সিঁড়িটা, ইস্পাতের দরজা খুলে বেরিয়ে এল দু'জন গার্ড আর দু'জন কমপিউটর অপারেটর। দরজা খুলেছে দু'জন আমেরিকান সৈনিক। সিঁড়ির নিচে দানু আর রামদানকে দেখতে পেয়ে তাদের একজন জানতে চাইল, 'কি হে, দরজা খোলা রাখব, নাকি উঠে আসতে দেরি করবে তোমরা?'

'কি যে বলো না! তাজা স্যান্ডউইচ আর কফি না খেয়ে কোথাও যাচ্ছি না!'

সিঁড়ির মাথার দরজা বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল। ধাপ বেয়ে নেমে আসছে দু'জন গার্ড আর দু'জন অপারেটর।

'তাড়াতাড়ি নামো, খিদেতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে!' তাগাদা দিল দানু।

গার্ড দু'জন জার্মান—বার্ট আর মার্ক। অপারেটর দু'জন ইটালিয়ান—আলবিনো আর রুপার্ট। দানু আর রামদান এমন স্বাভাবিক অভিনয় করল, ওরা চারজন কিছু সন্দেহ করার সুযোগই পেল না। গার্ডদের হাত থেকে কফি ভর্তি ফ্লাস্ক আর অপারেটরদের হাত থেকে বাক্স ভর্তি স্যান্ডউইচ প্রায় ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল ওরা, বসে পড়ল সিঁড়ির ধাপেই। কাগজের কাপে কফি ঢালছে দানু, বলল, 'যাও, তোমরা তোমাদের ডিউটি শুরু করো। যদি কিছু বাঁচে, যাবার সময় তোমাদেরকে দিয়ে আসব।'

হাসতে হাসতে করিডর ধরে চলে গেল তারা। গার্ডরা পুরো আন্ডারগ্রাউন্ডে একবার চক্কর দেবে, সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিয়ে ফিরে আসবে স্টেশনে। সেটা কাচ দিয়ে ঢাকা কমপিউটর রূমের উল্টোদিকে। ইতিমধ্যে সদ্য আগত অপারেটর আলবিনো আর রুপার্ট ব্রিটিশ অপারেটর রাসেল আর ডুগার্ডের কাছ থেকে কমপিউটর রূমের দায়িত্ব বুঝে নেবে, তারপর বেরিয়ে এসে যোগ দেবে বার্ট আর মার্কের সঙ্গে স্টেশনে। স্টেশনে একটা লম্বা কাউন্টার আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে বা বসে স্যান্ডউইচ আর কফি খাবে তারা, মিনিট দশ-পনেরো গল্প-গুজব করে আবার কমপিউটর রূমে ঢুকবে—সেই যে ঢুকবে, তারপর বেলা তিনটের আগে বেরুবে না।

ওরা চারজন চলে যেতেই কাগজের দুটো কাপে কফি ঢালল দানু। আগুনের

মত গরম কফি, তাড়াহুড়ো করে খেতে গিয়ে জিভ পুড়িয়ে ফেলল। বাক্স থেকে স্যান্ডউইচ বের করলেও খেলো না, পকেটে ভরে রাখল–সময়ের অভাব। মাড়ি থেকে একটা করে নকল দাঁত বের করল দু'জনে। ওগুলোকে খুদে ক্যাপসুল বললেই হয়, ভেতরে তরল সায়ানাইড আছে। প্রয়োজনে আত্মহত্যা করতে হতে পারে, দু'বছর ধরে মাড়িতে এগুলো আটকে রাখার সেটাই কারণ। খুদে ক্যাপসুল দুটোয় যে পরিমাণ বিষ আছে তা ছ'জন লোককে মেরে ফেলার জন্যে যথেষ্ট।

ক্যাপসুল ভেঙে ফ্লাস্কে সায়ানাইড মেশানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা, এই সময় পায়ের আওয়াজ ঢুকল কানে। ব্রিটিশ কমপিউটর অপারেটররা, রাসেল আর ডুগার্ড, করিডরের বাঁক ঘুরে এদিকেই এগিয়ে আসছে। ওরা সম্ভবত রাত জেগে দীর্ঘ ডিউটির পর ক্লান্ত বোধ করছে, নিজেদের রুমে ফিরে ঘুমাতে চায়। ক্যাপসুল দুটো তাড়াতাড়ি পকেটে ভরে স্যান্ডউইচ বের করল দানু আর রামদান, বড় করে কামড় দিয়ে দ্রুত চিবাচ্ছে। মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে দানু জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, তোমরা কফি খাবে না?'

ওদেরকে পাশ কাটিয়ে ধাপ বেয়ে ওপরে ওঠার সময় রাসেল জবাব দিল, 'কফি খেলে ঘুম আসবে না, তোমরা খাও।'

সিঁড়ির মাথায় উঠে কলিংবেলের বোতামে চাপ দিল ওরা। গেট খুলে গেল। রাসেল আর ডুগার্ড বেরিয়ে যেতে আমেরিকান সৈনিকদের একজন নিচের ধাপে বসা দানু আর রামদানকে বলল, 'আমরা তোমাদের চাকর নাকি? কতবার গেট খুলব, অ্যাঁ? এখনও বসে আছ কি মনে করে, উঠে এসো।'

'আরে ভাই, রাগ করো কেন!' অমায়িক আবদারের সুরে বলল দানু। 'সকালের নাস্তাটা অন্তত খেতে দাও!'

'মনে থাকে যেন, আর মাত্র একবার খুলব, ঠিক সাড়ে আটটায়,' বলে গেট বন্ধ করে দিল সৈনিক।

আধ-খাওয়া স্যান্ডউইচ পকেটে রেখে দিয়ে নিজেদের কাপে আরও কফি ঢালল ওরা। রাসেল আর ডুগার্ড চলে যাওয়ায় ঝামেলা কমল, ফ্লাস্কের কফিতে বিষের মাত্রাও বাড়বে। হাতে সময় আছে পঁচিশ মিনিট, সমস্ত কাজ এর মধ্যেই সারতে হবে।

আরও পাঁচ মিনিট পর বিষাক্ত কফি নিয়ে স্টেশনে ফিরে এল ওরা। গার্ড দু'জন, বার্ট আর মার্ক, টহল দিয়ে এইমাত্র ফিরেছে। কমপিউটর রুমে ছিল আলবিনো আর রুপার্ট, দানু আর রামদানকে দেখে তারাও বেরিয়ে এল। চারজনই ওরা নাস্তা করে এসেছে, তাই এখুনি আর স্যান্ডউইচ খাবে না, তবে কফি খেতে আপত্তি নেই। দানু আর রামদানের কফি খাওয়া এখনও শেষ হয়নি, নিজেদের কাপে চুমুক দিচ্ছে ওরা, বাকি চারজন নিজেদের জন্যে কফি ঢালল কাপে।

সব কিছু প্ল্যান মতই এগোচ্ছিল, হঠাৎ একটা খুঁত দেখা দিল। আলবিনো তার কাপ নিয়ে কমপিউটর রুমে ঢুকে পড়ল। রুপার্ট স্টেশনে রয়েছে, তাই রুমের দরজা খোলা রেখে কমপিউটরের সামনে বসল সে, কফিতে এখনও চুমুক দেয়নি, ডেস্কের ওপর নামিয়ে রাখল কাপটা। কাচের ভেতর দিয়ে তার দিকে সতর্ক

দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল দানু, মনে মনে অভিশাপ দিচ্ছে।

রামদান নজর রাখছে রুপার্ট, বার্ট আর মার্কের ওপর। কাপের কফি অর্ধেকও শেষ হয়নি, তীব্র বিষক্রিয়ায় নীল হয়ে গেল তিনজনের চেহারা। অকস্মাৎ পেটে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হলো, সারা শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে, চিৎকার করার শক্তি পাচ্ছে না। দানু আর রামদানের ভাগ্যই বলতে হবে যে কমপিউটর রূমে আলবিনো বসে আছে স্টেশনের দিকে পিছন ফিরে, ফলে রূমের বাইরে কি ঘটছে দেখতে পাচ্ছে না।

টুল থেকে পড়ে যাচ্ছে বার্ট আর রুপার্ট, ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে এসে দু'জনকেই ধরে ফেলল রামদান, ধীরে ধীরে মেঝেতে শুইয়ে দিল। পড়ে যাচ্ছে মার্কও। তাকে ধরার জন্যে লাফ দিয়ে এগিয়ে এল রামদান, ধরতেও পারল, কিন্তু টুলটার উল্টে পড়া ঠেকানো গেল না। নিস্তব্ধ আন্ডারগ্রাইন্ডে বিকট শব্দ হলো। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ছুটল দানু, খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল কমপিউটর রূমে।

আওয়াজ শুনে ঝট করে ঘাড় ফেরাল আলবিনো। স্টেশনে কি ঘটছে তা দেখার সুযোগ হলো না, তার আগেই ঘাড়ের ওপর দানুর কনুইয়ের প্রচণ্ড গুঁতো খেয়ে জ্ঞান হারাল সে, গদিমোড়া টুল থেকে পড়ে গেল মেঝেতে।

কাজ আগেই ভাগ করা আছে, কথা বলে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। কমপিউটর রূম থেকে বেরিয়ে ছুটল দানু, রামদানের দিকে ভাল করে তাকালও না। সোজা স্টোররূমে চলে এল সে, তালা খুলে ভেতরে ঢুকল। ল্যাবে ঢুকতে হলে প্রোটেকটিভ সুট পরতে হবে তাকে। এগুলো খুব দামী জিনিস, একেকটা তৈরি করতে দশ হাজার ডলার ব্যয় হয়েছে। ল্যাবের ভেতর যে-সব বিজ্ঞানীরা ঢোকেন তাঁরা কেউ এই সুট পাঁচ ঘণ্টার বেশি ব্যবহার করেন না। ল্যাবে পাঁচ ঘণ্টার বেশি কাজ করলে নতুন সুট পরে নেন, পরিত্যক্ত সুট পুড়িয়ে ফেলা হয়। সাবধানের মার নেই ভেবে এই নিয়ম। ল্যাবের ভেতর এমন অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করে রাখা হয়েছে, এমথ্রীএক্স ছড়িয়ে পড়ার কোন ভয় নেই–তবু নিয়ম পালনে কেউ ভুলেও গাফলতি করেন না। দুর্ঘটনাবশত এমথ্রীএক্স যদি ছড়িয়ে পড়ে, পরনের প্রোটেকটিভ সুট ভাইরাসটাকে পাঁচ ঘণ্টা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে, শরীরের সংস্পর্শে আসতে দেবে না।

আন্ডারগ্রাউন্ড স্টোরে সব সময় দেড়শো প্রোটেকটিভ সুট মউজুদ রাখা হয়। গ্রাউন্ড ফ্লোরের স্টোর রূমে আছে আরও দুশো সুট।

স্টোররূমের র‍্যাকে পঞ্চাশটা ইস্পাতের বাক্স আছে, তারই একটা নামিয়ে তালা খুলে প্রোটেকটিভ সুট বের করল দানু। অ্যাসট্রোনটরা যে-ধরনের স্পেইসসুট পরে, এটা সেরকমই দেখতে, মাস্ক সহ হেলমেট লাগানো, রঙটাও সাদা। স্যুটের ভেতরই অক্সিজেন সিলিন্ডার আছে, মাস্কের ভেতর সাপ্লাই দেয়ার জন্য। হাতে সময় কম, সুটটা পরেই স্টোর রূম থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে ছুটল দানু, দরজাটা খোলাই থাকল। এই করিডর কমপিউটর রূমের উল্টোদিকে চলে গেছে, কাজেই রামদান কি করছে না করছে জানার কোন সুযোগ নেই। তবে দানু জানে রামদান তার দায়িত্ব ঠিক মতই পালন করবে। কিভাবে কমপিউটর অপারেট

করতে হয় জানে রামদান, ফ্লপি ডিস্কে কপি করা তার জন্যে কোন সমস্যা নয়। তবে শুধু ডিস্কে কপি করলেই হবে না, কমপিউটরের মেমোরি অর্থাৎ হার্ড ডিস্কও নষ্ট করতে হবে, তা না হলে এমথ্রীএক্স তৈরির ফর্মুলা আমেরিকানদের হাতে থেকেই যাবে। ওদের জানা মতে সিকিউরিটির কি একটা অভাবজনিত কারণে ফর্মুলাটা আমেরিকায় পাঠাতে এতদিন দেরি করা হয়েছে। তবে আগামী হপ্তায় ভাইরাসের ফাইল দুটোর সঙ্গে ফর্মুলাটাও পাঠিয়ে দেয়া হবে।

ইস্পাতের গেটের কমবিনেশন লক খুলে ল্যাবে ঢুকতে দানুর কোন সমস্যা হলো না। সাধারণ পোশাক পরে এখানে ঢুকলে ঠাণ্ডায় মারা যাবে মানুষ, পরনে প্রোটেকটিভ সুট থাকায় সে ভয় নেই। ল্যাব ও ল্যাবের বাইরের প্রতিটি অংশ আসলে আলাদা, জোড়া লাগিয়ে এক করা হয়েছে–কোন অংশে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়লে সেটাকে আলাদা করে পুড়িয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা আছে। এমথ্রীএক্স-এর ফাইল দুটো একটা ভল্টের ভেতর আছে, জানে দানু। ল্যাবে এই প্রথম সে ঢুকল, ভল্টটা কোনদিন দেখেনি। তবে জানে ল্যাবে ওই একটাই ভল্ট, খুঁজে নিতে অসুবিধে হবে না। সমস্যা হবে কমবিনেশন লকের কোড নিয়ে।

লকের কমবিনেশন কোড দু'দিন পরপর বদলানো হয়, ভুলো মন বিজ্ঞানীরা তা মনে রাখতে পারেন না। স্টেশনে বসে কফি খাবার সময় তাঁদেরকে এ বিষয়ে তর্ক করতে শুনেছে দানু। তারপর একদিন তাঁদের আলোচনা থেকে জানতে পারল, নতুন কমবিনেশন কোড লিখে রাখা হবে, ভল্ট খোলার সময় সেটার ওপর চোখ বুলিয়ে নেবেন বিজ্ঞানীরা। লিখে রাখা হবে, এটাই শুধু জানে দানু, কোথায় বা কিসে লিখে রাখা হবে তা জানে না। এই অনিশ্চয়তা তার বুকের রক্ত হিম করে তুলছে।

ভল্টটা খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হলো না। ডীপ ফ্রিজ-এর মত দেখতে, চৌকো একটা কাঠামো, দরজায় ডায়াল আছে। ইস্পাতের দরজার গায়ে কিছু লেখা নেই, আশপাশেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। অস্থির হয়ে উঠল দানু, সময় দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে। কাঁচ দিয়ে ঘেরা একটা ঘরের ভেতর ভল্টটা। ভেতরে শুধু একটা প্লাস্টিকের পাতাবাহার গাছ আছে। সবুজ পাতাগুলো পরীক্ষা করছে দানু। উল্টেপাল্টে প্রতিটি পাতা দেখল, কিছুই নেই। টবের নিচেও কিছু নেই। উবু হয়ে বসে গাছটার মোটা কাণ্ডের ওপর চোখ বুলাচ্ছে, খুদে একটা গর্তের ওপর চোখ আটকে গেল। গর্তের কাছে চোখ সরিয়ে এনে তাকাতে ভেতরে সাদা মত কিছু দেখতে পেল। সম্ভবত একটা ভাঁজ করা কাগজ। গর্তটা এত ছোট, ভেতরে আঙুল ঢুকবে না। কাণ্ডটা দু'হাতে ধরে মোচড় দিল দানু, দেখা গেল প্যাঁচ খুলে কাণ্ডটা দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

কাগজটা হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলল সে। তেরোটা সংখ্যা লেখা তাতে–২৫৪৯৫৪৩২১৯৪৩২। কাগজটা নিয়ে ডায়ালের সামনে দাঁড়াল, ডায়াল করল নম্বর মিলিয়ে–হাতের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই, থরথর করে কাঁপছে। ভল্টে ঢুকে দশ ইঞ্চি ইঁট আকৃতির কাঁচের একটা বাক্স ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না সে। বাক্সের ভেতর বারোটা খোপ আছে, দুটো ছাড়া বাকি খোপ খালি। ওই দুটো খোপে দু'ইঞ্চি লম্বা দুটো কাঁচের টিউব রয়েছে, মুখে অ্যালুমিনিয়াম বা টিনের পাত

মোড়া কর্ক।

বাক্স খুলে টিউব দুটো হাতে নিল দানু। এবার সারা শরীরে কাঁপন ধরে গেল—ঠাণ্ডায় নয়, ভয়ে। সে জানে, এই ভাইরাসের একটা ফোঁটা দিয়ে গোটা একটা মহাদেশের সমস্ত মানুষকে মেরে ফেলা সম্ভব। সংক্রমণ একবার শুরু হলে সেটাকে ঠেকায় এমন সাধ্য কারও নেই। আমেরিকা বা ন্যাটোর বিজ্ঞানীরা এখনও এটার প্রতিষেধক বের করতে পারেননি। তাঁদের আলোচনা শুনে দানু জানে, এই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি দশ সেকেন্ডের মধ্যে মারা যেতে পারে, আবার মৃত্যু হতে বিশ ঘণ্টাও লাগতে পারে—নির্ভর করে যার যার শারীরিক প্রতিরোধ-শক্তির ওপর। জার্মান এক বিজ্ঞানীকে দানু বলতে শুনেছে, 'ঈশ্বর না করুন কেউ যদি আক্রান্ত হয়, প্রার্থনা করবেন সে যেন খুব তাড়াতাড়ি মারা যায়, কারণ মৃত্যু হতে যত দেরি হবে ততবেশি নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তাকে।' এরপর ভদ্রলোক সবিস্তারে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সংক্রমিত কোন ব্যক্তি বিশ ঘণ্টা বেঁচে থাকলে তার কি অবস্থা হবে। তাঁর সেই বর্ণনা শুনলে যে-কোন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়বে, ভয়ে হার্টফেলও করতে পারে।

পরবর্তী কাজগুলো দ্রুত সারল দানু। ভল্ট থেকে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করল, ল্যাব থেকে বেরিয়েও দরজা বন্ধ করতে ভুলল না। কিন্তু স্টোর রূমে ফিরে এসে ঘাবড়ে গেল সে। কমপিউটর থেকে ফ্লপি ডিস্কে কপি করা, তারপর হার্ডডিস্ক নষ্ট করা, এগুলো তো সহজ কাজ, তাহলে রামদান এত সময় নিচ্ছে কেন?

ঘাবড়ে গেলেও, সময় নষ্ট করছে না দানু। টিউব দুটো একটা র‍্যাকে রেখে গা থেকে প্রোটেকটিভ সুট খুলল সে। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল, আটটা বিশ। আর দশ মিনিট পর সিঁড়ির মাথার গেট খুলে সৈনিকরা ওদেরকে ডাক দেবে। ওরা সাড়া না দিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রোটেকটিভ সুট পরা একদল সৈনিক নিচে নেমে আসবে। কি আশ্চর্য, রামদান এত দেরি করছে কেন?

কমপিউটর রূম এখান থেকে অনেকটা দূরে, কয়েকটা করিডর পার হয়ে পৌঁছুতে হবে। সিঁড়িটা কাছে, একটা করিডরের মাত্র অর্ধেকটা পার হলে পৌঁছানো যায়। দানু সিদ্ধান্ত নিল, আরও দু'মিনিট অপেক্ষা করে দেখবে। র‍্যাক থেকে হাতে নিয়ে টিউব দুটো নেড়েচেড়ে দেখল একবার, তারপর অত্যন্ত সাবধানে ইউনিফর্মের বুক পকেটে লুকিয়ে রাখল। অস্থির উত্তেজনায় ছটফট করছে, স্টোর রূম থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকল। এখনও আসছে না রামদান। কত রকম সন্দেহ জাগছে মনে। ফর্মুলাটা রামদান হয়তো কমপিউটরের ভেতর পায়নি। কমপিউটর রূমের অন্য কোথাও রাখা হয়েছে, তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাচ্ছে না। দানু বাইরে থেকে দেখেছে, কমপিউটর রূমে বাক্স ভর্তি অসংখ্য ফ্লপি ডিস্ক আছে, সেগুলো থেকে আসল ডিস্কটা খুঁজে বের করতে হলে প্রচুর সময় দরকার। ডিস্কের গায়ে সরল ভাষায় পরিচয় লেখা না থাকলে কমপিউটরে ঢুকিয়ে দেখে নিতে হবে কোনটায় কি আছে। এভাবে পরীক্ষা করতে হলে কয়েক ঘণ্টা নয়, সারা দিন লেগে যেতে পারে। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে তার।

হঠাৎ দেখা গেল করিডর ধরে ছুটে আসছে রামদান. আনন্দে উদ্ভাসিত চেহারা, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে। রামদানকে দেখে দানুও আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠল। রামদান ছুটে আসছে, দানুও বেখেয়াল হয়ে তার দিকে ছুটল। পরস্পরকে আলিঙ্গন করল ওরা।

মুটমুট আওয়াজ করে ভেঙে গেল টিউব দুটো। কি ঘটতে যাচ্ছে একমাত্র ঈশ্বরই তা বলতে পারবেন। ইব্রাহিম দানু আর ফয়েজ রামদান এই মুহূর্তে দুনিয়ার সবচেয়ে দুর্ভাগ্য ব্যক্তি। দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তিও বটে। যে ভুল ওরা করে বসেছে, ওদেরকে এক হাজার বার ফাঁসি দিলেও তার প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব নয়। ওদের এই ভুল পৃথিবী নামক এই গ্রহটার কি সর্বনাশ ডেকে আনবে তা কল্পনা করতে চাওয়াও বোকামি। কারণ আগুন ছাড়া এমথ্রীএক্স ধ্বংস করা সম্ভব নয়। আর শুধু পানিতে নির্জীব হয়ে থাকে। এই ভাইরাস স্তন্যপায়ী প্রাণী পেলেই অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বংশবৃদ্ধি ঘটায়। দানু আর রামদানের সংস্পর্শে যে-ই আসবে, সেই সংক্রমিত হবে–একজনের দ্বারা আরেকজন, তার দ্বারা অন্যজন, এভাবে ছড়িয়ে পড়বে মহল্লায়, শহরে, জেলায়, দেশে, মহাদেশে, গোটা দুনিয়ায়।

আওয়াজটা ওরা দু'জনেই শুনেছে। শোনার পর দশ সেকেন্ড নিঃশ্বাস ফেলেনি বা নড়েনি।

প্রথমে ফিসফিস করল দানু, 'আল্লাহর ইচ্ছা নয় আমরা বাঁচি।'

'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করল রামদান। 'কিন্তু আমরা জানি না কে কতক্ষণ বেঁচে আছি। দশসেকেন্ড থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টা...'

পাঁচ সেকেন্ড আর কোন কথা হলো না। তারপর দানু বলল, 'এই অনিশ্চয়তার ভেতরও আল্লাহর গোপন কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তোমার এত দেরি হলো কেন?' এখনও পরস্পরকে ওরা ছাড়েনি।

'ফ্লপি ডিস্কটা পাচ্ছিলাম না। অনেক খুঁজে বের করতে হয়েছে।' নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পিছিয়ে গেল রামদান, পকেট থেকে ডিস্কটা বের করল।

'হার্ডডিস্ক নষ্ট করেছ?' জানতে চাইল দানু।

হাঁ হয়ে গেল রামদান। বিহ্বল দৃষ্টিতে হাতে ধরা ডিস্কটার দিকে তাকাল। 'এটা খুঁজে না পাওয়ায় মাথার ঠিক ছিল না, পাবার পর হার্ডডিস্কের কথা মনেই পড়েনি।' ঘাড় ফিরিয়ে করিডরের দিকে একবার তাকাল, তারপর বন্ধুর দিকে ফিরে বলল, 'তোমার কথাই ঠিক, এই অনিশ্চয়তার ভেতর আল্লাহর মহৎ কোন উদ্দেশ্য আছে। দানু, ভাই আমার, ডিস্কটা নিয়ে চলে যাও তুমি।'

'আর তুমি?'

'আমি হার্ডডিস্কটা নষ্ট করতে যাচ্ছি। ফ্লপি ডিস্কটাই ইরাকের দরকার, ফর্মুলাটা! ব্রিফ করার সময় কি বলা হয়েছিল, তোমার মনে আছে তো? এমথ্রীএক্স হাতে পেলে প্যারিসে নিয়ে যেতে হবে, ফেলে দিতে হবে এলিসি প্রাসাদের ডান দিকের সবুজ ডাস্টবিনে। তার আগে ফোন করে জানাতে হবে...' ঘাড় ফিরিয়ে করিডরের দেয়ালে তাকাল সে, ওখানে হুকের সঙ্গে একটা টেলিফোন ঝুলছে। ঘুরে সেদিকে এগোল সে।

দ্রুত ডায়াল করল রামদান। নম্বরগুলো ওর মুখস্থ। সরাসরি ডায়ালিং সিস্টেম, ইরাকী দূতাবাসের লাইন পেতে দেরি হলো না। সরাসরি অ্যামব্যাসাডরকে চাইল সে। ভাগ্যটা ভালই, ফোনটা বেজেছে অ্যামব্যাসাডরের বেডরুমে। 'বলছি।'

নিজেদের কোডনেম উচ্চারণ করল রামদান, তারপর বলল, 'এমথ্রীএক্স-এর দুটো ফাইলই ভল্ট থেকে বের করেছিলাম, কিন্তু ভেঙে গেছে। আমরা অ্যাফেক্টেড। আমাদের একজন দুপুরের ট্রেনে রওনা হচ্ছে। ট্রেনের গন্তব্য স্টকহোম, তবে প্যারিসেই নামব–যদি বেঁচে থাকি। ফ্লপি ডিস্ক কোত্থেকে কালেক্ট করতে হবে আপনি জানেন। কিন্তু ট্রেনে ওঠার পর প্যারিসে পৌঁছুনোর আগেই যদি মারা যাই, যেভাবে পারেন ট্রেন থেকেই ওটা কালেক্ট করবেন। আর যদি ট্রেনে ওঠার আগে মারা যাই, আপনারাই ঠিক করবেন কি করতে হবে।' অ্যামব্যাসাডরকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল সে।

একটা ঢোক গিলে ফিসফিস করল দানু, 'তোমার অসুস্থ লাগছে?'

মাথা নাড়ল রামদান। 'তোমার?'

'এখনও কিছু বুঝতে পারছি না।' দীর্ঘশ্বাস চাপল দানু। 'একটাই সান্ত্বনা, আমাদের পরিবার রাজার হালে থাকবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, টাকাটা ওরা পেয়ে যাবে।'

'আল্লাহ হাফেজ, তুমি ভাই বেরিয়ে যাও। সিঁড়ির মাথায় উঠে সৈনিকদের বলো আমি এখানে বার্ট আর মার্কের সঙ্গে গল্প করছি, ল্যাব-কর্মীরা যখন নিচে নামবে তখন বেরুব।' মৃত্যু সুনিশ্চিত জানার পরও রামদানের চেহারায় কোন বিকার নেই।

আবার ওরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করল। দানুর হাতে ফ্লপি ডিস্কটা গুঁজে দিল রামদান, সেটা নাভির নিচে আন্ডারঅয়্যারের ভেতর লুকিয়ে ফেলল দানু। 'আল্লাহ চাইলে আবার আমাদের দেখা হবে–মৃত্যুর পর। আল্লাহ হাফেজ।' চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসছে, তাড়াতাড়ি ঘুরে করিডর ধরে এগোল সে, সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে।

তার পিছু নিয়ে কয়েক পা এল রামদান। 'আমরা সংক্রমিত হয়েছি, এটা জানার পরই ওরা মেগা ডেথ প্রিভেন্ট কমিটিতে খবর পাঠাবে।' ওরা জানে, জেনেভাতেই, তিন মাইলের মধ্যে, মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির অফিস। অ্যান্টিডোট রিসার্চ সেন্টারে যেহেতু দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করা হয়, তাই দুর্ঘটনাবশত সংক্রমণের আশংকাও আছে, সেজন্যেই সংক্রমণের ঘটনা ঘটলে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে 'এমডিপিসি' গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির প্রধানও একজন আমেরিকান, নাম জেনারেল লী মার্শাল। 'সঙ্গে সঙ্গে প্রিভেনটিভ সুট পরা সৈনিকদের পাঠাবে ওরা। আমাদের সংস্পর্শে যারা আসবে তাদের একজনকেও বাঁচিয়ে রাখবে না। কি বলছি বুঝতে পারছ? ওপরে উঠে কাউকে ছোঁবে না তুমি। থুথু-কফ-ঘাম, কিচ্ছু ফেলবে না। তুমি তো গাড়ি চালাতে জানো না, সম্ভব হলে একটা সাইকেল চুরি করে স্টেশনে পৌঁছুবে...'

'ট্রেনে ওঠার পর কি করব?' হঠাৎ থেমে জানতে চাইল দানু 'স্টেশনে তো প্রচণ্ড ভিড় থাকবে ট্রেনেও কয়েকশো যাত্রী উঠবে '

'সম্ভব হলে এক দেড় ঘণ্টা আগে উঠবে ট্রেনে, বলল রামদান 'পুরো একটা কমপার্টমেন্ট ভাড়া করবে, ঢোকার পর ভেতর থেকে বন্ধ করে দেবে দরজা। আমার ঘরে টাকা আছে, ওগুলোও সব নিয়ে যাও।'

'কিন্তু তুমি? তোমার কি হবে?'

'আল্লাহ চাহে তো আবার আমাদের দেখা হবে–কেয়ামতের দিন।'

কমপিউটর রুমে ফিরে এসে হার্ডডিস্ক নষ্ট করতে মাত্র পাঁচ মিনিট লাগল রামদানের। পালিয়ে কোন লাভ নেই, কাজেই সে চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিয়েছে। মনে একটাই ভয়, এই বুঝি অসুস্থ হয়ে পড়ল। বাক্স খুলে ফ্লপি ডিস্কগুলো এক এক করে পরীক্ষা করছে, আরও কোন ডিস্কে ফর্মুলাটা থাকলে নষ্ট করে ফেলবে। দরদর করে ঘামছে সে, দোয়া-দরুদ পড়ছে, টেরই পেল না তার পিছনে মেঝেতে পড়ে থাকা আলবিনোর জ্ঞান ফিরে আসছে।

ন'টা বাজতে তখন পনেরো মিনিট বাকি, ঘাড়টা এক হাতে ডলতে ডলতে রামদানের পিছনে সিধে হলো আলবিনো। সে তাকিয়ে আছে কমপিউটর ডেস্কে রাখা একটা সুইচবোর্ডের দিকে। সুইচবোর্ডে একটাই বোতাম, টকটকে লাল, নিচে লেখা–'রেড অ্যালার্ম'।

রামদানকে আক্রমণ করার কথা ভাবছে না আলবিনো। মুখের ভেতর জিভ ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গেছে তার। হাতের উল্টোপিঠে ফোস্কা পড়ছে। নিজের চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছে না, তবে জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। আয়নায় তাকালে দেখতে পেত চোখের সাদা অংশটুকু আর সাদা নেই, জবা ফুলের মত টকটকে লাল হয়ে গেছে–কোটর ছেড়ে অক্ষিগোলকও বেরিয়ে এসেছে আধ ইঞ্চির মত। কি ঘটে গেছে জানে আলবিনো।

সে কোন শব্দ না করে রামদানের কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে সুইচটা শুধু টিপে দিল–তিন মাইল দূরে 'মেগা ডেথ প্রিভেন্‌শন্ কমিটি'-র অফিস বিল্ডিঙে সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল সতর্ক সংকেত।

লাফ দিয়ে টুল ছাড়ল রামদান,তারপর আলবিনোকে দেখে একদম স্থির হয়ে গেল। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, কেউ কারও ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে না, চেহারায় এমনকি পরস্পরের প্রতি ওদের কোন ঘৃণাও নেই। এ আর কিছু নয়, অমোঘ নিয়তিকে মেনে নেয়ার লক্ষণ মাত্র।

'মেগা ডেথ প্রিভেন্‌শন কমিটি'-র অফিস বিল্ডিংটা ছ'তলা। এখানে প্রিভেনটিভ সুট পরা দেড়শো আমেরিকান সৈনিক সর্বক্ষণ সতর্ক অবস্থায় প্রস্তুত থাকে, সতর্ক সংকেত বাজলেই ছুটবে। প্রতি মাসে দু'বার মহড়া অনুষ্ঠিত হয়, মহড়ার সময় এই অফিস থেকেই সতর্ক সংকেত বাজানো হয়। দশটা ভ্যানে চড়ে দেড়শো সৈনিক সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়, সাড়ে চার থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যায় ন্যাটোর 'অ্যান্ডিডোট রিসার্চ সেন্টার'-এ।

আজ এটা মহড়া নয়, কাজেই পথে সৈনিকদের ব্রিফ করা হলো। কাঁটাতারের বেড়া গলে কেউ যাতে বেরুতে না পারে, সেজন্যে চার মিনিটের মাথায় পৌঁছেই 'অ্যান্টিডোট রিসার্চ সেন্টার' ঘিরে ফেলল একশো সৈনিক। ভেতরে ঢুকল পঞ্চাশ জন, তাদের মধ্যে থেকে আন্ডারগ্রাউন্ডে নামল দশজন। নয়টা বাজতে আট মিনিট বাকি, এরইমধ্যে বাইরে থেকে সেন্টারে ঢুকেছে একজন বিজ্ঞানী আর চারজন ল্যাব-কর্মী। যেহেতু ঢুকে পড়েছে, তাদেরকে আর বেরুবার সুযোগ দেয়া হলো না। ভেতরে আগে থেকে আছে সব মিলিয়ে বিশজন–তাদের মধ্যে সৈনিক আছে বারোজন, স্টাফ আটজন। মোট পঁচিশজনকে এক জায়গায় জড়ো করা হলো। 'মেগা ডেথ প্রিভেন্শন্ কমিটি'-র প্রধান লী মার্শাল স্বয়ং দেড়শো সৈনিককে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

ন'টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। সেন্টারের গেট থেকে এক মাইল দূরে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে, সেখান থেকেই ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে বিজ্ঞানী আর ল্যাব-কর্মীদের, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সেন্টারে কাউকে ঢুকতে দেয়া হবে না।

ঠিক ন'টায় আন্ডারগ্রাউন্ড ল্যাব থেকে টেলিফোনে খবর পেলেন লী মার্শাল, ল্যাব-এর ভল্ট থেকে এমথ্রীএক্স-এর দুটো ফাইলই চুরি গেছে। কমপিউটরের হার্ডডিস্ক নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। যে ফ্লপি ডিস্কে এমথ্রীএক্স-এর ফর্মুলা ছিল সেটাও চুরি হয়েছে। দায়ী তুর্কী গার্ড ইব্রাহিম দানু আর ফয়েজ রামদান। আন্ডারগ্রাউন্ডে একা শুধু রামদানকে পাওয়া গেছে, দানু নেই। রামদান শুধু একটা কথা স্বীকার করছে, চুরি করার পর দুটো ফাইলই ভেঙে ফেলে ওরা–দুর্ঘটনাবশত। রামদানের দ্বারা কমপিউটর অপারেটর আলবিনোও সংক্রমিত হয়েছে। দানু উঠে গেছে গ্রাউন্ডফ্লোরে, তার দ্বারা সেন্টারের সবারই সংক্রমিত হবার কথা।

সময় নষ্ট না করে পেন্টাগনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন জেনারেল লী মার্শাল। নির্দেশ আসতে সময় লাগল পনেরো মিনিট। সে নির্দেশে দয়ামায়ার ছিটেফোঁটাও থাকল না, 'বার্ন দেম অল।' একজনকেও বাদ দেয়া যাবে না, সবাইকে পুড়িয়ে মারতে হবে।

সেন্টারে যারা রাত থেকে ছিল, আর যারা আজ সকালে প্রোটেকটিভ সুট না পরে ভেতরে ঢুকেছে, সব মিলিয়ে এই পঁচিশজনকে আন্ডারগ্রাউন্ডে নামানো হলো, বলা হলো তারা সম্ভবত সংক্রমিত হয়েছে, তাই তাদেরকে কোয়ারানটিনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আন্ডারগ্রাউন্ডে, ল্যাব সেকশন থেকে দুশো গজ দূরে, বিশাল এক উনান বা চুল্লি আছে, ইংরেজিতে যেটাকে বলা হয় ক্রেম্যাটরিয়াম। ক্রেম্যাটরিয়ামে সাধারণত লাশই পোড়ানো হয়। 'অ্যান্টিডোট রিসার্চ সেন্টার'-এ ক্রেম্যাটরিয়াম আছে, এই তথ্য এমডিপিসি-র প্রধান লী মার্শাল ছাড়া আর মাত্র দু'একজন জানে। তিনি প্রকাশ করায় তাঁর সঙ্গে আগত চল্লিশজন মার্কিন সৈন্যও এখন জানল। তথ্যটা জানিয়ে কি করতে হবে তা-ও তিনি বলে দিলেন।

আলবিনো আর রামদানকে বাদে বাকি পঁচিশজনকে ক্রেম্যাটরিয়ামে ঢুকিয়ে

বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয়া হলো ইস্পাতের গেট। সুইচ টিপে চালু করা হলো বিশাল উনান। জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হলো সবাইকে।

ইতিমধ্যে মার্শালের নির্দেশে ল্যাবের আরেক প্রান্তের একটা কাঁচ ঘেরা কোয়ারানটিন চেম্বারে নিয়ে আসা হয়েছে রামদান আর আলবিনোকে। চেম্বারে কোন জানালা বা ফার্নিচার নেই, শুধু দুটো বেড আছে। বেডে শুয়ে আছে রামদান আর আলবিনো। প্রোটেকটিভ সুট পরা সামরিক বাহিনীর তিনজন ইন্টারোগেটর তাদেরকে জেরা করছে। আলবিনোকে প্রশ্ন করে তেমন কিছুই জানতে পারেনি তারা। তার প্রতিরোধ-শক্তি এতই কম যে এরইমধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার সময় হয়ে গেছে। কোটর ছেড়ে এক-দেড় ইঞ্চি বেরিয়ে এসেছে চোখ, টপ টপ করে রক্ত ঝরছে ওগুলো থেকে। মাংস থেকে আলাদা হয়ে গেছে চামড়া, ভেজা কাগজের মত নরম সামান্য নড়াচড়াতেই ভাঁজ খেয়ে যাচ্ছে, ঘষা খেলে খুলে আসছে গা থেকে। সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থা জিভের, ফুলে চার গুণ হয়ে গেছে, ফলে হাঁ করে থাকতে বাধ্য হচ্ছে সে, কথা বলতে চেষ্টা করলে টপ টপ করে রক্ত ঝরছে।

এই মুহূর্তে সামরিক বাহিনীর ইন্টারোগেটররা রামদানকে জেরা করছে। প্রথম দফা ইন্টারোগেট করার সময় যা বলার বলেছে, শত চেষ্টা করেও তার মুখ থেকে নতুন কোন কথা এখন আর আদায় করা যাচ্ছে না। তার শরীরেও সংক্রমণের লক্ষণ ফুটতে শুরু করেছে, তবে অত্যন্ত ধীরগতিতে। ইন্টারোগেটরদের মধ্যে একজন ডাক্তার আছেন, রেডিও-টেলিফোন সেটে জেনারেল মার্শালকে তিনি রিপোর্ট করলেন, 'আলবিনো আর পাঁচ মিনিট বাঁচবে। তবে রামদান বাঁচবে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা।'

আলবিনো ঠিকই পাঁচ মিনিট পরে মারা গেল। রামদান মারা গেল দু'ঘণ্টা পর। কোয়ারানটিন চেম্বারে ঢোকার পর ইন্টারোগেটদের কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেয়নি সে।

ইতিমধ্যে, সাড়ে ন'টার সময়, বেড়ার বাইরে প্রোটেকটিভ সুট পরা একশো সৈনিকদের যে দলটা পাহারা দিচ্ছিল তাদের মধ্যে থেকে পঞ্চাশজনকে পাঠানো হয়েছে দানুর খোঁজে।

দেড় ঘণ্টা পর, এগারোটার সময় শেষ মেসেজ পেলেন লী মার্শাল, দানুকে তারা এখনও খুঁজে পায়নি।

এমথ্রীএক্স-এর দ্বারা সংক্রমিত ইব্রাহিম দানু জেনেভা শহরে জনারণ্যে হারিয়ে গেছে, এর ভয়াবহ তাৎপর্য যার জানা আছে তার হয় আত্মহত্যা করার কথা, নয়তো হার্টফেল করে মারা যাওয়ার কথা। কারণ এমথ্রীএক্স-এর কোন প্রতিষেধক নেই, আর ভাইরাসটা সংক্রমিত ব্যক্তির থুথু, কফ, রক্ত, ঘাম আর স্পর্শের মাধ্যমে ছড়ায়। দানু যদি রিসার্চ সেন্টার থেকে বেরিয়ে কফ-থুথু-রক্ত-ঘাম না ঝরিয়ে কাউকে স্পর্শ না করে কোন নির্জন বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে থাকে, তাহলে জীবাণুটা এখুনি ছড়াবে না। কিন্তু সে যদি রাস্তা দিয়ে লোকের ভিড়ে হাঁটে, যদি কোন দোকানে ঢোকে, কিংবা বাসে চড়ে, তাহলে ডজন ডজন লোক সংক্রমিত হবে। তারা সংক্রমিত করবে হাজার হাজার লোককে, হাজার হাজার লোক অসুস্থ করে

তুলবে লাখ লাখ মানুষকে, লাখ লাখ মানুষ...

তবে না, জেনারেল মার্শাল আত্মহত্যা করার কথা ভাবছেন না। ইস্পাতের চেয়েও শক্ত সম্ভবত টাইটেনিয়াম দিয়ে তৈরি তাঁর হার্ট; দানুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে তাঁর এমনকি হার্টবিট দ্রুততও হলো না।

মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিন্তা করতে বসলেন জেনারেল মার্শাল। এগারোটা পাঁচ মিনিটে হঠাৎ একটা চিন্তা ঢুকল তাঁর মগজে। ইব্রাহিম দানু ফ্লপি ডিস্ক অর্থাৎ এমথ্রীএক্স-এর ফর্মুলা নিয়ে পালিয়েছে। সে জানে সে সংক্রমিত, কাজেই বাঁচার কোন আশা নেই। তাহলে ফ্লপি ডিস্ক নিয়ে কি করবে সে? নিশ্চয়ই কাউকে দেবে। কাকে দেবে? কোথায় দেবে?

এইভাবে চিন্তা করতে করতে জেনারেল মার্শাল সন্দেহ করলেন, দানু নিশ্চয়ই ফোনে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। দানু কিংবা রামদান। নির্ঘাত মারা যাচ্ছে জানতে পারলে মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে, তখন বোকার মত ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করে না। দানু বা রামদান হয়তো কাউকে ফোন করেছিল এই রিসার্চ সেন্টার থেকেই। দু'জন সৈনিককে ডেকে জেনারেল মার্শাল নির্দেশ দিলেন, 'চেক করে দেখো, আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে বাইরে কোন ফোন গেছে কিনা।'

প্রতিটি ফোনকল টেপ করা হয়। টেপ রেকর্ডারের রীল রিওয়াইন্ড করে শোনা হলো। দেখা গেল মার্শাল ঠিকই সন্দেহ করেছেন। ফ্রান্সের ইরাকী দূতাবাসে ফোনটা করা হয়। ফোনে রামদান ও ইরাকী অ্যামব্যাসাডরের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল, মন দিয়ে দু'বার শুনলেন তিনি। ঘড়িতে তখন এগারোটা বেজে সতেরো মিনিট।

পেন্টাগনে ফোন করলেন মার্শাল। পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটা ধারণা দিলেন। সবশেষে জানতে চাইলেন, 'এখন কি করা? গোটা ইউরোপ জনমানবশূন্য হয়ে যাবে, আর আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব?'

'ধরে নিতে হবে সে এরইমধ্যে ট্রেনে চড়ে বসেছে,' পেন্টাগন থেকে জবাব এল। 'এখন আর তাকে নামিয়ে এনে কোন লাভ নেই। কমপিউটর বলছে, ওই ট্রেনে যাত্রীর সংখ্যা একহাজারের বেশি তো কম নয়। সম্ভবত এরইমধ্যে কয়েকশো যাত্রী সংক্রমিত হয়েছে।'

'তাহলে?'

'এমডিপিসি-তে ফিরে যান আপনি, ফিরেই গোটা ইউরোপে রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করুন। তার আগে, এই মুহূর্তে, এঞ্জিনিয়ার কোর-এর একজন অফিসারকে পাঠান স্টেশনে, সে একটা স্লীপার রেখে আসুক এঞ্জিন রুমে। আমরা এখানে প্রেসিডেন্ট আর তাঁর উপদেষ্টাদের নিয়ে মীটিঙে বসছি, কি সিদ্ধান্ত হয় পরে জানাচ্ছি আপনাকে। আর, হ্যাঁ, আপনি একটা ভুল করেছেন।'

'ইয়েস?'

'গোটা ইউরোপ জনমানবশূন্য হয়ে যাবে, আপনি বললেন। কথাটা ঠিক নয়, জেনারেল মার্শাল। মাল্টিপল্ এক্সএক্সএক্স গোটা গ্লোবটাকে প্রাণীশূন্য করে ফেলবে। স্তন্যপায়ী প্রাণী বলতে কোথাও কিচ্ছু থাকবে না। আমাদের এই গ্রহটাই মারা যাবে, জেনারেল।'

জেনারেল মার্শাল বাধা দিয়ে বললেন, 'কিন্তু এই ভাইরাসের আয়ু তো মাত্র বিশ ঘণ্টা!'

'পৃথিবীর সর্বশেষ মানুষটি বা প্রাণীটি যখন সংক্রমিত হবে, তার বিশ ঘণ্টা পর সর্বশেষ এমথ্রীএক্স ভাইরাস মারা যাবে, কারণ ছড়াবার জন্যে প্রয়োজনীয় "বডি" পাবে না। ভাইরাস মারা যাবে ঠিকই–কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে না কি?'

'ওহ্ গড! ওহ্ জিসাস!'

'হ্যাঁ, এখন ওঁদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই।'

দুই

প্রতিদিন দুপুর ঠিক বারোটায় দা ট্রান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেস গাখ দ্য কখনাভি থেকে রওনা হয়। গন্তব্য ব্যাসেল, প্যারিস, ব্রাসেলস, আমস্টারডাম, কোপেনহেগেন হয়ে স্টকহোম। ঊনত্রিশ ঘণ্টা বাহান্ন মিনিটের যাত্রা, পথে বেশ কয়েক জায়গায় থামলেও প্রত্যাশিত সময়সূচি রক্ষায় সাধারণত ব্যর্থ হয় না। ইলেকট্রিক এঞ্জিন, বহন ক্ষমতা ত্রিশ হাজার টন। সব মিলিয়ে ষোলোটা কার, ডাইনিং, ব্যাগেজ ও পোস্টাল কমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটি সহ। প্রতিটি কার-এ কয়েকটা করে কমপার্টমেন্ট, প্রতিটি কমপার্টমেন্ট আকারে বেয়াল্লিশ বর্গফুট, বাইরের করিডর ঊনচল্লিশ ইঞ্চি চওড়া। সাতটা কার সেকেন্ড ক্লাস, দুটো সেকেন্ড-ক্লাস স্লীপার, দুটো ফার্স্ট ক্লাস, দুটো ফার্স্ট-ক্লাস স্লীপার বা ওয়্যাগন-লিট। বারোশো যাত্রী উঠলে ট্রেন ভর্তি হয়ে যায়, তবে তা বিরল ঘটনা।

অবশ্য আজ শুক্রবার দুপুরের ট্রেন পুরোপুরি ভর্তি হয়ে গেছে। ফার্স্ট-ক্লাস স্লীপারের কয়েকটা সীট খালি থাকলেও, সেকেন্ড ক্লাসে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি লোক উঠেছে। ভাড়া বেশি হওয়ায় ফার্স্ট-ক্লাস স্লীপারে ঢুকতে রাজি নয় তারা, তাই আলগা সীট ফেলে করিডরে জায়গা দেয়া হয়েছে তাদেরকে। যাত্রীর সংখ্যা আজ এতই বেশি, পরিস্থিতি সামাল দিতে কনডাকটারদের রুটিন এলোমেলো হয়ে গেল, ফলে ট্রেন ছাড়ল নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট পর, অর্থাৎ বারোটা পাঁচে।

এই মুহূর্তে ট্রেনেই থাকার কথা চেলসি মেয়রের, কিন্তু সে রয়েছে প্ল্যাটফর্মে, ট্রেনের নাগাল পাবার জন্যে তীরবেগে ছুটছে। কোমরে ব্লু জিনস, পায়ে কেডস, গায়ে খাকি সুতি শার্ট, গলায় পাথর বসানো সোনার হার। তার দুই হাতে ছোট আকারের দুটো সুটকেস, বগলে একটা লেদার হ্যান্ডব্যাগ, লম্বাটে গলা থেকে ঝুলছে একজোড়া নিকন ক্যামেরা। মেয়েটার বয়স ছাব্বিশ, অসম্ভব ছটফটে। নতুন গজানো কচি পাতার মত, তার ত্বক থেকেও যেন আলো প্রতিফলিত হয়। তার দৌড় চিতার মতই ক্ষিপ্র, তবে বুকে উথলানো কোন ভাব নেই, নিতম্বেও নেই প্রবল আলোড়ন। এ মেয়ে খাওয়ার জন্যে বেঁচে নেই, বেঁচে থাকার জন্যে

খায়।

অনেক প্যাসেঞ্জারই জানালা দিয়ে মুখ বের করে দিয়েছে। কেউ শুধু দৃশ্যটা উপভোগ করছে। দু'একজন উৎসাহও দিচ্ছে। ট্রেনের সঙ্গে একই গতিতে ছুটছিল চেলসি, কিন্তু ট্রেনের গতি ক্রমশ বাড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখন আর পেরে উঠছে না। 'দরজা খুলুন!' চিৎকার করল সে। 'কেউ একটা দরজা খুলে দিন!' ছোটার গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েও কোন লাভ হচ্ছে না, ট্রেনের দরজাগুলো তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। রাগে লাল হয়ে উঠেছে চেহারা।

তরুণ একদল সৈনিক গলা ছেড়ে হেসে উঠল। তারপর শুরু হলো তালে তালে হাততালি। মেয়েটার অসহায় অবস্থা উপভোগ করছে সবাই, দরজা খুলে সাহায্য করার কথা ভাবছে না।

'জানোয়ার!' আক্রোশে গাল দিল চেলসি মেয়র।

কৌতুকপ্রিয় প্যাসেঞ্জাররা আরও জোরে হেসে উঠল।

তারপর হঠাৎ একটা দরজা খুলে গেল। অদৃশ্য এক লোকের শক্ত একটা হাত বেরিয়ে এল বাইরে। মরিয়া হয়ে হাতটার নাগাল পাবার চেষ্টা করল চেলসি। দুই হাতের আঙুল পরস্পরকে ছুঁলো। কিন্তু পরমুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যোগাযোগ। হতাশ হয়ে হাতটা নামিয়ে নিতে যাচ্ছে চেলসি, পরাজয় মেনে নিয়েছে। ট্রেন থেকে বাইরে ঝুঁকে তার হাতটা শক্ত করে ধরে ফেলল অপরিচিত প্যাসেঞ্জার, টান দিল ওপর দিকে। প্ল্যাটফর্ম থেকে শূন্যে উঠে পড়ল চেলসি, উড়ে চলে এল লোকটার গায়ের ওপর। লোকটা তাল হারিয়ে ফেলল। দু'জনেই ওরা ছিটকে পড়ল করিডরের মেঝেতে। চেলসি চিৎ হয়ে, হাত-পা ছড়িয়ে। লোকটা উপুড় হয়ে, চেলসির ওপর।

এক মুহূর্ত পড়ে থাকল ওরা ওখানে, দু'জনের কেউই বুঝতে পারছে না কি করবে। একটা ক্যামেরা দু'জনের শরীরের মাঝখানে আটকা পড়েছে, একটা স্তনে ব্যথা অনুভব করছে চেলসি। 'আপনি আমার লেন্স ভেঙে ফেলছেন,' তিক্ত গলায় বলল সে।

এক ঝটকায় সিধে হলো মাসুদ রানা, সাহায্যের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল। হাতটা ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিল চেলসি, রানার দিকে ভাল করে না তাকিয়েই ঝট করে উঠে বসল। নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে লাফ দিয়ে সিধে হলো, করিডর ধরে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে–একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিল না।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। তবে এখনও মেয়েটার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না। লাগেজ আর ক্যামেরাগুলো শরীর থেকে বেঢপ ভঙ্গিতে ঝুলছে, অথচ হাঁটার মধ্যে এতটুকু আড়ষ্ট বা অপ্রতিভ কোন ভাব নেই।

ইতিমধ্যে লেক জেনেভার ডান পাড় ধরে ফুল স্পীডে ছুটতে শুরু করেছে ট্র্যান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেস, দূরের আকাশে মাথাচাড়া দিচ্ছে পাহাড়ের চূড়া। সুইস আসমান স্বচ্ছ নীল। দুপুরের আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, তবে রোদে কোন জ্বালা নেই। ঢাল বেয়ে উত্তর দিকে উঠে যাচ্ছে ট্রেন।

একটা ওয়্যাগন-লিট কারের ভেতর হাঁটছে স্টুয়ার্ড মার্ক টাওয়েল, দু'হাতে এক

শাদা লিনেন, বুকের কাছে স্তূপ হয়ে আছে। হঠাৎ তার কান সজাগ হয়ে উঠল। দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কিন্তু কই, কিছু শুনতে পাচ্ছে না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের পথে চলে গেল সে।

এক মুহূর্ত পর খালি একটা কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল ইব্রাহিম দানু। তার চোখ এখনও পুরোপুরি লাল হয়নি, তবে জ্বালা করছে। গায়ে এখনও কোন ফোস্কা পড়েনি, চামড়াও ঢিলে হতে শুরু করেনি, তবে সুড়সুড়ি অনুভব করছে। খানিক আগে খুলি চুলকাতে গিয়ে হাতে চলে এসেছিল কয়েক গোছা চুল, সেই থেকে ভয়ে মাথায় হাত দিচ্ছে না। সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে শ্বাসকষ্ট। রীতিমত হাঁপাচ্ছে ও।

চোরের মত চুপিচুপি, নার্ভাস ভঙ্গিতে পা বাড়াতে যাবে, এই সময় কার-এ একজন কনডাকটারকে ঢুকতে দেখে স্যাৎ করে পিছিয়ে এল কমপার্টমেন্টের ভেতর।

রাস্তা থেকে একটা সাইকেল চুরি করে স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হয় দানু। সাইকেলটা পরে কেউ ব্যবহার করলে সে-ও সংক্রমিত হবে, তাই ওটাকে লেকে ফেলে দিয়েছে। আশপাশে দু'একজন লোক ছিল, তারা ওর আচরণ দেখে ধরে নিয়েছে ব্যাপারটা স্রেফ অবহেলাজনিত দুর্ঘটনা। লেক থেকে স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে এসেছে সে, পথে কারও সঙ্গে ধাক্কা খায়নি, থুথু বা কফও ফেলেনি কোথাও। ঠিক দশটার সময় স্টেশনে পৌঁছায় সে। সঙ্গে একটা ওয়্যাগন-লিট কার-এর কমপার্টমেন্ট ভাড়া করার টাকা ছিল, কিন্তু টিকিট কাউন্টারে প্রচণ্ড ভিড় দেখে কাছে যাবার সাহস হয়নি। এমথ্রীএক্স ভাইরাস কতটা বিপজ্জনক, বিজ্ঞানীদের আলোচনা শুনে তার একটা ধারণা আছে। এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়লে দুনিয়ার কোন প্রাণী বাঁচবে না। দানু বুঝতে পারে, আল্লাহ তাকে কঠিন একটা পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন। ওদের এত সুন্দর এই গ্রহটা তিনি যেন তার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন, এটাকে এখন তাকেই যেন রক্ষা করতে হবে।

টিকেট কাটতে না পেরে প্ল্যাটফর্মে চলে আসে দানু, খালি ট্রেনেই উঠে পড়ে। সকাল তখন মাত্র দশটা। সেই থেকে ওয়্যাগন-লিট কার-এর একটা কমপার্টমেন্টে লুকিয়ে আছে। তার আশা ছিল, ওয়্যাগন-লিট কমপার্টমেন্টের সীট ভাড়া যেহেতু খুব বেশি, দু'একটা কমপার্টমেন্ট নিশ্চয়ই খালি থেকে যাবে। আছেও তাই। ফলে এতক্ষণ লুকিয়ে থাকতে তার কোন অসুবিধে হয়নি, কাউকে সংক্রমিত করার ঝুঁকিও নিতে হয়নি।

এমথ্রীএক্স নিয়ে বিজ্ঞানীরা আলোচনা করতেন আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনে, অন্যমনস্কতার ভান করে সে-সব আলোচনা মন দিয়ে শুনেছে দানু। একটা ব্যাপারে তারা সবাই একমত ছিলেন, এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে শারীরিক প্রতিক্রিয়া একেকজনের একেক রকম হয়। বেলা সাড়ে দশটার সময় এই কথার তাৎপর্য প্রথম উপলব্ধি করে দানু। বিজ্ঞানীদের সাধারণ একটা ধারণা ছিল, সংক্রমিত ব্যক্তির খিদে নষ্ট হয়ে যাবে, তবে পানির তেষ্টা বাড়বে। দানুর হয়েছে ঠিক উল্টোটা। খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছে সে, কিন্তু পানির কোন পিপাসা নেই। পিপাসাও নেই, ঘামছেও না। ঘামছে না, এটা একটা ভাল লক্ষণ। কারণ

সংক্রমিত ব্যক্তির ঘামেও জীবাণুটা থাকে। কিন্তু খিদেটা তাকে পাগল করে তুলছে। মনে হচ্ছে পেটে কিছু দিতে না পারলে বাধ্য হয়ে নিজের হাতের মাংস ছিঁড়ে খেতে হবে। বিবেকবান, মহৎহৃদয় মানুষ দানু; পালাবার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত সাবধানে আছে কেউ যাতে তার মাধ্যমে সংক্রমিত না হয়। অথচ খিদের প্রচণ্ড জ্বালায় এতটাই অস্থির হয়ে উঠেছে সে, কমপার্টমেন্ট থেকে না বেরিয়ে পারেনি।

লিনেন-এর স্তূপ জায়গামত রেখে এসে করিডর ধরে হাঁটছে টাওয়েল, গলা চড়িয়ে চিৎকার করছে, 'লাঞ্চ রিজার্ভেশন! লাঞ্চ রিজার্ভেশন!' হঠাৎ সুন্দর ও পরিচিত একটা মুখ দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। দেখেই চেলসি মেয়রকে চিনতে পেরেছে। টিভির রিপোর্টার, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রতিবেদনও লেখে–কে না চিনবে! 'ম্যাডাম, প্লীজ, আমি কোন সাহায্যে আসতে পারি?'

ট্রেনে নিজের কমপার্টমেন্ট খুঁজে পাচ্ছে না চেলসি, ফলে রেগে আছে খুব। রাগটা অবশ্য নিজের ওপরই। টিকিট আগে থেকেই কাটা ছিল, কিন্তু স্টেশনে পৌঁছুতে দেরি করে ফেলে সে। হাতের টিকিটটা স্টুয়ার্ড টাওয়েলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে তিক্ত সুরে জিজ্ঞেস করল, 'এটা ফার্স্ট ক্লাস কিনা বলো।'

'জ্বী-না, ম্যাডাম,' মাথা নেড়ে বলল টাওয়েল। 'আপনি জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব, আর ওয়্যাগন-লিট কমপার্টমেন্ট শুধু তাঁদেরই জন্যে।'

ঘামে ভেজা নিজের জিনস আর খাকি শার্টের দিকে তাকাল চেলসি, নিজেকে রীতিমত নোংরা মনে হলো। টাওয়েলের হাত থেকে ছোঁ দিয়ে টিকিটটা নিয়ে আবার করিডর ধরে এগোল সে, বোঝার ভার তাকে এতটুকু ক্লান্ত করতে পারেনি।

সুন্দরী মেয়েদের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা আছে তরুণ টাওয়েলের। তবে মিষ্টি প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ পেলে কখনও সেটা হাতছাড়া করে না। চেলসি মেয়র উল্টোদিকে যাচ্ছে দেখেও বাধা দিল না, ঠোঁটে মুচকি হাসি নিয়ে তাকিয়ে থাকল। হন হন করে হাঁটার সময় চেলসি খেয়াল করল না, তার ক্যামেরার একটা স্ট্র্যাপ পাশের দরজার হাতলে আটকে গেল, ফলে হোঁচট খেলো সে, অভিশাপ দিল–সম্ভবত নিজেকেই। চেলসি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে পারে, তাই তাড়াতাড়ি অন্য দিকে ফিরে আবার চিৎকার করল টাওয়েল, 'লাঞ্চ রিজার্ভেশন!'

ফার্স্ট ক্লাস বা সম্ভব হলে আরও উন্নতমানের সম্পূর্ণ আলাদা একটা কমপার্টমেন্ট চাই তার, ট্রাভেল এজেন্টকে নির্দেশ দিয়েছিল চেলসি। গন্তব্য কোপেনহেগেন, দীর্ঘ ট্রেন জার্নিটা ঝামেলাবিহীন একা উপভোগ করতে চায়। ফরচুন ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে ডেনিশ আর্ট ফেয়ার কাভার করতে যাচ্ছে সে, সমস্ত খরচ তাদের, কাজেই বিলাসিতা করার এই সুযোগ কেন সে হাতছাড়া করবে!

চেলসি একবারই প্রেমে পড়েছিল। ছেলেটা ছিল লম্বা ও ঋজু। একজন পেইন্টার। সে বিশ্বাস করত, শিল্পই ঈশ্বর, আর ঈশ্বরকে জানার একটাই উপায়–নিজেকে ক্রুসবিদ্ধ করা, নিজের হৃদয়ে একের পর এক পেরেক গাঁথা। চেলসিকে সেই ছেলে অগুনতি পেরেকের একটা বলে গ্রহণ করে। ব্যাপারটা যখন

ধরতে পারল চেলসি. ক্রস-এর ভেতর ততদিনে কয়েক ইঞ্চি সেঁধিয়ে গেছে সে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে দীর্ঘ এক বছর তীব্র যাতনা সইতে হয় তাকে সেই ছেলের কথা মনে পড়লে এখন আর তার মনে কোন অনুভূতিই জাগে না।

এই মুহূর্তে একা শুধু নিজের ওপরই রেগে আছে চেলসি। আজ তার হয়েছেটা কি? একের পর এক শুধু ভুলই করছে!

করিডর থেকে একটা কার-এ ঢুকল স্টুয়ার্ড টাওয়েল। ব্যস্ততার ভান করছে সে, আসলে সুন্দরী কোন মেয়ে দেখলে আলাপ জমাবার ইচ্ছা। আরে, কি আশ্চর্য, এদিকের করিডরেও তো দেখছি পরিচিত একটা মুখ! মনে মনে অবাকই হলো টাওয়েল। দু'দিন আগে এই ট্রেনেই ভদ্রলোকের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। পরিষ্কার মনে আছে, প্যারিস থেকে উঠেছিলেন, নেমেছেন জেনেভায়। কিছু লাগবে কিনা বারবার জিজ্ঞেস করায় আমেরিকান বিশ ডলারের একটা কড়কড়ে নোট বকশিশ দিয়েছিলেন। 'স্যার,' বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলল সে, 'আপনার নামটা আমার মনে আছে। আপনি মাসুদ রানা, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। নিশ্চয়ই আবার প্যারিসেই ফিরে যাচ্ছেন, স্যার?'

হেসে ফেলল রানা। 'না, এবার শেষ মাথা পর্যন্ত যাব–স্টকহোমে।'

'আপনার যদি গাইডবুক, স্ট্রীট ম্যাপ বা ম্যাগাজিন লাগে, আমাকে বলবেন, স্যার,' জানিয়ে রাখল টাওয়েল। 'আমার কাছে প্রচুর কালেকশন আছে...'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'দুঃখিত । সুইডিশ ভাষা এক বর্ণও বুঝি না।' ও জানে, স্টুয়ার্ড ওকে সুইডিশ পর্নোগ্রাফি কেনার প্রস্তাব দিচ্ছে। ছোকরার ওপর রাগ হলো, তবে আর কিছু বলল না।

টাওয়েলও নিজের ভুল বুঝতে পেরে কমপার্টমেন্ট ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

রানা জেনেভায় এসেছিল ড. নাসিমুল গনির আমন্ত্রণে। ভদ্রলোক বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের বন্ধু, সেই সূত্রে রানার সঙ্গে পরিচয়। সম্পর্কটা অকৃতিম শ্রদ্ধা ও স্নেহের, তবে খানিকটা পেশাগতও বটে। রানা জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন-এর একজন অন্যতম কমান্ডার, ড. নাসিমুল গনিও জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন অর্থাৎ 'হু'-র অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান 'রেমিডি'-র প্রধান। 'রেমিডি'-তে কেমিক্যাল অ্যান্ড বায়োলজিকাল ওঅরফেয়ার নিয়ে গবেষণা করা হয়। বছরে দু'একবার সময়-সুযোগ পেলে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওরা, দুনিয়ার হাল-হকিকত সম্পর্কে মত বিনিময় করে। রানা প্যারিসে একটা কাজে এসেছে, খবর পেয়ে ওকে জেনেভায় ডিনার খাবার আমন্ত্রণ জানান ভদ্রলোক। নিজেদের পেশা, দেশের খবরাখবর, বিশ্ব অর্থনীতির মন্দাভাব, মার্কিন প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্ট, নিজেদের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ইত্যাদি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। জেনেভায় আরও কাজ ছিল রানার, সে-সব সেরে দু'দিন পর একই ট্রেনের ফিরতি যাত্রায় এখন চলেছে সুইডেনে, রানা এজেন্সির স্টকহোম শাখায়।

নিমোক্রাইচেক-এর বয়েস সত্তর, দেখে মনে হয় পঞ্চাশ। নিজের দেশ

বেলজিয়ামে ফিরছে, নামবে ব্রাসেলস-এর পরের স্টেশনে। এই মুহূর্তে একটা সেকেন্ডে ক্লাস কার-এর করিডরে রয়েছে সে, ভিড় ঠেলে এগোতে গলদঘর্ম হচ্ছে। হাতে অসম্ভব ভারী বিরাট একটা সুটকেস। আরোহীদের কারও সঙ্গেই তার পরিচয় নেই, অথচ কৌতুকপ্রিয় নাটুকে চরিত্রের হাসি লেগে আছে চোখে-মুখে, কারও সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সবিনয়ে মাথা নত করে সম্মান জানাতে ভুল করছে না। এটা তার নিজের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার একটা কৌশল। করিডরে ফেলা একটা সীটে অত্যন্ত সাবধানে সুটকেসটা রাখল, চারদিকে চোরা-চোখে চোখ বুলিয়ে ঢাকনিটা সামান্য একটু খুলল। সুটকেসের ভেতর থেকে টিক-টিক করে অস্পষ্ট শব্দ বেরুচ্ছে। আশপাশে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছে শব্দটা তারা অনেকেই শুনতে পেল। শোনানোই ক্রাইচেকের উদ্দেশ্য। 'অ্যাটেনশন!' গলা চড়িয়ে বলল সে, প্রথমে ইংরেজিতে, তারপর জার্মান ও ফ্রেঞ্চ ভাষায়।

লোকজন সব ঘুরে যাচ্ছে, অদ্ভুত দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ক্রাইচেককে। সুটকেসের ওপর একটা হাত রাখল সে, ভেতরে কি আছে তা কেউ দেখতে পাচ্ছে না। আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন না? যদি পান, তাহলে বলুন কিসের শব্দ এটা?' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপাল মোছার ভঙ্গি করল সে, অথচ সেখানে এক বিন্দু ঘাম নেই। মুখের হাসিটাও অদৃশ্য হয়েছে, এখন রীতিমত গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে।

অকস্মাৎ নিস্তব্ধতা নেমে এল করিডরে। আরোহীরা কেউ নড়ছে না। সবার চোখে সন্দেহ। দু'একজনকে নার্ভাস দেখাচ্ছে।

'টিক...টক...টিক...,' সুটকেস থেকে আওয়াজ বেরুচ্ছে।

'এটা কি একটা সুটকেস-বোমা? আমি কি একজন হাইজ্যাকার?' শয়তানি হাসি ফুটল ক্রাইচেকের ঠোঁটে। 'আমার উদ্দেশ্য কি আপনাদের জিম্মি করা? সবিনয়ে জানাই—জ্বী-না। আমি আসলে একজন জাদুকর। আর আমার কাজ হলো মন্ত্রবলে আপনাদের পকেটের টাকা নিজের পকেটে নিয়ে আসা। কিন্তু আপনারা যদি আমাকে পকেটমার বলেন, আমি দুঃখ পাব। কারণ আমি পকেট কাটি ঠিকই, তবে বিনিময়ে কিছু না দিয়ে নয়। আপনারা যার যা খুশি নিতে পারেন—নিজেরাই বাছাই করুন, প্লীজ!' নাটকীয় ভঙ্গিতে সুটকেসের ডালাটা পুরোপুরি উন্মুক্ত করল সে।

সুটকেসের ভেতর সস্তাদরের কয়েকশো ঘড়ি রয়েছে। আরও আছে সিগারেট লাইটার, ট্র্যানজিসটর রেডিও ইত্যাদি। শুধু কোরিয়ায় তৈরি প্যাকেট ভর্তি কনডমগুলো পুরোপুরি নয়, আংশিক দেখা যাচ্ছে।

আরোহীদের পেশীতে ঢিল পড়ল। হেসে উঠল কেউ কেউ।

ক্রাইচেক আসলে ফেরিঅলা, সে তার পসরা নিয়ে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। নিজেকে সে কৌতুকপ্রিয় নাটুকে চরিত্র হিসেবে চালাবার চেষ্টা করে, মনের গভীরে জমে থাকা সাগরের মত বিশাল একটা শোক ভুলে থাকার জন্যে। মানুষজনের ভিড় পছন্দ করে ক্রাইচেক, কারণ একা হলেই শোকটা তাকে চেপে ধরে কাবু করে ফেলে। সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে দেখে মনে মনে খুশি হয় সে, হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে চেহারা। 'এই দেখুন,' বলে সুটকেসের ভেতর

থেকে বড় আকৃতির একটা ঘড়ি বের করল, তাতে অনেকগুলো ডায়াল চকচক করছে। 'দুনিয়ার বিস্ময়কর একটা আবিষ্কার। কিনে নিন, ছেলেকে উপহার দিন, ছেলে আপনাকে জাদুকর বলে মনে করবে!'

কেউ একজন ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে–দানু।

'এত বড় ঘড়ি, আপনারা সবাই তাকিয়ে আছেন, কাজেই গায়েব করে দেয়া সম্ভব নয়, অথচ...,' জাদুকরের মতই খালি দু'হাত দর্শকদের সামনে মেলে ধরল সে, '...কোথায় গেল সেটা? নেই কেন?' ঘড়িটা সত্যি তার হাতে নেই, দেখে হেসে উঠল সবাই, কেউ কেউ হাততালি দিল।

সুটকেসের ভেতর হাত গলিয়ে সেই ঘড়িটাই আবার বের করল ক্রাইচেক। ডায়ালে আলো লাগায় প্রতিফলিতি হলো সেটা, দানুর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ঝট করে হাত তুলে চোখ দুটো আড়াল করল সে।

দানু ঘামছে না, তবে তার শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে। ঘন ঘন হাঁপাচ্ছিল, হঠাৎ খক খক করে কাশতে শুরু করল।

ভিড়ের আরেক মাথায় একজন কনডাক্টরকে দেখা গেল, জটলার কারণ দেখতে আসছে। ভ্রাম্যমাণ দোকান তাড়াতাড়ি গুটিয়ে ফেলল ক্রাইচেক। ঝট করে ঘুরে টলতে টলতে ফিরে যাচ্ছে দানু।

নিজের কমপার্টমেন্টে ঢুকতে যাবে রানা, এই সময় আবার চেলসিকে দেখতে পেল। নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে মেয়েটা, প্রতিটি কমপার্টমেন্টের ডোরপোস্ট পরীক্ষা করতে করতে এদিকেই এগিয়ে আসছে। চোখাচোখি হতে নিজের কমপার্টমেন্টের পাশেরটা হাত তুলে দেখাল রানা। 'এটাই আপনার কমপার্টমেন্ট, চেলসি মেয়র–আমার পাশেরটা।'

চেলসির চোখে প্রশ্ন–আপনি কিভাবে জানলেন? পরমুহূর্তে চেহারায় 'প্রবেশ নিষেধ' সাইনবোর্ড ঝোলাল, অর্থাৎ অবহেলার সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিল। রানার পাশে দাঁড়িয়ে পাশের কমপার্টমেন্টের সঙ্গে নিজের টিকিটের নম্বর মেলাচ্ছে।

'জানতে ইচ্ছে করছে না এত খবর আমি পেলাম কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা, চেলসিকে বোঝা নামাতে হিমশিম খেতে দেখেও সাহায্য করছে না।

'জিজ্ঞেস না করলেও আপনি বলবেন,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল চেলসি, রানার দিকে এখনও ভাল করে তাকাচ্ছে না। কমপার্টমেন্টের দরজা খুলে ভেতরে জিনিস-পত্র ঢোকাচ্ছে।

'স্টুয়ার্ড টাওয়েল। আপনার ফ্যান। আপনার সমস্ত লেখাই সে পড়ে...ম্যাগাজিন সংগ্রহ করা তার একটা হবি।'

চেলসি কথা বলছে না।

চেলসির জিনিস-পত্রের মধ্যে একটা নিউজউইক পড়ে রয়েছে, সেটা তুলে পাতা ওল্টাচ্ছে রানা। 'টাওয়েল বলল, সবাই আপনাকে ভালবাসে।'

নিউজউইকের একটা পাতায় চোখ আটকে গেল রানার। এক বৃদ্ধের সাক্ষাৎকার নিয়েছে চেলসি, দু'জনেরই রঙিন ছবি ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। বৃদ্ধের মাথায় সব চুল পাকা, চোখে সানগ্লাস। তিনি আফ্রিকার একটা রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

সাক্ষাৎকারের একটা অংশ পড়তে শুরু করল রানা–

মেয়র: মি. প্রেসিডেন্ট, আপনার নিজের দেশের লোকজনই আপনাকে নিষ্ঠুর ডিকটেটর বলে অভিযুক্ত করছে।

প্রেসিডেন্ট ননসেন্স! যে এধরনের মিথ্যে দুর্নাম ছড়াবে তাকে গুলি করে মারা হবে…ইয়ে, আমি বলতে চাইছি…

মেয়র: ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট।

হেসে উঠল রানা, বলল, 'না, সবাই পছন্দ করবে না।'

'সবাইকে আমার দরকার নেই,' বিড়বিড় করল চেলসি, যেন নিজেকেই শোনাল।

লাগেজ ও ক্যামেরাগুলো কমপার্টমেন্টে ঢোকানোর পর দরজার কাছে ফিরে এল চেলসি, এতক্ষণে সরাসরি রানার চোখে তাকাল। মেয়েটা কিছু বলবে, তারই অপেক্ষায় রয়েছে রানা। ওর ধারণা, ঝগড়াটে ভাবটুকু কেটে গেছে, ভাব জমাবার একটা সুযোগ ওকে দেয়া হবে।

'দেখুন, মিস্টার,' বলল চেলসি। 'আপনি আমাকে ট্রেনে উঠতে সাহায্য করেছেন। ওখানে অনেকগুলো জানোয়ার ছিল, আপনি তাদের দলে পড়েন না। ধন্যবাদ। এবার যান, কেটে পড়ুন।' রানার মুখের ওপর দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল।

হতভম্ব রানা করিডরের এদিক ওদিক তাকাল। ব্যায়াম-পুষ্ট দর্শনীয় শরীর, এক লোক ব্রিদিং এক্সারসাইজ করছে খোলা একটা জানালার সামনে। সবই সে দেখেছে ও শুনেছে, চোখের দৃষ্টিতে সহানুভূতি ফুটে ওঠায় বোঝা গেল। বন্ধুত্বপূর্ণ, চওড়া হাসি বিনিময় করল ওরা। রানা নিজের কম্পার্টমেন্টে ঢুকল, টেনিস ইন্সট্রাক্টর পল নেলসনও ঢুকল নিজেদের কম্পার্টমেন্টে।

পল নেলসন ব্রিটিশ অভিনেত্রী ভেনাস ডেভনপোর্টের বয়ফ্রেন্ড, ভেনাসের সঙ্গে একই কমপার্টমেন্টে উঠেছে সে। দু'জন সমবয়েসী বলে দাবি করলেও, ভেনাসের চেয়ে বয়েসে দু'চার বছরের ছোটই হবে নেলসন।

কমপার্টমেন্টের ভেতর ভেনাস এই মুহূর্তে খুব ব্যস্ত, সুটকেস খুলে জিনিস-পত্র বের করে গুছিয়ে রাখছে। কমপার্টমেন্টে ঢুকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়াতে শুরু করল নেলসন, জগিং করছে।

'সত্যি কথা বলতে কি, ডার্লিং, এ-ধরনের দীর্ঘ ট্রেন জার্নি সাংঘাতিক পছন্দ করি আমি,' খুশিতে গদগদ হয়ে বলল ভেনাস। 'হিচককের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে…মনে পড়ে যাচ্ছে সাংহাই এক্সপ্রেসের সেই মারলিন-এর কথা…লাইনটা যেন কি ছিল…"ইট টুক মোর দ্যান ওয়ান ম্যান টু চেঞ্জ মাই নেম টু সাংহাই লিলি"।'

নেলসনের চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই। এ-সব সে বহুবার শুনেছে। তাছাড়া, কথা বলার সময় কোথায়–তার ভয়, সারাক্ষণ ব্যায়াম না করলে শরীর ভেঙে পড়বে।

'শুনছি ছবিটা রিমেক হবে,' বলল ভেনাস। 'তবে মারলিনের ভূমিকায় আমাকে বোধহয় মানাবে না।'

নেলসন জানে, এবার তাকে কিছু বলতে হবে। 'কি যেন বললে তুমি? কি ধরনের ট্রেন জার্নি তোমার পছন্দ?'

'ট্রেনে কোন আলো থাকবে না, আমরা মোমবাতি জ্বালব,' বলল ভেনাস। 'তুমি আমার পাশে বসে থাকবে, পরস্পরের হাত ধরে ফিসফাস করব আমরা।' আড়চোখে বিছানার দিকে একবার তাকাল। 'ভোর রাতের দিকে যখন ঘুম পাবে, তুমি আমাকে বুকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দেবে। ঘুমের মধ্যে আমি স্বপ্ন দেখব—আমার পিঠে গাছের পাতা ঘষা খাচ্ছে...'

'তোমার পিঠে কেন এত দাগ, রহস্যটা পরিষ্কার হলো,' না বলে পারল না নেলসন।

চেহারা ম্লান হয়ে গেল ভেনাসের, সুটকেস থেকে হুইস্কির একটা বোতল বের করে ছিপি খুলতে চেষ্টা করছে। বোতলটা তার হাত থেকে নিয়ে ছিপিটা খুলে দিল নেলসন, বলল, 'তুমি দেখছি ঠাট্টাও বোঝো না, ভেনাস। তোমার পিঠ, সত্যি বলছি, হাঙরের পেটের মত মসৃণ।'

হাসবে কিনা ভাবছে ভেনাস, নেলসনের দিকে চোখ তুলে বলল, 'আমি অ্যাটমের কথা ভাবছি।'

'অ্যাটম ভালই থাকবে। সে তো একটা চ্যাম্পিয়ান।'

হঠাৎ ক্ষোভে ফেটে পড়ল চেলি। 'আহা, রে, লক্ষ্মী সোনাটা আমার কি কষ্টেই না আছে!'

ব্যাগেজ কার-এ রয়েছে অ্যাটম, খেলনার মত দেখতে ছোট্ট একটা 'পুডল' কুকুরছানা। গলায় পাথর বসানো সোনার কলার, তাতে তার নাম লেখা, বসে আছে বেতের তৈরি একটা ঝুড়িতে।

ব্যাগেজ কার-এর আরেক অংশে, কয়েকটা বাক্সের আড়ালে, উবু হয়ে বসে রয়েছে দানু। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে সে, ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছে।

বারোটা পঞ্চাশ মিনিট।

মেগা ডেথ প্রিভেন্‌শন্‌ কমিটির গোপন মীটিং বসেছে আন্ডারগ্রাউন্ড কমান্ড সেন্টারে। কমিটির বারোজন স্থায়ী সদস্যের সবাই উপস্থিত, তাঁদের মধ্যে নয়জন পুরুষ, তিনজন মহিলা। কামরার চারদিকে বিভিন্ন স্তরে সাজানো রয়েছে আধুনিক ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট। একটা গ্লাস প্যানেলের পিছনে বসে রয়েছে কমিউনিকেশন টীমের সদস্যরা। একদিকের দেয়ালে বড় একটা স্ক্রীন, সেটা থেকে এই মুহূর্তে বিভিন্ন আকৃতির ম্যাপ, গ্রিড লাইন, সংখ্যা ও রঙিন আলো ফ্ল্যাশ করছে বিরতিহীন। এক সময় স্ক্রীনের অর্ধেক জুড়ে বিস্তৃত হলো সুইটজারল্যান্ডের ম্যাপ, লাউজানি শহরের উত্তর প্রান্তে লাল একটা আলো মিটমিট করছে। কমিটির কয়েকজন সদস্য পরস্পরের সঙ্গে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি বিনিময় করছেন।

কমান্ড সেন্টারের দরজা খুলে গেল। একদল অ্যাটেনড্যান্টকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন জেনারেল লী মার্শাল। সবাই একবার নড়েচড়ে উঠল। তারপরই কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এল কমান্ড সেন্টারের ভেতর।

জেনারেল মার্শাল তাঁর নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন. টেবিলের মাথায়। তাঁর পিছনের দেয়ালে বড় আকৃতির একটা টেপ রেকর্ডার ঝোলানো রয়েছে, সেটার গায়ে লেখা–'টপ সিক্রেট: 'এমডিপিসি রেফারেন্স ওনলি'। মেশিনটার একটা সুইচের নিচে লেখা, 'ডেসট্রাক্ট' একটা লাল আলো জ্বলে উঠল। টেপ সচল হলো।

টেপ চালু হতেই একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ফিসফিস করে বলল, 'ওই ট্রেনে বারোশো প্যাসেঞ্জার আছে, স্যার।'

উত্তর এল, জেনারেল মার্শালের গলা, 'হতভাগ্য ওরা। ওদের জন্যে আমি দুঃখিত।'

চেয়ার ছেড়ে ওয়াল স্ক্রীনের সামনে চলে এলেন জেনারেল। আঙুল তুলে ম্যাপের গায়ে মিটমিট করা আলোটা দেখালেন–এই আলোই ট্রেনটার পজিশন জানাচ্ছে। শুকনো, বিষণ্ন সুরে শুরু করলেন তিনি। কমিটির বেশির ভাগ সদস্যই এই প্রথম পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পেতে চলেছেন।

'ন্যাটোর অ্যান্টিডোড রিসার্চ সেন্টার থেকে এমথ্রীএক্স-এর দুটো ফাইলই চুরি হয়ে গেছে। চুরি করেছে দু'জন তুর্কী গার্ড–ইব্রাহিম দানু আর ফয়েজ রামদান। দেরি হলেও, আমরা জানতে পেরেছি ওরা ইরাকী ইন্টেলিজেন্স-এর এজেন্ট ছিল। ভল্ট আর ল্যাব থেকে বের করে আনার পর স্টোররুমের সামনের করিডরে ওগুলো ভেঙে ফেলে ওরা। রামদান মারা গেছে। দানু পালিয়েছে। আমরা সন্দেহ করছি, এই মুহূর্তে একটা ট্র্যান্স কন্টিনেন্টাল ট্রেনে রয়েছে সে।'

হাতে একটা লাল গোলাপ নিয়ে নিজের চেয়ারে বসে আছেন পশ্চিম জার্মানীর মাইক্রোবায়োলজিস্ট ড. হেইন কোলম্যান। ঝট করে দাঁড়ালেন তিনি। এতক্ষণে বোঝা গেল তাঁর উচ্চতা–টেনেটুনে পাঁচ ফুট হতে পারে। চোখের চশমা নাকের ডগায় নেমে এসেছে, যে-কোন মুহূর্তে খসে পড়তে পারে। 'এত বড় বিপর্যয়, ন্যাটোর সব সদস্য রাষ্ট্রকে এখনও জানানো হয়নি কেন?'

'বাগানে গোলাপের চাষ নিয়ে ব্যস্ত থাকলে খবর পেতে তো দেরি হবেই,' বললেন জেনারেল মার্শাল। 'আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, ড. কোলম্যান, সংশ্লিষ্ট সব রাষ্ট্রপ্রধানকে দুঃসংবাদটা দেয়া হয়েছে। তাঁরা সবাই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছেন…'

'কি অনুরোধ করেছেন?' সুইডিশ প্রতিনিধি জানতে চাইলেন।

তিনি থামতেই ড. কোলম্যান বললেন, 'কথা বলে সময় নষ্ট করা উচিত হচ্ছে না, জেনারেল। ট্রেনটাকে থামানোর নির্দেশ দিন–এখুনি! ট্রেন যাত্রীদের সবাইকে কোয়ারানটিনে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।'

'সম্ভব নয়!' জবাব দিলেন মার্শাল। 'সব মিলিয়ে আমাদের কাছে মাত্র সাড়ে তিনশো প্রোটেকটিভ সুট আছে। সুটগুলো মাত্র পাঁচ ঘণ্টা এমথ্রীএক্সকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।'

'কিন্তু এর আগের মীটিঙে আপনি আমাদেরকে রিপোর্ট করেছিলেন, পঞ্চাশ হাজার প্রোটেকটিভ সুট তৈরি করার অর্ডার দেয়া হয়েছে!'

'আমার রিপোর্টে কোন ভুল ছিল না,' বললেন মার্শাল। 'কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে একেকটা সুট তৈরি করতে দশ হাজার মার্কিন ডলার লাগবে।

টাকাটা আমেরিকান কংগ্রেসের কাছে চাওয়া হয়েছে। আংশিক টাকা পাওয়াও গেছে। বাকিটা আগামী মাসে পাওয়া যাবে বলে আশা করছি। তবে, এখানে এ-ও বলে রাখি, সুটগুলো এখনও তৈরি হয়নি–যখন হবে, ওগুলো আমেরিকার সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে, ন্যাটোর নয়। ওই একই রিপোর্টে আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম, আপনারাও যার যার রাষ্ট্রকে সতর্ক হতে বলুন, প্রতিটি রাষ্ট্র যাতে দশ-বিশ হাজার করে প্রোটেকটিভ সুট তৈরি করে রাখে।'

'এখন তাহলে কি হবে?'

জেনারেল মার্শাল তাঁর বক্তব্য আবার শুরু করলেন, 'অল্প সময়ের নোটিসে বারোশো প্যাসেঞ্জারকে কোয়ারানটিন সুবিধে দেয়ার মত মেডিকেল ফ্যাসিলিটি দুনিয়ার কোথাও নেই। দুঃসংবাদের এখানেই শেষ নয়। ন্যাটোর কোন সদস্য রাষ্ট্র নিজের দেশে ট্রেনটাকে থামতে দিতে রাজি হয়নি। নেগোসিয়েশন চলছে, তবে সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা, প্রতি মুহূর্তে জটিলতা শুধু বাড়ছেই। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রধানরা অনুরোধ করেছেন, গোটা ব্যাপারটা যেন যে-কোনও ভাবে গোপন রাখা হয়–যতক্ষণ সম্ভব।'

উপস্থিত সবাই কাঠ হয়ে গেল। সবাই তাঁরা বিজ্ঞানী নন, অনেকেই রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে এখানে আছেন।

জেনারেল বলে চলেছেন, 'ফেজ ওয়ান কাভার স্টোরি অনুসারে সংশ্লিষ্ট দেশের রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।'

কমিটির সদস্যা পাফ এরিকসন সবাইকে একটা করে কাগজ বিলি করলেন। শিরোনামে লেখা রয়েছে, 'কাভার স্টোরি'। নিচে লেখা, 'ফেজ ওয়ান'। কাগজে ছাপা রয়েছে দীর্ঘ একটা তালিকা, ক্রমগুলো এভাবে সাজানো– 'প্রিটেক্সট্ ওয়ান··· প্রিটেক্সট্ টু'···

জেনারেল বলে চলেছেন, 'ওই একই রিপোর্টে আমি আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম যে এমথ্রীএক্স ভাইরাসের কার্যকরী একটা প্রতিষেধক আবিষ্কার করার কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এই একটাই সুখবর আপনাদেরকে আমি দিতে পারছি। তবে এই প্রতিষেধক এখনও এক্সপেরিমেন্টাল পর্যায়ে রয়েছে।' ডাহা মিথ্যে কথা বলছেন তিনি। আর কেউ না জানলেও তিনি নিজে খুব ভাল করেই জানেন যে এমথ্রীএক্স-এর প্রতিষেধক ন্যাটো বা আমেরিকার কোন বিজ্ঞানী আজও আবিষ্কার করতে পারেনি। 'এখন আমাদের প্রথম কাজ হবে ইরাকী স্পাই ইব্রাহিম দানুকে খুঁজে বের করা, তারপর ট্রেন থেকে নামিয়ে কোয়ারানটিনে নিয়ে যাওয়া। সেখানে তার ওপর ওই প্রতিষেধক ব্যবহার করে দেখা হবে আদৌ কোন কাজ করে কিনা।' এ তার আরেকটা নির্জলা মিথ্যে প্রতিশ্রুতি। প্রতিষেধকই যেখানে নেই সেখানে তা ব্যবহার করার প্রশ্নই ওঠে না। দানুকে তার দরকার নেই, দরকার দানুর কাছে যে ফ্লপি ডিস্কটা আছে, সেটা। এত কথা বলছেন তিনি, কিন্তু ডিস্কটা চুরি গেছে, এ-কথা বলছেন না।

'দানুকে খুঁজে বের করতে হলে খুব সাহসী একজন লোক দরকার আমাদের,' বলে চলেছেন জেনারেল। 'এমন একজন লোক, যার কথা শুনবে প্যাসেঞ্জাররা।

তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়লে পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব হবে না।

'সে রকম লোক কোথায় পাব আমরা?' কেউ একজন হতাশ সুরে জানতে চাইল।

'ট্রেন যাত্রীদের তালিকা পরীক্ষা করা হচ্ছে, দেখা যাক সেরকম কাউকে পাওয়া যায় কিনা,' জবাব দিলেন জেনারেল।

'তারচেয়ে প্রোটেকটিভ সুট পরা কাউকে ট্রেনে তুলে দিলে হয় না?' জিজ্ঞেস করলেন ড. কোলম্যান। 'দানুকে খুঁজে বের করবে।'

'প্রোটেকটিভ সুট পরা লোক দেখলে প্যাসেঞ্জারদের কি প্রতিক্রিয়া হবে, ভেবে দেখেছেন?'

'কিন্তু কোন না কোন উপায় নিশ্চয়ই আছে, না থেকে পারে না!'

'উপায় তো আছেই,' বললেন মার্শাল। 'একটু আগেই তো সে-কথা বললাম। দানুকে খুঁজে বের করতে হবে, তারপর ট্রেন থেকে নামিয়ে কোয়ারানটিন নিয়ে যেতে হবে। যদি দেখা যায় প্রতিষেধকে কাজ হচ্ছে, তখন ট্রেনের বাকি সমস্ত যাত্রীকে কোয়ারানটিন নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ ঘণ্টা সময় বেশি নয়, তবু আশা করা যায় কোন রাষ্ট্র ট্রেন থামাবার অনুমতি দিলে কোয়ারানটিন-এর ব্যবস্থা করা সম্ভব। তার আগে...'

সবাই গভীর আগ্রহে কান পেতে আছে।

'তার আগে,' নাটকীয় বিরতি নিয়ে বললেন জেনারেল মার্শাল, 'যে-সব এলাকা দিয়ে ট্রেনটা যাবে সেই সব এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।' ফ্ল্যাশরত লাল আলোটার দিকে সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট করলেন। 'ট্রেনে আমরা একটা টেলিস্টার রিমোট সেনসিং ডিভাইস আটকে রেখেছি। এই ম্যাপে সারাক্ষণ সেটা ট্রেনের পজিশন জানাবে। এই মুহূর্তে ট্রেন তার প্রথম বিরতির দিকে ছুটে চলেছে। হ্যাঁ, ব্যাসেল-এ থামবে প্রথমে।' হাতঘড়ি দেখলেন। 'আর এক ঘণ্টা পর ট্রেন থামলে বহু লোক নামতে চাইবে। কিন্তু আমরা কাউকে নামতে দিতে পারি না।'

ফ্রেঞ্চ প্রতিনিধি বিউবোমোরেলা এই প্রথম কথা বললেন, 'একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে বলবেন, জেনারেল লী মার্শাল? আমরা কি বারোশো প্যাসেঞ্জারকে কিভাবে বাঁচানো যায় তাই নিয়ে আলোচনা করছি, না অন্য কিছু?'

'ড. মোরেলা,' জেনারেল জবাব দিলেন, 'গোটা ব্যাপারটাকে আপনি অতি ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতর ফেলে দেখতে চাইছেন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি, বারোশো প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে আমার খুব একটা মাথাব্যথা নেই। আমার ওপর দায়িত্ব বর্তেছে সাড়ে পাঁচশো কোটি মানুষকে বাঁচানোর। তাদের মধ্যে আপনি আছেন, আমি আছি—আমরা সবাই আছি।'

তিন

একটা সেকেন্ড ক্লাস কমপার্টমেন্টে একদল সুইডিশ কলেজ স্টুডেন্ট জমজমাট

পার্টির আয়োজন করেছে। শিক্ষা সফরে ইসরায়েলে গিয়েছিল তারা, দেশে ফেরার পথে খানিকটা উচ্ছৃংখল হয়ে উঠেছে। সঙ্গে শুধু গিটার আছে, হাতের কাছে থালা-বাসন যা পেয়েছে তাই দিয়ে তৈরি করে নিয়েছে বাকি ইস্ট্রুমেন্ট। গান-বাজনা চলছে, তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে গলায় সস্তাদরের বিয়ার ঢালা। তাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে যোগ দিয়েছে অন্যান্য প্যাসেঞ্জাররাও, বিশেষ করে আমেরিকান কয়েকজন তরুণ সৈনিক। বলাই বাহুল্য, সৈনিকদের দৃষ্টি পড়েছে ছাত্রীদের ওপর, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে নিজেদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে।

ছাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা-চওড়া এরিকা বানসি, বেশিরভাগ সৈনিকের দৃষ্টি তার ওপরই নিবদ্ধ। মোটাসোটা বলেই গরমে কষ্ট পাচ্ছে সে, ব্লাউজের বোতাম খুলে ভাঁজ করা খবরের কাগজ দিয়ে বাতাস করছে গলায় আর বুকে। পাশেই বসে রয়েছে তার বান্ধবী, হিলডা ফিন।

হিলডা অভিযোগের সুরে বলল, 'এরকম লোক ভর্তি ট্রেন আগে কখনও দেখিনি আমি।'

'দায়ী জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, হিলডা,' ব্যাখ্যা দেয়ার ঢঙে বলল এরিকা। 'দু'হাজার দশ সালে দেখবি তোর পকেট থেকে পিলপিল করে লোকজন বেরিয়ে আসছে। এটা একটা টাইম বোমার মত।' আড়চোখে সৈনিকদের দিকে তাকাল। তারা যে শুধু ওর দিকে তাকিয়ে আছে, তা নয়, ওর কথাও কান পেতে শুনছে। তার খারাপ লাগছে না।

হিলডা খিলখিল করে হেসে উঠে জবাব দিল, 'তুই ঠিকই বলছিস, তবে সমস্যা হলো এই যে ফিউজে আগুন দেয়ার সময় সাংঘাতিক ভাল লাগে।'

একজন সৈনিক তার সঙ্গীর পেটে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল।

বেতের ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দানুর কোলে চড়ে বসেছে অ্যাটম।

কুকুরটা আদর পাবার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠেছে, বুঝতে পেরে প্রথমে হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে এসেছিল দানু। কিন্তু লুকিয়েও কোন লাভ হয়নি, কুকুরটা তাকে ঠিকই খুঁজে বের করে ফেলে। ওটাকে কাছে আসতে না দেয়ার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে দানু, চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়েছে, ধমক দিয়েছে, মারার ভঙ্গি করে হাত তুলেছে। কিন্তু নিঃসঙ্গ অ্যাটম কোন বাধাই মানেনি। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দানুকে কোণঠাসা করে ফেলে সে, তারপর কোলে চড়ে বসেছে। এই মুহূর্তে দানুর গালে মুখ ঘষছে সে।

ইতিমধ্যে দানু বুঝে নিয়েছে তার মৃত্যু হতে দেরি হবে। সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু অবস্থার অবনতি ঘটছে ধীর গতিতে। মাঝখানে একবার ঘামতে শুরু করেছিল, কিন্তু জ্বর বেড়ে যাওয়ায় এখন আর ঘামছে না। শারীরিক অসুস্থতার চেয়ে মস্তিষ্ক বিকৃতির আশঙ্কাটাই এখন প্রবল। চিন্তাধারায় মাঝে মধ্যে শৃঙ্খলা বা সুস্থতা থাকছে না। দায়ী সেই রাক্ষুসে খিদেটা। হঠাৎ একবার তার মনে হলো, কুকুরটা মরে গেলে ভাল হত, তাহলে ওটাকে খেতে পারত সে। তারপরই তওবা তওবা করে নিজেকে ধিক্কার দিল। এসব কি ভাবছে সে? মরার

আগে পাগল হয়ে যাবে নাকি?

তারপর, নিজের অজান্তেই, কুকুরটার গায়ে আদর করে হাত বুলাতে শুরু করল। লাই পেয়ে মাথায় উঠল অ্যাটম, দানুর গাল আর ভেজা ভেজা চোখের কোণ চাটছে মনের সুখে।

ব্যাগেজ কার-এর দরজা খোলা রাখা বেআইনী কাজ, ধরা পড়লে স্টুয়ার্ড টাওয়েলের চাকরি নট হয়ে যেতে পারে। ট্রেনে পোষা কোন প্রাণী নিয়ে ওঠা নিষেধ, তাই বেতের ঝুড়িতে লুকিয়ে অ্যাটমকে নিয়ে আসে ভেনাস। একশো মার্কিন ডলার ঘুষ দিয়েছে সে, বিনিময়ে ব্যাগেজ কার-এর দরজা খুলে রাখতে রাজি হয়েছে টাওয়েল।

ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ভেনাস। 'অ্যাটম! লক্ষ্মী সোনা আমার!'

দানুর কোল থেকে লাফ দিয়ে ছুটল অ্যাটম। বাক্সগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আরেক লাফে ভেনাসের কোলে চড়ে বসল। 'ও, বুঝেছি, আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা হচ্ছে!' হাসল ভেনাস, চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তুলল অ্যাটমকে। 'তোকে আমি হাঁটতে নিয়ে যেতে এসেছি, সোনা!' বিশাল ও ভারী একটা ফার কোট পরে এসেছে সে, কোটের লাইনিং আর বুকের মাঝখানে ঢোকাল ওটাকে, নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে এল করিডরে, দরজাটা সযত্নে ভিড়িয়ে দিল আবার।

ট্রেনের মাঝামাঝি, আরেক ফার্স্ট-ক্লাস কমপার্টমেন্টে, জানালার ধারে বসেছে সাদা আলখেল্লা পরা একজন অল্প-বয়সী প্রিস্ট। গভীর মনোযোগের সঙ্গে নিউ টেস্টামেন্ট পড়ছে সে। সম্ভবত বেশি মাড় দেয়া হয়ে গেছে, সেজন্যই শক্ত হয়ে আছে কলারটা, হাত তুলে মাঝে মধ্যেই ঘাড় চুলকাতে হচ্ছে তাকে।

কমপার্টমেন্টের উল্টোদিকে বসে আছে সাত বছরের ইংলিশ বালিকা ডোনা বুমার। পাশেই তার ন্যানি বা আয়া, মধ্যবয়স্কা মিসেস ডানকান আধুরা। ঊষা আধুরা বিশ বছর হলো বুমার পরিবারের কাজ করছে। ভারতের কেরালা রাজ্যের মেয়ে, তবে বর্তমান ব্রিটেনের নাগরিক। ডোনার মা জেনেভায় চাকরি করে, মায়ের কাছ থেকে বেড়িয়ে দেশে ফিরছে ডোনা। এই মুহূর্তে সাবান গোলা পানিতে চুবিয়ে তারের তৈরি রিঙ দিয়ে রঙিন বুদ্বুদ তৈরি করছে সে, তবে সরাসরি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পুরোহিতের দিকে, বিশেষভাবে লক্ষ করছে তার ঘাড় চুলকানো। হঠাৎ সে তার আয়ার কানে ফিসফিস করল, যদিও কথাগুলো শুনতে পেল সবাই। 'মিসেস আধুরা, ওঁনার ঘাড় আর গলা ওরকম লাল কেন?'

'কলারটা শক্ত,' বিব্রত হয়ে খুব নিচু গলায় ফিসফিস করল আধুরা। 'কিন্তু না, ডোনা, এ তোমার উচিত...'

'হোক না শক্ত, উনি তো এরকম কলার পরতে অভ্যস্ত, তাহলে চুলকাবে কেন?' ডোনা নাছোড়বান্দা।

প্রিস্ট, যার নাম কোনদিন জানা যাবে না, আড়ষ্ট হয়ে গেল। চোখ না তুলেও অনুভব করতে পারল, কম্পার্টমেন্টে সবাই তার ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

'সত্যি আমি দুঃখিত, ফাদার,' ডোনার হয়ে ক্ষমা চাইল আধুরা। 'ও আসলে

আপনাকে বিব্রত করতে চায়নি।'

চেহারায় গাম্ভীর্য ধরে রেখে মাথা ঝাঁকাল প্রিস্ট, আবার মন দিল পড়ায়। চোখে পলক পড়ছে না, এখনও তার দিকে তাকিয়ে আছে ডোনা।

করিডর ধরে হাঁটছে ভেনাস, তার হাঁটার তালে তালে ফার কোট থেকে বেরিয়ে থাকা অ্যাটমের মাথাটা দোল খাচ্ছে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক ডাচ বধূ, আট মাস বয়েসী পুত্রসন্তানকে নিয়ে আমস্টারডামে ফিরছে সে–তার স্বামী ছেলেকে এখনও দেখেনি। মায়ের কোল থেকে অ্যাটমকে দেখতে পেয়ে খলখল করে হেসে উঠল শিশু, খেলার ছলে হাত বাড়াল। ভেনাস দাঁড়িয়ে পড়ল, তরুণী মাতার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল। এই সুযোগে শিশুর হাতটা চাটছে অ্যাটম, ওটা যেন মিছরির একটা টুকরো।

করিডরে একজন কনডাকটারকে ঢুকতে দেখে দ্রুত ঘুরল ভেনাস, ফেলে আসা পথ ধরে হন হন করে এগোল। নিষ্পাপ শিশুটিকে হাসতে দেখে প্রৌঢ় কনডাকটারও দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর না করে পারল না। ভেজা হাত মুখে পুরে চুকচুক করে চুষছে বাচ্চাটা।

এখন একটা ইঁদুর ধরতে পারলেও খায় সে, ভাবল দানু। অ্যাটমের ঝুড়িতে একটা বাক্স দেখতে পেয়ে লোভে চকচক করে উঠল চোখ জোড়া। বাক্সের গায়ের লেখা আর ছবি দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওটায় কুকুরের বিস্কিট থাকে। কিন্তু বাক্সটা থেকে বিস্কিটের এক চিমটি গুঁড়ো ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। খালি বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব্যাগেজ কার থেকে বেরিয়ে পড়ল আবার সে।

হাঁটছে দানু, তবে পায়ের ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নেই। যেখানে ফেলতে চাইছে তারচেয়ে কাছে পড়ছে পা। মুখের ভেতর জিভটা মোটা হয়ে গেছে। গলায় বোজা একটা ভাব। মরিয়া হয়ে ডাইনিং কার-এর দিকে যাচ্ছে সে।

করিডরে বেরিয়ে এসে একটা জানালার নিচে মিসেস আধুরার জন্যে অপেক্ষা করছে ডোনা। আধুরা বাথরুমে গেছে, বেরিয়ে এসে ডোনাকে কোলে নেবে, ডোনা যাতে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্যগুলো দেখতে পায়। দানুকে দেখতে পেয়ে আবদারের সুরে বলে বসল, 'আমাকে ধরে একটু উঁচু করবেন, প্লীজ?'

কথা না বলে দানু শুধু মাথা নাড়ল। কিন্তু জেদী ডোনা দু'দিকে দু'হাত মেলে দিয়ে তার পথ আটকাল। 'তাহলে আপনাকে আমি যেতে দেব না!'

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল দানু, ফিরে যাচ্ছে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে তার, মনে মনে আল্লাহকে বলছে–বাঁচাও আমাকে, মেরে ফেলো! ঠিক তখনই পিছন থেকে ছুটে এসে তার হাত ধরে ফেলল ডোনা, ধরেই টান দিল। 'পালাতেও দিচ্ছি না–কোলে নিন আমাকে, জানালার কাছে তুলুন!'

ঝট করে হাতটা ছাড়িয়ে নিল দানু, চোখের সামনে তুলল সেটা। লাল চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। ডোনার টানে তার হাতের উল্টোপিঠের চামড়া আলগা হয়ে খুলে না এলেও, ভাঁজ খেয়ে কুঁচকে গেছে–ডোনা ছেড়ে দিতেও চামড়াটুকু সমান হচ্ছে না। এবার ডোনা, দানুর অসতর্কতার সুযোগে, ছুটে এসে দু'হাতে জড়িয়ে

ধরল তাকে। আবদারের ভঙ্গিতে মেঝেতে পা ঠুকছে। 'কোলে নিন, আমাকে কোলে নিন! আমি জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখব!'

কষ্ট হলেও ডোনাকে কোলে তুলে নিল দানু। জানালার ওপরের অংশটুকু খোলা, বাতাসে ওড়া ডোনার চুল দানুর চোখে-মুখে ঝাপটা মারছে। বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে এনে দানুর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল মেয়েটা। দুটো মুখ কাছাকাছি হতেই খক খক করে কাশতে শুরু করল দানু। ডোনাকে সে নামিয়ে দিচ্ছে, এই সময় করিডরে বেরিয়ে এল আধুরা। দানুর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল; তারপর শক্ত হাতে ডোনার কব্জি ধরে দ্রুত কমপার্টমেন্টের ভেতর ঢুকে পড়ল।

সৈনিকরা ভাব জমাবার চেষ্টা করলেও, এরিকা তাদের কাউকে পাত্তা না দিয়ে সহপাঠী কার্লসনকে নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এসেছে। বাকি ছাত্র-ছাত্রীরা একটুও অবাক হয়নি, কারণ তারা জানে ইতিমধ্যে আঙটি বিনিময় হয়ে গেছে, ভার্সিটির পাঠ আগামী বছর চুকলেই বিয়েটাও হয়ে যাবে। নিরিবিলি একটা জায়গার খোঁজে ট্রেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে দু'জন। লাভ হচ্ছে না দেখে ফিরে আসছে, এই সময় ব্যাগেজ কারের দরজা সামান্য খোলা দেখে এদিক ওদিক তাকিয়ে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল ভেতরে। কোন কারণ নেই, মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসছে এরিকা।

পরস্পরকে ওরা আলিঙ্গন করছে, এই সময় অদ্ভুত একটা আওয়াজ শুনে দু'জনেই কাঠ হয়ে গেল। এদিক ওদিক তাকাতেই অ্যাটমকে দেখতে পেল ওরা, প্লেট ভর্তি খাবার নিয়ে এক কোণে বসে আছে। খিলখিল করে হেসে উঠল এরিকা।

ডাইনিং কার লোকে লোকারণ্য বললেই হয়, তিন শ্রেণীর প্যাসেঞ্জারই ভিড় করেছে এখানে। ডিশ-গ্লাস-চামচের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠছে খদ্দেরদের চেঁচামেচি। ছুটোছুটি করে পরিবেশন করছে ওয়েটাররা। সামনে ব্যাসেল স্টেশন, যারা নেমে যাবে তারা খাওয়াদাওয়ার কাজটা সেরে নিতে চাইছে তাড়াতাড়ি।

ভেনাস ব্যাসেলে নামবে না, তবে সে-ও নেলসনকে নিয়ে লাঞ্চ খেতে বসেছে। সেকেন্ড কোর্সের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা, নেলসনকে বলল, 'অ্যাটমকে দেখে এলাম।'

'কিন্তু তুমি না বললে ব্যাগেজ কারে সব সময় তালা দেয়া থাকে।'

'আমি কে সেটা ভুলে যেয়ো না। ভেনাস ডেভনপোর্ট যেখানে যায় সেখানকার কোন দরজা বন্ধ থাকতে পারে না।'

'নিশ্চয়ই কাউকে ঘুষ দিয়েছ।'

চোখ নাচিয়ে হাসল ভেনাস। 'শুধু অটোগ্রাফ।'

ভুরু কোঁচকাল নেলসন। তার দিকে কটমট করে তাকাল ভেনাস।

আপাতত খালি পেয়ে গ্যালিতে ঢুকে পড়েছে দানু। চারদিকে ঢাকনিবিহীন ডিশে রাজ্যের খাবারদাবার। চীনামাটির গামলা ভর্তি গরম ভাত থেকে বাষ্প উঠছে, কোন দিকে না তাকিয়ে তাতে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। মুঠোর ভাত মুখে পুরতে

যাবে, পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল কেউ আসছে। গ্যালির আরেক দরজার দিকে ছুটল সে। রানার সঙ্গে ধাক্কা খেলো করিডরে বেরুবার সময়।

সম্ভবত অন্যমনস্ক ছিল রানা, দানুর দিকে তাকাতে এক মুহূর্ত দেরি করে ফেলল, ফলে তার মুখটা ভাল করে দেখার সুযোগ পেল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ডাইনিং কার-এ ঢুকে পড়ল ও।

কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে রানাকে পাশ কাটাল একজন ওয়েটার, হাতে ডিশ ভর্তি গরম ভাত, থামল মিসেস আধুরা আর ডোনার টেবিলে। টেবিলের আরেক পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে তরুণ প্রিস্ট।

'ওহ্, ফাদার,' মিসেস আধুরাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় বিহ্বল দেখাল, নিজেকে বড়ই সম্মানিতা ভাবছে। 'দয়া করে এখানে আমাদের সঙ্গেই বসুন, প্লীজ!'

প্রিস্ট বসল, তবে ভঙ্গিটা সামান্য আড়ষ্ট। ওয়েটার ভাত পরিবেশন করল।

'আপনার প্রতি আমার অনুরোধ, ডোনার বেয়াদবি ক্ষমা করে দেবেন,' মিনতির সুরে বলল আধুরা। 'জানেন, ফাদার, ও কিন্তু পড়াশোনায় দারুণ। রোববারে চার্চে যেতেও ভুল করে না।'

ডোনা গম্ভীর হলো।

প্রিস্ট হঠাৎ করে মহৎ ও উদার হয়ে উঠল। 'নষ্ট শিশু বলে কিছু নেই, বুঝলেন।' তারপর উদ্ধৃতি দিলেন, 'শুনুন তাহলে—"দা ফাদারস হ্যাভ ইটেন আ সাওয়ার গ্রেইপ, অ্যান্ড দ্য চিলড্রেন'স টীথ আর সেট অন এজ"...এ হলো পয়গম্বর যীশুর কথা।'

প্রিস্টের চেহারায় আত্মতৃপ্তির ছাপ, তার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল আধুরা। কিন্তু ডোনার চোখে শয়তানি হাসি বা অশুভ উজ্জ্বলতা ফুটল। 'জেরিমাইয়া,' বলল সে।

প্রিস্ট ও আধুরা, দু'জনেই আহত বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল।

আবার ছোবল মারল ডোনা, 'চ্যাপ্টার থারটিওয়ান, ভার্স টোয়েনটিনাইন।' আধ-লুকানো ঘৃণার দৃষ্টিতে ডোনার দিকে তাকাল প্রিস্ট। আধুরাকে হতভম্ব ও দিশেহারা দেখাচ্ছে। আবার ফিরে এল ওয়েটার। 'আপনাদের কারও কিছু লাগবে?'

একজন ওয়েটার পথ দেখিয়ে নিয়ে এল রানাকে। টেবিলটা আগেই দখল করে নিয়েছে চেলসি আর দু'জন নান, তবে একটা চেয়ার এখনও খালি। প্লেট থেকে মুখ তুলে রানাকে দেখল চেলসি, চোখে প্রশ্ন—আবার আপনি? সৌজন্য দেখিয়ে মুখটা হাসি হাসি করল রানা। চোখ নামিয়ে খাওয়ায় মন দিল চেলসি। তার পাশের খালি চেয়ারে বসে মেন্যুটা হাতে নিল রানা। 'ভাল কি আছে?' যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করল।

'ঈমান আর দয়া-দাক্ষিণ্য,' বলে নানদের দিকে তাকাল চেলসি, সমর্থন-সূচক মাথা ঝাঁকাল তারা।

'আপনি কি সব সময় এরকম খোশমেজাজে থাকেন?'

'মাসে একবার এরচেয়ে একটু কম।'

নান দু'জন এদিক ওদিক মাথা নাড়ল, অর্থাৎ অশান্ত মেজাজ তারা সমর্থন করে না।

'আপনি আয়রনের অভাবে ভুগছেন।'

'ট্যাবলেট আমার দু'চোখের বিষ।'

'ট্যাবলেট নয়। পেরেক।'

প্রাণপণ চেষ্টা করেও না হেসে পারল না চেলসি। রানার সাফল্যে নান দু'জনও নিঃশব্দে হাসছে। এই প্রথম রানার দিকে ভাল করে তাকাল মেয়েটা। দু'জনের মধ্যে শুধু যে দৃষ্টি বিনিময় হলো তা নয়, পরস্পরের অন্তরের উষ্ণতাও অনুভব করল ওরা।

হঠাৎ করে মেগা ডেথ প্রিভেনশন সেন্টারে মাসুদ রানা একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠল। যাত্রীদের তালিকায় রানার নামটা দেখে চেনা চেনা লাগায় কমপিউটরের বোতামে চাপ দিয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলেন জেনারেল মার্শাল। স্ক্রীনে ফুটে ওঠা তথ্যগুলো পড়ে মন্তব্য করলেন, 'ট্রেনে উনি ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি, আমাদের জন্যে আশীর্বাদ, ঠিক এঁকেই আমাদের দরকার।'

'কেন, কে উনি?' জিজ্ঞেস করলেন পাফ এরিকশন, ব্রিটিশ প্রতিনিধি।

জেনারেলের জবাবটা হলো দীর্ঘ। মাসুদ রানা বিসিআই এজেন্ট, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন ফার্ম রানা এজেন্সির ডিরেক্টর, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অনারারি উপদেষ্টা, জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের অন্যতম কমান্ডার, আমেরিকান ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর–সবচেয়ে বড় তাৎপর্য, আমেরিকানদের একজন বন্ধু তিনি; আপদে-বিপদে সিআইএ ও এফবিআই-কে সাহায্য করে থাকেন, একাধিক মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রাণ রক্ষা করেছেন।

মনে মনে খুব খুশি জেনারেল। কোন সন্দেহ নেই, আমেরিকার স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে এই ভদ্রলোককেই তাঁর দরকার। আমেরিকার পক্ষে এটাই অবশ্য মাসুদ রানার শেষ কাজ হবে, কারণ বারোশো ট্রেন যাত্রীর সঙ্গে তাঁর নিয়তিও নির্ধারিত হয়ে গেছে–সবার সাথে তিনিও মারা যাবেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন জেনারেল। আমেরিকানরা তাদের একজন বিদেশী অথচ বিশ্বস্ত বন্ধুকে চিরকালের জন্যে হারাতে যাচ্ছে।

পেন্টাগনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তিনি। ওদিক থেকে জেনারেল জিমি ময়নিহান, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রানার নাম শোনা মাত্র জানিয়ে দিলেন, 'হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক–ঈশ্বরই তাঁকে ওই ট্রেনে তুলে দিয়েছেন। বারোশো প্যাসেঞ্জারকে কেউ যদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তাঁকে কাজে লাগানোর আপনার সিদ্ধান্তর প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন আছে, আশা করি প্রেসিডেন্টও দ্বিমত পোষণ করবেন না।'

মুঠোর ভেতর কতটুকু আর ধরে, ওই সামান্য ক'টা ভাত নিয়েই ব্যাগেজ কারে ফিরে এল দানু। ভেতরে ঢুকতেই চোখ পড়ল ভেনাসের রেখে যাওয়া প্লেটের

ওপর। কিন্তু হায়, এরইমধ্যে চেটেপুটে প্লেট সাফ করে ফেলেছে অ্যাটম।

তবে বেতের ঝুড়িতে বসে একটা হাড় চিবাচ্ছে কুকুরটা, তাতে এখনও বেশ খানিকটা মাংস লেগে আছে। হাড়টার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল দানু। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে চাপা গলায় গর্জে উঠল অ্যাটম, নড়াচড়ায় মারমুখো একটা ভাব চলে এল। মুখের ভেতর পানি জমে উঠছে, ঝুড়ির ভেতর হাত গলিয়ে হাড়টা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল দানু। হাতে দাঁত বসিয়ে দিল অ্যাটম। ঝট করে হাতটা টেনে নিয়ে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল দানু।

মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। চোখে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি আর ঈর্ষা, অ্যাটমের দিকে তাকিয়ে আছে। আর অ্যাটম মনের আনন্দে হাড় চিবাচ্ছে।

হঠাৎ একটা তীব্র ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন।

ডাইনিং কারের টেবিল, ডিশ, ট্রে, প্লেট, গ্লাস ইত্যাদি যা ছিল সবগুলোর যেন ডানা গজাল। চেয়ার থেকে মেঝেতে সদ্য ছড়ানো খাবারদাবারের ওপর ছিটকে পড়ল প্যাসেঞ্জাররা। বিভিন্ন ভাষায় গালমন্দ করছে লোকজন, অনেকেই ব্যথা পেয়ে কাতরাচ্ছে। শোরগোলের আওয়াজে একটু পরই থেমে গেল কয়েকজন প্যাসেঞ্জার জানালা দিয়ে বাইরে তাকানোর পর। বাইরে কি ঘটছে দেখার জন্যে সবাইকে ডাকাডাকি করছে তারা। চেয়ার থেকে একজন ন্নান ও চেলসিও পড়ে যাচ্ছিল, তবে সময় মত রানা ধরে ফেলায় রক্ষা পেয়েছে। ভিড় ঠেলে ওরাও জানালার দিকে এগোল। নানকে টেনে তুলে তার চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছে রানা।

বাইরে একবার চোখ বুলিয়েই ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলল চেলসি। সে প্রফেশন্যাল, ক্যামেরা আনার জন্যে ছুটল।

ট্রেনের বাইরে গ্রাম্য দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। দূরে একটা নদী, রেললাইনের পাশে একটা রাস্তা, আশপাশে ঘন জঙ্গল। স্টেট পুলিসের সশস্ত্র একটা দল ট্রেনটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। কেন, কি কারণ, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ট্রেনের পাশের রাস্তায় টহল দিচ্ছে কয়েকটা জীপ, দু'তিনটে অ্যামবুলেন্সও দেখা গেল, রোটারি লাইট লাল আলো ছড়াচ্ছে। ট্রেন ঘিরে ফেলা হলেও, একজন পুলিসও রেললাইনের কাছাকাছি আসেনি–সবাই পঞ্চাশ থেকে ষাট ফুট দূরে। গাড়িগুলোও সমান দূরত্ব বজায় রেখে টহল দিচ্ছে।

মূক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে প্যাসেঞ্জাররা। কি ঘটছে কারও কোন ধারণা নেই।

ট্রেনের সামনে ও পিছনে দ্রুত কাজ চলছে। ইলেকট্রিক এঞ্জিন খুলে ফেলা হলো, এঞ্জিনিয়াররা সেটাকে পাশের একটা লাইনে সরিয়ে নিল। ট্রেনের পিছন দিকেও দ্বিতীয় একটা লাইন ফেলা হয়েছে, সেটা থেকে মূল লাইনে চলে এল একটা লোকোমটিভ, ঠেলে নিয়ে আসছে নতুন একটা কার। কারটা ট্রেনের সঙ্গে জোড়া লাগানো হলো। নতুন এই কার-এ আঠারোজন সিকিউরিটি পুলিসের সশস্ত্র একটা এসকর্ট রয়েছে, মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটি পরবর্তী সিদ্ধান্ত না নেয়া পর্যন্ত ট্রেনের সঙ্গেই থাকবে তারা। পিছনে জোড়া লাগানো লোকোমটিভই এখন গোটা ট্রেনটাকে ঠেলে নিয়ে যাবে–কেউ জানে না কোথায়।

ডাইনিং কার থেকে নারীকণ্ঠের আর্তচিৎকার শুনে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল

রানার। তারপরই কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'ডাক্তার। প্লীজ, কেউ একজন ডাক্তারকে ডাকুন!'

করিডর থেকে ছুটে ডাইনিং কারে ঢুকল রানা। ভেতরটা এরইমধ্যে ফাঁকা হয়ে গেছে, শুধু কয়েকজন ওয়েটার আর একজন নানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে নান। ওরা সবাই গোল হয়ে দ্বিতীয় নানকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ভিড় ঠেলে সামনে চলে এল রানা, দেখল মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে দ্বিতীয় নান, খানিক আগে যাকে মেঝে থেকে টেনে তুলে চেয়ারে আবার বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ও।

এক মুহূর্ত নিঃসাড় শরীরটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। মেঝে থেকে টেনে তোলার সময় পরীক্ষা করতে ভোলেনি ও, চেয়ার থেকে পড়ে সে কোথাও ব্যথা পায়নি। কিন্তু এই মুহূর্তে তার ঠোঁটের কোণ, চোখের কোণ আর কান থেকে রক্তের ক্ষীণ ধারা গড়াচ্ছে। চোখ দুটো খোলা, মাত্র এক মিনিট আগেও ওগুলো স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে সাদা অংশের কোন অস্তিত্ব নেই, টকটকে লাল হয়ে আছে। বিস্ফারিত চোখে প্রাণেরও কোন লক্ষণ নেই।

আগেই ডাইনিং কার থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল একজন ওয়েটার, হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল সে। 'একজন ডাক্তার ভদ্রলোককে পাওয়া গেছে, আসছেন তিনি।'

মধ্য বয়স্ক নাদুসনুদুস জার্মান ডাক্তার কার্ট মুলার হেলেদুলে ভেতরে ঢুকলেন, গলায় একটা স্টেথস্কোপ ঝুলছে, ঠোঁটের কোণে অভয়দাতার হাসি। 'কই দেখি,' বলে রানার পাশে হাঁটু গাড়লেন। 'নিশ্চয়ই ফুড পয়জনিঙের কেস?' রোগিণীর চোখ, কান আর ঠোঁট দেখে মুখের হাসি দপ করে নিভে গেল তাঁর। 'ভেতরে রক্তক্ষরণ,' বিড়বিড় করলেন আপন মনে। তারপর রোগিণীর পালস দেখার জন্যে কব্জিটা ধরলেন।

এমন ভঙ্গিতে হাতটা টেনে নিলেন, যেন বৈদ্যুতিক ধাক্কা খেয়েছেন।

'কি হলো?' রানা ও কয়েকজন ওয়েটার প্রায় একযোগে জানতে চাইল।

'উনি মারা গেছেন,' ফিসফিস করে বললেন ড. কার্ট মুলার।

চোখ বুজে বুকে ক্রস আঁকল প্রথম নান। বিড়বিড় করে মুখস্থ করা বাইবেল পড়ছে।

'মারা গেছেন, সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' বলল রানা। 'কিন্তু আপনার প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা কি? মৃত্যুর কারণ সম্পর্কেও কিছু বলুন। ওনাকে এক কি দেড় মিনিট আগে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখে গেছি। হঠাৎ এভাবে মারা যাবেন কেন?'

'সেকেন্ড ক্লাস কারে আমার আরও দুই বন্ধু আছেন, তাঁরাও ডাক্তার,' জবাব দিলেন ড. মুলার। 'তাঁদেরকে ডেকে পাঠান, হের...'

'মাসুদ রানা,' বলল রানা, সংক্ষেপে নিজের পেশাগত পরিচয়টাও জানিয়ে রাখল। 'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর।'

'হের মাসুদ রানা, আমি তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ না করে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি না। একজন ওয়েটারকে পাঠান, আমার নাম বললেই তাঁরা চলে আসবেন। ওরা স্বামী-স্ত্রী–মলয় ও সুচরিতা ভৌমিক।'

একজন ওয়েটার ছুটল। একমাত্র প্রথম নান ছাড়া বাকি সবাইও যে যার কাজে ফিরে গেল শুকনো মুখে।

প্রথম নান এখনও চোখ বুজে বাইবেল পড়ছে।

'আমার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলেন,' রানার কানের কাছে মুখ সরিয়ে এনে ফিসফিস করলেন ড. মুলার। 'লাশের ডান কব্জির দিকে তাকান।'

তাকাল রানা। রোগিণীর কব্জির চামড়া কুঁকড়ে ভাঁজ খেয়ে আছে দেখে হতবাক হয়ে গেল ও। 'কি ব্যাপার?'

'মাংসের সঙ্গে চামড়া সাঁটা থাকে, এখানে তা নেই,' বললেন ড. মুলার। 'আমার সন্দেহ, টান দিলে খুলে আসবে।'

'মাই গড! কি বলছেন? কেন?'

মাথা নাড়লেন ড. মুলার, চেহারা থমথম করছে, চোখে অজানা একটা ভয়ের ছায়া। 'ডাক্তারী শাস্ত্রে এমন কোন রোগের উল্লেখ নেই, অন্তত আমার জানামতে, যে রোগ হলে মানুষের গায়ের চামড়া মাংস থেকে আলাদা হয়ে উঠে আসতে পারে।'

ওয়েটার একা ফিরে এল। 'ড. ভৌমিকরা আসতে পারবেন না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'ফার্স্ট-ক্লাস কারে তিন-চারজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাদের চিকিৎসায় ব্যস্ত তাঁরা।

'আমার জিভ!' হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল প্রথম নান। 'জিভ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে কেন? দেখুন তো, ডাক্তার, মনে হচ্ছে ফুলেও গেছে,' বলে হাঁ করে যে জিভটা বের করল সে, সেটা শুধু ফোলেনি, রক্ত ভরা ফোস্কাও পড়েছে কয়েকটা।

'আপনি আপনার কমপার্টমেন্টে যান, ডাক্তার মলয় আর সুচরিতাকে নিয়ে আপনার কাছে আসব আমরা,' নানকে বললেন ড. মুলার। তারপর ওয়েটারের দিকে তাকালেন। 'তোমার সহকর্মীদের ডাকো, লাশটা এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা করো।'

'কোথায় সরাব?' ওয়েটারকে অসহায় দেখাল। 'ট্রেনে খালি কোন জায়গা নেই...'

'সেক্ষেত্রে একটা টয়লেটে রেখে আসতে হবে,' বললেন ড. মুলার। 'একটা নোটিস লিখে টাঙিয়ে দিয়ো দরজায়—ভেতরে ঢোকা নিষেধ।' রানার দিকে তাকালেন। 'আপনি আমার সঙ্গে আসছেন, হের রানা?'

'হ্যাঁ,' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বলল রানা।

এক করিডর থেকে আরেক করিডরে চলে আসছে চেলসি, জানালা দিয়ে পুলিস আর পুলিসদের দিকে তাকিয়ে থাকা আরোহীদের ছবি তুলছে। লক্ষ করল বেশিরভাগ যাত্রীই কি ঘটছে জানতে না পারায় অস্বস্তিতে ভুগছে, অনেকেই হতভম্বও, তবে খুব একটা ভয় পায়নি কেউই। বরং অনেকেই ব্যাপারটা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে। হিলডা হেস আর এরিকা বানসির সঙ্গে সদ্য পরিচিত হয়েছে ফিলাডেলফিয়ার কালো ছাত্র সিমন পালস-এর। ওদের সঙ্গে সুসান নামে এক ছাত্রীও রয়েছে, সে হাসতে হাসতে বলল, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি,

আমাদেরকে হাইজ্যাক করা হয়েছে।'

পালস জবাব দিল, 'ফ্যানটাসটিক! কিউবায় কখনও যাওয়া হয়নি আমার।'

চেলসি এগিয়ে যাচ্ছে। ক্রাইচেককে দেখতে পেল সে, তার সঙ্গী একজন প্যাসেঞ্জার ডাফ ফগেলকে বলতে শুনল, 'ওহে, ক্রাইচেক, ওরা বোধহয় তোমার সুটকেসের টিক-টক শুনতে পেয়েছে।'

আশপাশে যারা ছিল তাদের অনেকেই হেসে উঠল। ফগেলের কৌতুকের উত্তরে ক্রাইচেক বলল, 'দোস্ত, তোমাকে শুধু একটা কথা বলি। সময় সম্পর্কে আমাদের সবারই একটা ভুল ধারণা রয়েছে। সময় কখনও চলে যায় না, সময় আসে; চলে যায় আসলে মানুষ। আর ভাল একটা ঘড়ি সময়ের কাঁটা ধরে ট্রেন চালায়, সেই ট্রেন গন্তব্যে পৌঁছে দেয়—এমন একটা জগতে, যেখান থেকে কেউ কোনদিন ফিরে আসে না। নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না যে এখানে ট্রেন বলতে আমি জীবনকেই বোঝাতে চাইছি।' তার আওড়ানো দর্শনে নতুনত্ব কিছু থাকুক বা না থাকুক, সঙ্গে সঙ্গে এ মুঠো ঘড়ি বিক্রি হয়ে গেল।

ট্রেনে ঘুরে বেড়াবার সময় লক্ষ করল চেলসি, জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে অনেকেই ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়েছে, ফিরে এসে আবার বসে পড়েছে নিজেদের সীটে। অনেকের মনে বাইরে কি ঘটছে দেখার কৌতূহল পর্যন্ত জাগেনি—তারা সিগারেট ফুঁকছে, ঘুমাচ্ছে, বই পড়ছে, কেউ কেউ কমপার্টমেন্ট খালি পেয়ে দরজা বন্ধ করে প্রেমও করছে—অন্তত একটা কমপার্টমেন্টের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে সে-ই সন্দেহই হলো তার। প্যাসেঞ্জারদের প্রতিক্রিয়া ধরে রাখার জন্যে একের পর এক ফটো তুলছে সে। কাউকে নির্লিপ্ত দেখাল, কেউ পোজ দেয়ার জন্যে সময় চাইল, কেউ অন্যমনস্কতার ভান করে কপাল থেকে চুল সরিয়ে আলোর দিকে ফেরাল মুখ।

'ফুয়েলে টান পড়েছে, তাই থামানো হয়েছে ট্রেন,' একজনকে বলতে শুনল চেলসি।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন মন্তব্য করল, 'আমার ধারণা, ট্রেনে হেরোইন আছে।'

খর্বকায় এক ব্যক্তিকে দেখল চেলসি, হস্তিনী আকৃতির স্ত্রী হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে। 'এই যদি ইউরোপের আসল চেহারা হয়, কোন সাহসে তুমি এখানে আমাকে বেড়াতে এনেছ?' গজগজ করছে স্ত্রী। চেলসির সঙ্গে চোখাচোখি হতে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল স্বামী বেচারা।

চেলসি হঠাৎ করে ভিউ ফাইন্ডারে দানুকে পেয়ে গেল, ছোটখাট একটা ভিড়ের মধ্যে। তার চোখ এত লাল, ভয়ে চমকে উঠল সে। চোখে পলক নেই, ক্যামেরার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তার মুখের ভেতর চোখ পড়তে ঘৃণায় রি রি করে উঠল চেলসির শরীর। জিভে ফোস্কা পড়েছে, সেগুলোও টকটকে লাল। হঠাৎ ঘুরল দানু, হতভম্ব চেলসি তাকে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখল।

ট্রেনের শেষ মাথায় চলে এল সে। এদিকে কোন প্যাসেঞ্জার নেই বললেই চলে। জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকতেই নতুন কার আর লোকোমটিভটা দেখতে পেল। পিছনে এঞ্জিন কেন? প্রশ্নটা নিয়ে চিন্তা করার সময়

পাওয়া গেল না, পরমুহূর্তে কয়েকজন আর্মড এসকর্টকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল সে। দু'তিন সেকেন্ডের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে নিজের কাজে মনোযোগী হলো, ছবি তুলছে। তরুণ এক পুলিস, সিকিউরিটি কার থেকে বেরিয়ে এসে সিগারেট ধরাচ্ছে। বাইরের দিকে আরও একটু ঝুঁকে তার ছবি তুলতে চেষ্টা করছে চেলসি। হাত নেড়ে নিষেধ করল পুলিস। কিন্তু চেলসি গ্রাহ্য করছে না। হাতের সাব-মেশিনগানটা তার দিকে উঁচিয়ে ধরল লোকটা, ভাবটা যেন এখুনি গুলি করবে। পুরো দৃশ্যটাই ক্যামেরায় বন্দী করল চেলসি।

হঠাৎ সাব-মেশিনগানটা সবেগে ঘোরাল পুলিস, প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে গেল ক্যামেরা, হাত থেকে পড়েও গেল ট্রেনের বাইরে। আগ্নেয়াস্ত্রের মাজলটা এক হাতে ধরে ফেলল চেলসি। রাগে সারা শরীরে আগুন ধরে গেছে। 'ইউ, সান অভ আ বিচ!' অস্ত্রটা এখনও ছাড়েনি, তাকিয়ে আছে ব্যারেলের দিকে। আরেকজন গার্ডকে এগিয়ে আসতে দেখল সে, হাতের অস্ত্র তার দিকেই তাক করা। মাজলটা ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দিল চেলসি, ঘৃণার চোখে একবার তাকিয়ে মাথাটা টেনে নিল ট্রেনের ভেতর। হন হন করে হেঁটে ফিরে আসছে।

ওয়েটারের সঙ্গে ড. মুলার আর রানা একটা ফার্স্ট-ক্লাস কার-এ ঢুকল। ড. মলয় ভৌমিক আর তার স্ত্রী সুচরিতা ভৌমিক দু'জনেই হু-র মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, জেনেভা থেকে স্টকহোম যাচ্ছেন বড় মেয়ের কাছে ছুটি কাটাতে, সঙ্গে ছোট মেয়ে সন্দেশাও আছে। সন্দেশা জেনেভার একটা ভার্সিটিতে অর্থনীতি নিয়ে পড়ে। সন্দেশার সঙ্গে ট্রেনে হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে একই ভার্সিটির ছাত্র বিনয় হাসানের−সে বাংলাদেশী, স্টকহোমে ভাইকে দেখতে যাচ্ছে।

দুই ভারতীয় বাঙালী ডাক্তারকেই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট দেখল ওরা। এই কমপার্টমেন্টে তিনজন তরুণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে ঠিকই, তবে অসুস্থতার কারণ রহস্যময় কিছু নয়। তিনজনই ওরা পাঙ্ক, শুধু কানে নয়, নাকেও রিঙ পরে আছে। পরীক্ষা করতে হয়নি, নিজেরাই স্বীকার করেছে হেরোইনের মাত্রা বেশি হয়ে যাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে তারা। কড়া ভাষায় কিছু উপদেশ দিয়ে রানা ও ড. মুলারের সঙ্গে ফার্স্ট-ক্লাস কার থেকে বেরিয়ে এলেন তাঁরা, ড. মুলারের অনুরোধে নানের লাশটা পরীক্ষা করতে রাজি হয়েছেন।

পথে একজন ওয়েটারের সঙ্গে দেখা হলো, তার কাছ থেকে জানা গেল ডাইনিং কার থেকে যথেষ্ট দূরে একটা টয়লেটে রাখা হয়েছে লাশটা। তিনজন ডাক্তার একসঙ্গে কোথাও যাচ্ছেন, কিভাবে যেন রটে গেছে খবরটা, ফলে প্রতিটি করিডরে বিশৃঙ্খলার মুখোমুখি হতে হলো ওদেরকে। কেউ বলছে, তার স্বামীর চোখ থেকে লালচে রস গড়াচ্ছে। কেউ বলছে, তার বাচ্চাছেলের জিভ ফুলে উঠেছে। এদের সংখ্যা এত বেশি, ডাক্তাররা রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন। লাশ দেখতে যাওয়া হলো না, একটা কমপার্টমেন্টে বসে কয়েকজন অসুস্থ লোককে পরীক্ষা করলেন তাঁরা। তারপর সবাইকে বের করে দিয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে বসলেন। বাইরের লোক বলতে রানা, সন্দেশা আর হাসান থাকল ওঁদের সঙ্গে। কখনও ইংরেজি, কখনও জার্মান ভাষায় আলাপ করছেন, খুবই নিচু গলায়।

এক সময় বাধ্য হয়ে রানা জানতে চাইল, 'কি ঘটছে, আমাকে বলবেন, প্লীজ?' ফার্স্ট-ক্লাস কমপার্টমেন্টে থাকতেই ভৌমিক পরিবারকে নিজের পরিচয় দিয়েছে ও।

'দুঃখিত,' জবাব দিলেন ড. মলয়। 'প্যাথলজিক্যাল টেস্ট ছাড়া নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছি না। তবে কোন ধরনের ফ্লু হতে পারে—আনঅফিশিয়ালি বলছি।'

'চোখ থেকে রক্ত বা লালচে রস বেরোয়, জিভ ফুলে যায়, এ-ধরনের ফ্লুর কথা আগে তো কখনও শুনিনি!' বলল রানা।

'সত্যিই তো, এ আবার কি অসুখ!' সন্দেশাও বিস্মিত।

'ফ্লু মানে তো কোন না কোন ধরনের ভাইরাস,' বললেন মিসেস ভৌমিক। 'আর ভাইরাস যে কত রকমের হয়, তার কোন হিসাব নেই। আমার ধারণা, এটা নতুন ধরনের কোন ভাইরাস।'

'ভাইরাস মানেই তো ছোঁয়াচে,' বলল রানা। 'দেখা যাচ্ছে সেকেন্ড-ক্লাস, ফার্স্ট-ক্লাস, সব কার-এর প্যাসেঞ্জাররাই আক্রান্ত হয়েছে, ছড়াচ্ছেও বেশ দ্রুত। আপনারা সতেরোজনকে পরীক্ষা করলেন, অসুস্থতার লক্ষণে বা উপসর্গে মিল আছে, আবার অমিলও আছে। কোন চিকিৎসার কথা বলতে পারছেন না?' রানাকে অধৈর্য দেখাল।

'বললামই তো, বেশি করে পানি খেতে হবে, মাথায় বা গায়ে ব্যথা থাকলে পেইন কিলার খেতে হবে, বেডরেস্ট দরকার, জ্বর বাড়লে মাথায় পানি ঢালতে হবে। এ এক ধরনের অ্যালার্জিও হতে পারে, হিস্টাসিন জাতীয় ওষুধ খেয়ে দেখতে পারে। ড. মুলার,' ঘাড় ফেরালেন ড. ভৌমিক, 'নানের লাশটা এখুনি আমাদের দেখা দরকার।'

তিনজন ডাক্তারই পরস্পরের সঙ্গে বিচলিত দৃষ্টি বিনিময় করলেন। লক্ষ করে রানার মনে অজানা একটা আশঙ্কা জাগল।

ডাইনিং কারের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন ওঁরা, ডাক্তার ভৌমিক বললেন, ওদের আর কেউ না গেলেই ভাল হয়, লাশটা ওরা শুধু তিনজন পরীক্ষা করবেন। সন্দেশা তার ফার্স্ট-ক্লাস কার-এ ফিরে গেল, সঙ্গে হাসান। রানা ঢুকল ডাইনিং কারে।

ইতিমধ্যে ডাইনিং কারের মেঝে থেকে ভাঙা ডিশ, প্লেট ইত্যাদি পরিষ্কার করা হয়েছে, ধুয়েও ফেলা হয়েছে ডিসইনফেকট্যান্ট দিয়ে রানা ভেতরে ঢুকল, আর ঠিক তখুনি আবার চলতে শুরু করল ট্রেন। সঙ্গে সঙ্গে গোটা ট্রেন আনন্দমুখর হয়ে উঠল, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কেটে যাওয়ায় সবাই খুব খুশি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসতে খুব বেশি সময় লাগল না। একজন দু'জন করে ডাইনিং কারে ঢুকছে লোকজন, আবার খাবার পরিবেশনে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওয়েটাররা। তবে নিঃসঙ্গ নানকে রানা কোথাও দেখতে পেল না। আগের সেই টেবিলেই বসে আছে চেলসি, একা তাকেই শুধু ম্লান ও চিন্তিত দেখাচ্ছে।

'কি ভাবছেন?' এবার তার উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসল রানা, মারা যাবার আগে এই চেয়ারেই বসেছিল নান। 'দেখে মনে হচ্ছে কেউ আপনার গলায় ছুরি

ধরেছে।'

'আমাদের সবার গলায় ছুরি ধরা হয়েছে,' বিড়বিড় করল চেলসি, এখনও সে গভীর চিন্তায় মগ্ন।

রানা কিছু বলতে যাবে, স্টুয়ার্ড টাওয়েল দ্রুত এগিয়ে এসে ফিসফিস করল ওর কানে, 'স্যার, মি. রানা, দয়া করে আমার সঙ্গে একবার আসবেন··· ইমার্জেন্সী।' ফিসফিস করলেও, কথাগুলো চেলসি শুনতে পেল।

টাওয়েলের চেহারায় চাপা উত্তেজনা, মনে হলো বেশ খানিকটা ভয়ও পেয়েছে। 'মাফ করবেন,' বলে চেয়ার ছাড়ল রানা, স্টুয়ার্ডের পিছু নিয়ে ডাইনিং কার থেকে বেরিয়ে গেল।

মনে মনে ঘটনাগুলো জোড়া লাগাবার চেষ্টা করছে চেলসি।

গ্রাম্য এলাকা পিছনে ফেলে শহরে ঢুকতে যাচ্ছে ট্রেন। ক্রমশ মন্থর হয়ে এল গতি। রোড-ক্রসিঙে যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে। গাছপালার বদলে পাথরের দেয়াল বেশি করে চোখে পড়ছে। চওড়া একটা রোড-সাইনে লেখা রয়েছে–ব্যাসেল।

দুটো বেজে চুয়াল্লিশ মিনিট।

জেনারেল মার্শাল ও পাফ এরিকসন টেলিকমিউনিকেশন এরিয়ায় রয়েছেন, একটা প্লেট গ্লাস প্যানেলের পিছনে। রেডিও-টেলিফোন লিঙ্ক-এর মাধ্যমে রানার সঙ্গে কথা বলছেন জেনারেল। রানাকে তিনি লাইনে পেয়েছেন মিনিট তিনেক আগে।

'যদি নয়, মি. রানা, যদি নয়। বলুন কখন। ট্রেনে সে আছেই, তা না-ও হতে পারে। কারণ সংক্রমিত ব্যক্তি দশ সেকেন্ডের মধ্যে মারা যেতে পারে–আবার আটচল্লিশ ঘণ্টাও বেঁচে থাকতে পারে। কে জানে, সে হয়তো স্টেশনে যাবার পথে কোথাও মারা গেছে–কোন হোটেল-কামরায়, বা পার্কে। তবে লাশটা যেহেতু এখনও জেনেভায় পাওয়া যায়নি, আমরা ধরে নিচ্ছি ট্রেনে সে উঠতে পেরেছে।'

'মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটি ন্যাটোর একটা সিক্রেট প্রজেক্ট, আমি জানি,' বলল রানা। 'আপনি বলছেন ইব্রাহিম দানু মারাত্মক ধরনের ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু ভাইরাসটার নাম কেন বলছেন না?'

'আনকমন ব্যাসিলাই, কোড নেম বি-টু-নেগেটিভ,' বললেন জেনারেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। 'আনকমন হলেও, আমি যতটুকু জানি বি-টু-নেগেটিভের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে।'

'হয়েছেই তো। পেন্টাগনের ল্যাবে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা সেটা আবিষ্কার করেছেন। আমি মেসেজ পাঠিয়েছি, প্লেনও চার্টার করা হয়ে গেছে। তবে দূরত্বটার কথা ভাবুন–পৌঁছুতে বেশ দেরি হবে। তার আগে বসে না থেকে অনেক কিছুই করার আছে আমাদের। এই যেমন, ফর্মুলাটা পেলে আমাদের জেনেভা ল্যাবেই প্রতিষেধকটা তৈরি করতে পারি।'

'পরিষ্কার করে বলুন আমার কি ধরনের সাহায্য আপনার দরকার।'

'প্রথম কাজ দানুকে খুঁজে বের করা। যদি বেঁচে থাকে, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে সে,

সারাক্ষণ কাশছে, চোখ লাল হয়ে গেছে, জিভ ফুলে গেছে…'

'সংক্ষেপ করুন, প্লীজ,' বাধা দিল রানা। 'তার আগে শুনুন–রোগটা এরইমধ্যে ছড়াতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে একজন মারাও গেছে, জেনারেল মার্শাল।'

'ট্রেন থেকে এখন যদি একজন প্যাসেঞ্জারও নামে, রোগটা গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে,' গম্ভীর সুরে বললেন জেনারেল। 'ভেবে দেখুন, সদ্য আবিষ্কৃত একটা প্রতিষেধক দিয়ে ক'জন মানুষের চিকিৎসা করা সম্ভব? এখনও ওটা ল্যাব থেকে বেরোয়নি, খুব বেশি হলে দশ হাজার লোকের চিকিৎসা করা সম্ভব–পরিমাণে তা এতই কম। শুধু ইউরোপই বা বলছি কেন, গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে বি-টু-নেগেটিভ। আর তা যদি ছড়িয়ে পড়ে–ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন বলা ছাড়া কারও কিছু করার থাকবে না।'

রানার অন্তরাত্মা কেঁপে গেল।

'আপনার সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি,' বললেন জেনারেল। 'বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, ট্রেনে আপনি আছেন শুনে হোয়াইট হাউস থেকে বলা হয়েছে, এটা ঈশ্বরের দয়া। সবাই বলছে, বারোশো ট্রেন যাত্রীকে কেউ যদি সামলে রাখতে পারে তো একমাত্র আপনিই পারবেন। মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়লে কোন বাধাই মানে না। প্যাসেঞ্জাররা যদি জানালা-দরজা ভেঙে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়তে শুরু করে, ভেবে দেখুন তার পরিণতি কি ভয়াবহ হতে পারে।'

'আপনি আমাকে অসাধ্যসাধন করতে বলছেন।'

'হ্যাঁ, সত্যি তাই। তবে বাইরে থেকেও আপনাকে আমরা সাহায্য করব।'

রানা অপেক্ষা করছে।

'মি. রানা, আমার কথা মন দিয়ে শুনুন, প্লীজ,' জরুরী তাগাদার সুরে বললেন জেনারেল। 'কমপিউটর ভাইরাসের কথা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে। দানু যে ফ্লপি ডিস্কটা চুরি করেছে সেটা এমন ভাবে তৈরি, কমপিউটর থেকে বের করা হলে নির্দিষ্ট একটা সময়ের পর ওটায় কিছুই থাকবে না, সব মুছে যাবে। সময়ের একটা হিসাব বের করেছি আমরা। আপনার হাতে সময় আছে এখন থেকে দু'ঘণ্টা পঞ্চান্ন মিনিট। হিসাবটা দিচ্ছি হাতে এক ঘণ্টা সময় রেখে, এটা ব্যয় হবে হেলিকপ্টারে করে দানুকে ল্যাবে নিয়ে আসতে। আমার কথা বুঝতে পারছেন তো? তিন ঘণ্টা পঞ্চান্ন মিনিট পর ডিস্কটা আর কোন কাজে লাগবে না–এখানকার ল্যাবে প্রতিষেধক তৈরি করাও সম্ভব হবে না।'

'কেন, ফর্মুলাটা হার্ডডিস্কে নেই?' জানতে চাইল রানা।

'থাকলে তো কোন সমস্যাই ছিল না,' বললেন জেনারেল। 'হার্ডডিস্ক দানু ধ্বংস করে দিয়ে গেছে।'

'এখনও একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না,' বলল রানা। 'আপনাদের দরকার ডিস্কটা, তাই না? দানুকে কেন হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যেতে চাইছেন?'

'আমরা কি জানি, ডিস্কটা নিয়েই ট্রেনে উঠেছে সে? স্টেশনে যাবার পথে কোথাও যদি রেখে গিয়ে থাকে?'

কথাটায় যুক্তি আছে, মনে মনে স্বীকার করল রানা।

'আপনি যোগাযোগ করবেন, সেই অপেক্ষায় থাকব আমরা,' বললেন জেনারেল। 'আপনার হাতে সময় আছে আজ বিকেল পাঁচটা একচল্লিশ মিনিট পর্যন্ত। বারোশো যাত্রী, সবার মুখে চোখ বোলাবার জন্যে মাত্র দশ সেকেন্ড করে সময় পাবেন।' যোগাযোগ কেটে দিলেন তিনি।

'যোগ্য লোক, সন্দেহ নেই,' বললেন পাফ এরিকসন। 'তবে সন্দেহপ্রবণ।'

'হ্যাঁ, মাথাটা বড় বেশি পরিষ্কার।' জেনারেল চিন্তিত।

চার

ফগেল তার ব্যাগ গুছাচ্ছে, ক্রাইচেক দার্শনিকসুলভ কিছু উপদেশ দিল, 'ব্যাসেল-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলি তোমাকে, দোস্ত। কেমিক্যাল, অ্যান্টিবায়োটিক, প্লাস্টিক আর সিনথেটিকের ব্যবসা এখানে জমজমাট। আমি এক লোককে চিনি, শুধু কলপ তৈরি করে মাল্টিমিলিওনিয়ার বনে গেছে…এখানেই নামছ বুঝি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে করিডরে বেরিয়ে গেল ফগেল। 'তাহলে বিদায়,' পিছন থেকে গলা চড়িয়ে বলল ক্রাইচেক। সে নিজে খুব ভাল জার্মান বলতে পারে, কিন্তু জার্মানভাষী কোন লোককে একদমই সহ্য করতে পারে না। কিছু একটা মনে পড়ে যাওয়ায় শিউরে উঠল সে, ফগেল ট্রেন ছেড়ে নেমে যাচ্ছে ভেবে স্বস্তিবোধ করল।

বাইরের করিডরে প্যাসেঞ্জারদের ভিড় লেগে গেছে, সবাই তারা ব্যাসেলে নামবে। কারে ঢুকে একজন কনডাকটার স্টেশনের নাম উচ্চারণ করল। তাকে অনুসরণ করছে রানা, ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে, দানুর খোঁজে চোখ বুলাচ্ছে সবার মুখে। ও নিশ্চিতভাবে জানে, ব্যাসেলে ট্রেন থামছে না। এরইমধ্যে স্পীড বেড়ে গেছে।

প্যাসেঞ্জাররাও ব্যাপারটা টের পেয়ে গেল, শহরটাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবে ট্রেন।

'কি আশ্চর্য! আমাকে নামতে হবে না!'

'ইংল্যান্ডে এ-ধরনের ঘটনা ভাবাই যায় না!'

'ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে আমি লিখিত অভিযোগ করব!'

'আমার হোটেল রিজার্ভেশন বাতিল হয়ে যাবে!'

সবাইকে চুপ করতে বলে একজন কনডাকটার ব্যাখ্যা দিল, 'টেকনিক্যাল ডিফিক্যালটিজ। প্যারিসে আপনাদের জন্যে ফ্রী থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে, ব্যাসেলে ফেরার জন্যে পরিবহনের ব্যবস্থাও করা হবে।'

সে থামতেই এক বৃদ্ধা ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, 'আমাকে কবরস্থানে যেতে হবে…আমার ছেলে মারা গেছে…'

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিল এরিকা।

রানা যেদিকে গেল, হাসানকে নিয়ে তার উল্টোদিকে যাচ্ছে সন্দেশা, রানারই খোঁজে। ড. মলয় ভৌমিক মেয়েকে পাঠিয়েছেন একটা খবর দিয়ে–নিজের

কমপার্টমেন্টে অপর নানও মারা গেছে।

ফার্স্ট-ক্লাস কমপার্টমেন্টে ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখছে তরুণ প্রিস্ট। মিসেস আধুরা তাকে বলছে, 'দেখবেন, ব্রাসেলস আপনার ভাল লাগবে। বেলজিয়ামের এই শহরেও আমার বেড়ানোর সুযোগ হয়েছে...'

অন্যমনস্ক প্রিস্ট মাথা ঝাঁকিয়ে রঙিন রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল।

কমপার্টমেন্টের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল টাওয়েল, পিছনে রানা। 'ব্যাসেলকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ট্রেন,' বলল স্টুয়ার্ড। রানা প্যাসেঞ্জারদের ওপর চোখ বুলাচ্ছে। 'সিরিয়াস কিছু নয়, টেকনিক্যাল কি যেন একটা সমস্যা হয়েছে।'

হঠাৎ লাফ দিয়ে সিধে হলো প্রিস্ট, ওদেরকে পাশ কাটিয়ে কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল। সে দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মিসেস আধুরা। 'ব্যাপারটা বুঝলাম না! ওনার তো ব্রাসেলসে নামার কথা, আমাকে অন্তত তাই বলেছেন!'

ডোনা মন্তব্য করল, 'লোকটাকে আমার পছন্দ হয়নি।'

নরম সুরে তাকে শাসন করছে আধুরা, পিছিয়ে কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল রানা।

দুটো কারের মাঝখানে, কানেকটিং ব্রিজে, পরস্পরের মুখোমুখি পড়ে গেল রানা আর চেলসি। ব্রিজে চাকার আওয়াজ এত বেশি, দু'জনকেই চিৎকার করে কথা বলতে হচ্ছে। 'আপনাকে আমি খুঁজছি!' বলল চেলসি।

'পেয়েও গেছেন।'

'কি ঘটছে? কিসের ইমার্জেন্সী?'

'আমার যা পেশা, চোর ধরার দায়িত্ব পেয়েছি,' বলে তাড়াতাড়ি কারে ঢুকে পড়ল রানা।

প্রায় ধাওয়া করল চেলসি, পিছন থেকে রানার বাহু ধরে ফেলল। 'শুনুন, মি. মাসুদ রানা! তিনটে যুদ্ধ, নয়টা অভ্যুত্থান আর একশো মাইনফিল্ডে ছিলাম আমি। ইমার্জেন্সী কাভার করা আমার পেশা, কাজেই আপনার সঙ্গে আমিও থাকছি–বন্ধু হই, বা শত্রু।'

ঘুরে তার দিকে একদৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল রানা। 'বন্ধু?'

ইতস্তত করছে চেলসি। রানার চোখের গভীরে কি যেন খুঁজল সে। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল, 'বন্ধু।'

কথা না বলে ঘুরে হাঁটা শুরু করল রানা, চেলসি পিছু নিল। 'আরেকবার আমার দিকে তাকান,' বলল সে।

রানা আবার ঘুরতেই ভুরু কোঁচকাল চেলসি। 'আপনার চোখ লালচে দেখাচ্ছে কেন?'

রানার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করে, আপনার কাছে আয়না আছে? কিন্তু ভয় লাগছে। 'তাহলে সম্ভবত আমিও সংক্রমিত হয়েছি,' বিড়বিড় করল। চেলসিকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হলো না, তাকে এক পাশে টেনে

এনে যতটা সম্ভব সংক্ষেপে পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিল ও।

বাইরে একদম শান্ত চেলসি। গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে। কিন্তু ভেতরটা ভয়ে কুঁকড়ে গেল। রানা থামতেই ট্রেনের পিছনে লোকোমটিভ আর সিকিউরিটি কার জোড়া লাগানোর কথাটা প্রকাশ করল, কি অভিজ্ঞতা হয়েছে তাও জানাল। সবশেষে জিজ্ঞেস করল, ফিসফিস করে, 'দেখলে তো, আমার চোখও কি...'

'দানুকে খুঁজে না পেলে ফ্লপি ডিস্কও পাওয়া যাবে না,' মাথা নেড়ে বলল রানা। 'আর ফ্লপি ডিস্ক পাওয়া না গেলে সময় মত প্রতিষেধক তৈরি করা সম্ভব নয়।' দানুর চেহারার বর্ণনা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এরকম কাউকে দেখেছেন? গায়ে খুব জ্বর থাকার কথা, চোখ লাল হয়ে আছে, হয়তো জিভ থেকে রক্ত ঝরছে।'

চেলসিকে উদ্বিগ্ন দেখাল। রানার কপালে হাত রাখল সে। 'আপনার কি অসুস্থ লাগছে?'

কথা না বলে মাথা নাড়ল রানা।

হঠাৎ উত্তেজিত দেখাল চেলসিকে। 'ক্যামেরায় একজনকে দেখেছি...টকটকে লাল চোখ, জিভে ফোস্কা পড়েছে, সেগুলোও লাল। ক্যামেরা দেখে ছুটে পালিয়ে গেল...'

চেলসি কথা বলছে, রানার নিজেরও মনে পড়ল—ডাইনিং কারে ঢোকার সময় করিডরে এক লোকের সঙ্গে ধাক্কা খায় ও। লোকটাকে ভাল করে দেখেনি, তবে চেলসির কথা শুনে মনে হচ্ছে লোকটা দানু হলেও হতে পারে। 'আপনি ট্রেনের মাথার দিক থেকে শুরু করুন,' তাগাদার সুরে বলল ও। 'আমি উল্টোদিক থেকে আপনার সঙ্গে মিলিত হব। প্রতিটি কোণ দেখবেন! একটা টয়লেটও বাদ দেবেন না! সন্দেশা আর হাসান নামে দুই স্টুডেন্টকে দরকার আমাদের, চিনতে পারলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন...'

চারটে বেজে সাতান্ন মিনিট, রেডক্রস-এর প্রতীক চিহ্ন আঁকা একটা হেলিকপ্টার জেনেভার আকাশে উঠল। পাঁচ মিনিট আগে রাইন নদী পেরিয়ে ফ্রান্সে প্রবেশ করেছে ট্র্যান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেস।

মেগাডেথ প্রিভেনশন কমিটির ম্যারাথন মীটিং চলছেই। পাফ এরিকসন একটা রিপোর্ট পড়ে শোনালেন, 'ন্যাটোর কোন রাষ্ট্রই ট্রেনটাকে থামতে দিতে রাজি হয়নি।' একটু থেমে আবার শুরু করলেন, 'রাষ্ট্রপ্রধানরা সবাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে জেনারেল লী মার্শালকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই চূড়ান্ত, তা নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন তুলতে পারবে না। তাঁকে পরে কারও কাছে জবাবদিহিও করতে হবে না।'

'রাষ্ট্র যা-ই বলুক, আমি বিবেকসম্পন্ন মানুষ,' প্রতিবাদের সুরে বললেন সুইডিশ প্রতিনিধি। 'ট্রেনে যারা আছে তাদেরকে যদি বাঁচানোর চেষ্টা করা না হয়, আমি পদত্যাগ করব। জেনারেল লী মার্শাল বা আপনারা আর যারা আছেন তাঁরা যা খুশি করুন, কিন্তু আমি ঈশ্বরের ভূমিকা নিতে পারব না।'

'আপনি পদত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু এই বিল্ডিং থেকে আপনাকে বেরুতে

দেয়া যায় না,' উত্তর দিলেন জেনারেল। 'খবরটা চেপে রাখা হয়েছে, কারণটা আশা করি ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। আরেকটা কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার। রেডিও-টেলিফোনে মি. মাসুদ রানাকে আমরা যা-ই বলে থাকি বা যা-ই বলব, বেশিরভাগই মিথ্যে। এমথ্রীএক্স-এর কোন প্রতিষেধক নেই।'

ক্রাইচেক আবার করিডরে তার দোকান খুলে বসেছে। ছোটখাট একটা ভিড় জমে উঠেছে তাকে ঘিরে। 'এই দেখুন, ভাই ও বোনেরা, এটা হলো একটা সুপারওয়াচ! অ্যাসট্রোনট আর ডাইভাররা ব্যবহার করে। সাধারণ মানুষ, আপনারাও ব্যবহার করতে পারেন। এটা শুধু ঘড়ি নয়, জাদুর একটা উপকরণও বটে—এই আছে, এই নেই!'

ভিড় ঠেলে বারো-তেরো বছরের এক কিশোরী সামনে আসার চেষ্টা করছে, কিন্তু হাত ধরে টেনে রেখেছে তার মা। মেয়েটা আবদারের সুরে বলছে, 'তুমি মানা করলে কিনব না, তবে দেখতে অন্তত দাও।' অগত্যা মেয়ের হাত ছেড়ে দিল মা। ক্রাইচেকের সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। 'ইস্! কি সুন্দর! মামী, কতদিন ধরে বলছি এরকম একটা সুপারওয়াচ কিনে দাও আমাকে...'

'খুব সস্তা,' বলে চলেছে ক্রাইচেক, মেয়েটাকে এখনও দেখতে পায়নি। 'একেবারে পানির দর।' মুঠো ভর্তি ঘড়ি তুলে দেখাচ্ছে সে। 'মাত্র দশ ডলার, দশ ডলার, দশ ডলার!'

'মামী!' পা ঠুকছে মেয়ে।

'লোকজনের সামনে তুমি আমাকে অপমান করবে?' মেয়ের কানে ফিসফিস করল মা। 'চলে এসো।' আবার হাত ধরে টান দিল।

কেঁদে ফেলল মেয়েটা। 'আগামী মাসে আমার জন্মদিন না? তখন তুমি কিছু একটা দেবে তো? দশ ডলার...'

মেয়েটার কথা ক্রাইচেকের কানে গেছে। মুখ তুলে তার দিকে তাকাবার পর নিভে গেল মুখের হাসি। মুঠো থেকে সব ঘড়ি খসে পড়ল সুটকেসে, থেকে গেল শুধু একটা। সেটা মেয়েটার দিকে নিঃশব্দে বাড়িয়ে ধরল। 'তোমার জন্মদিনের উপহার,' বলে এক রকম জোর করেই মেয়েটার হাতে ঘড়িটা গুঁজে দিল। মা ও মেয়ে, দু'জনেই অপ্রস্তুত। উপস্থিত সবাই চুপ হয়ে গেছে, কেমন যেন হতচকিত। সুটকেস বন্ধ করে প্রায় লাফিয়ে সিধে হলো ক্রাইচেক। ভিড় ঠেলে এমনভাবে এগোল, যেন পালিয়ে যাচ্ছে।

'লোকটা পাগলাটে,' কেউ একজন মন্তব্য করল।

'এই যে, শুনুন,' পিছন থেকে চেঁচিয়ে ডাক দিল মা। 'আপনার ঘড়ির দাম নিয়ে যান...'

কিন্তু ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে ক্রাইচেক।

ভিড় পাতলা হতে শুরু করল। একজন বলল, 'এর মধ্যে কোন রহস্য আছে। ফেরিঅলার চোখ দুটো ভেজা ভেজা দেখলাম।'

আসলেও তাই, কান্না লুকাতে পালিয়ে গেছে ক্রাইচেক। তার যখন ষোলো বছর বয়েস, ঠিক ওই মেয়েটির বয়েসী এক খেলার সঙ্গিনী ছিল তার—মায়ের

পেটের আপন বোন। সেই বোনকে ছিন্নভিন্ন হতে দেখেছে চোখের সামনে। নাৎসী জার্মানরা লাইন দিয়ে তাকে প্রথমে রেপ করে, পরে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলে।

সন্দেশা আর হাসানের সঙ্গে দেখা হয়েছে রানার, সংক্ষেপে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়ার পর তারাও এখন দানুর খোঁজে ট্রেন চষে ফেলছে। চেলসির মত রানাও সেকেন্ড-ক্লাস কার-এর একটা কমপার্টমেন্ট ভেতর থেকে বন্ধ দেখল। স্টুয়ার্ড টাওয়েল জানাল, এই কমপার্টমেন্ট রিজার্ভ করেছে একটা এনজিও প্রতিষ্ঠান, ভেতরে আছেন বিশজন বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা, তাদের কারও বয়েসই সত্তরের কম নয়। ওদেরকে স্টকহোমের একটা 'প্রবীণ ভবন'-এ আশ্রয় দেয়ার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দরজা খোলার জন্যে অনেক ডাকাডাকি করা হলো, কিন্তু ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিচ্ছে না। অতিরিক্ত চাবি কনডাকটারদ্রের কাছে পাওয়া যাবে। টাওয়েলকে চাবি আনতে পাঠিয়ে দিল রানা, নিজে ঢুকল একটা টয়লেটে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল। চোখ দুটো দেখে গলার কাছে কি যেন একটা আটকে যাবার অনুভূতি হলো। এখুনি সানগ্লাস পরা দরকার, তা না হলে ওকে দেখে ভয় পাবে মানুষ। এখনও কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার কোন লক্ষণ নেই, তবে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে চোখ দুটো। সাহস সঞ্চয় করতে বিশ সেকেন্ড সময় লাগল ওর, তারপর মুখ খুলে জিভ পরীক্ষা করতে পারল।

জিভটা মাত্র দুই কি তিন সেকেন্ড দেখে চোখ বুজে ফেলল। লাল হয়ে আছে ওটা, সামান্য ফুলেছে বলেও মনে হলো। উদভ্রান্ত, দিশেহারা লাগছে নিজেকে। ভাবল, এই টয়লেটে লুকিয়ে থাকি, মারা যাই নিভৃতে। পরমুহূর্তে মনের গহীনে নিজের প্রতি একটা রাগও মাথাচাড়া দিল—এখন তো শুধু নিজের কথা ভাবলে চলবে না তোমার! সারাটা জীবন ধরে তোমার সমস্ত কর্মকাণ্ড যদি কিছু প্রমাণ করে থাকে, তা হলো, তুমি আর দশজনের মত নও। এক অর্থে সমাজ ও দেশের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ তুমি; আরও বড় অর্থে সভ্যতা আর মানবকল্যাণের একজন একনিষ্ঠ সেবক। তুমি ত্যাগী, সাহসী আর বিবেকবান পুরুষ; তুমি মৃত্যুকে ভয় পাও না—তোমাকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে এল শান্ত ও গম্ভীর একজন মানুষ। টাওয়েলের আসার অপেক্ষায় থাকল না, কারণ তাতে সময় নষ্ট হবে। আরও অনেকগুলো কারে তল্লাশী চালানো বাকি।

ব্যাগেজ কারটা ভেতর থেকে বন্ধ দেখল রানা। দরজায় কান ঠেকাল, ভেতর থেকে অস্পষ্ট কিছু আওয়াজ আসছে, কিন্তু কিসের আওয়াজ বোঝা যাচ্ছে না। নাকি ট্রেন দুলছে, এ তারই শব্দ? সিদ্ধান্ত নিল কনডাকটারদের কাউকে দেখতে পেলে ব্যাগেজ কারের দরজা খুলে ভেতরটা দেখতে বলবে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না।

গায়ে জ্বর নেই, তবে ঘামছে ও। হাতঘড়ি দেখল। আর মাত্র বারো মিনিট সময় আছে, এর মধ্যে দানুকে খুঁজে বের করতে হবে। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে

উঠল।

ব্যাগেজ কার হবু বাগদত্তার সঙ্গে মিলিত হবার আদর্শ জায়গা, এরিকাকে নিয়ে আবার চলে এসেছে কার্লসন। সাবধানের মার নেই ভেবে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে এরিকা।

এবার ওরা সঙ্গে করে একটা কম্বল এনেছে। সারি সারি বাক্সের মাঝখানে ফাঁকা একটা জায়গা পেয়ে কম্বলটা বিছিয়েছে কার্লসন, এরিকাকে টান দিয়ে শুইয়েও ফেলেছে।

আবেশে চোখ বুজল এরিকা। কতক্ষণ পর বলতে পারবে না, আবার যখন চোখ খুলল, বীভৎস একটা দৃশ্য দেখে চমকে উঠল সে। একটা বাক্সের আড়ালে আংশিক লুকিয়ে রয়েছে দানু, দেয়ালের গায়ে হেলান দেয়া হলুদ কাঠের একটা তক্তার মত লাগছে দেখতে। গোটা মুখ ফুলে আকারে দ্বিগুণ হয়ে গেছে, চোখ দুটো প্রায় ঝুলে পড়েছে কোটরের বাইরে, সেগুলো থেকে টপ টপ করে রক্ত ঝরছে। ফোলা জিভটা মুখের বাইরে দু'ইঞ্চি বেরিয়ে পড়েছে। সেটা থেকেও রক্ত ঝরছে।

কার্লসন পিছন ফিরে শুয়ে থাকায় দানুকে দেখতে পাচ্ছে না। এরিকা আতঙ্কে চিৎকার করতে গেল। এগিয়ে এসে উবু হয়ে বসল দানু, একটা হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল এরিকার মুখ, তাকিয়ে আছে করুণ আবেদন ভরা দৃষ্টিতে।

কার্লসন ঝট করে পাশে তাকাল। দানুকে দেখে আঁতকে উঠল সে। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির বশে দানুর হাতটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল এরিকা। বসে বসেই পিছিয়ে গেল দানু। লাফ দিয়ে সিধে হলো কার্লসন, ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গি নিয়ে তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে ঢলে পড়ল দানু।

বীভৎস শরীরটার দিকে বোবা বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল ওরা। এরিকা দেখল ওর কামড়ে দানুর হাতের মাংস উঠে এসেছে। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে নিজের মুখ মুছল সে, হাতটা চোখের সামনে আনতেই আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল গলা চিরে। দানুর চামড়া ও মাংস লেগে রয়েছে সেখানে।

জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে পড়ে রয়েছে দানু। বেতের ঝুড়ি থেকে নেমে এসে তার পাশে দাঁড়াল অ্যাটম, পা দিয়ে আঁচড়াচ্ছে দানুকে, যেন ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করছে। কুঁই কুঁই করে ডাকছে কুকুরটা। সে বুঝতে পারছে, দানুর সাহায্য দরকার।

আয়নার সামনে বসে চুলে চিরুনি চালাচ্ছে ভেনাস। 'পাঁচটা পঁয়ত্রিশ। আমার কি আরেকবার অ্যাটমকে দেখে আসা উচিত?'

বিছানায় শুয়ে টাইম ম্যাগাজিনের ইউরোপিয়ান সংস্করণ পড়ছে নেলসন। ট্রেনে ওঠার পর এই প্রথম তাকে ব্যায়াম করতে দেখছে না ভেনাস। 'অ্যাটমকে দেখতে না গিয়ে তুমি বরং একজন ডাক্তারকে খুঁজে বের করো। তোমার চোখ উঠছে। রোগটা ছোঁয়াচে, ভেনাস।'

কলেজ স্টুডেন্টদের কমপার্টমেন্টে মিলিত হলো ওরা। সন্দেশা আর হাসান আগেই পৌঁছেছে, তারপর চেলসি, সবশেষে রানা। এরিকা দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে, কার্লসন ব্যাখ্যা করছে ব্যাগেজ কারে কি দেখেছে তারা।

ব্যাগেজ কার থেকে বেরিয়ে এল ভেনাস, চেহারায় উদ্বেগ। বেরিয়েই দেখতে পেল রানা ও চেলসি ছুটে আসছে তার দিকে, পিছনে আরও কয়েকজন। সবাইকে খুব ভীত-সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে।

রানার দিকে ফিরল চেলসি। 'ব্যাগেজ কারের দরজায় তো অবশ্যই তালা দেয়া থাকবে, তাই না? কিন্তু খোলা কেন?'

স্টুয়ার্ডের দিকে চোরা চোখে তাকাল ভেনাস। টাওয়েলও চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল। এই সময় ব্যাগেজ কারের ভেতর থেকে গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল।

'সাবধান!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'কেউ ভেতরে ঢুকবেন না!' আধ-খোলা দরজা দিয়ে একা ঢুকল ও, ঢুকেই বন্ধ করে দিল। ভেতরে আলো জ্বলছে, দানুকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখল। সাহায্যের প্রত্যাশায় করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে–এই সাহায্য রানার কাছে চাইছে না, তার প্রার্থনা নিয়তি বা ঈশ্বরের কাছে–কষ্ট না দিয়ে এবার মরণ দাও, প্রভু!

'তুমি ইব্রাহিম দানু,' বলল রানা। 'তোমার কাছে বি-টু-নেগেটিভ ভাইরাসের ফর্মুলা আছে–ফ্লপি ডিস্কে। কোথায় সেটা?' জানে নিজেও সংক্রমিত হয়েছে, কাজেই সাবধান না হলেও চলে ওর, বসেছে দানুর পাশে হাঁটু গেড়ে।

কথা বলার চেষ্টা করল দানু, পারল না। মুখ খুলতেই হড়হড় করে রক্ত বেরিয়ে এল। কল্পনার চোখে নিজেরও ঠিক এই অবস্থা চাক্ষুষ করল রানা। কথা বলতে না পেরে দানু শুধু মাথা নাড়ল।

'তুমি এখনও বেঁচে আছ,' জরুরী তাগাদার সুরে বলল রানা। 'ফ্লপি ডিস্কটা পেলে ভাইরাসের প্রতিষেধক তৈরি করা সম্ভব। তুমি বাঁচবে, আমরা সবাই বেঁচে যাব…'

এবার প্রবল বেগে মাথা নাড়ল দানু।

'প্লীজ, প্লীজ, প্লীজ!' মিনতি করছে রানা। 'আমরা জানি ডিস্কটা তুমি চুরি করেছ। এই ট্রেনে বারোশো যাত্রী আমরা, প্রতিষেধক তৈরি করা না গেলে কেউ বাঁচব না। আর রোগটা যদি বাইরে ছড়িয়ে পড়ে…'

মাথাটা একপাশে কাত হয়ে গেল, আবার জ্ঞান হারিয়েছে দানু।

'স্টুয়ার্ড!' কর্কশ স্বরে চিৎকার করল রানা। তারপর মনে পড়ল, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ছুটে এসে দরজা খুলল। 'স্টুয়ার্ড! জেনারেল মার্শালকে কল করো।'

করিডরে বাকি সবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্টুয়ার্ড। হাতঘড়ি দেখল সে। 'স্যার, নির্দিষ্ট সময় পার হতে আর মাত্র এক মিনিট বাকি!'

'কল হিম!' খেঁকিয়ে উঠল রানা। ঘুরে ব্যাগেজ কারের ভেতর দিকে চলে এল আবার। এই প্রথম কুকুরটাকে দেখতে পেল ও। অ্যাটম থরথর করে কাঁপছে,

বেরিয়ে আসা জিভ থেকে টপ টপ করে রক্ত ঝরছে।

দানুকে সার্চ করল রানা। পকেটে প্রচুর টাকা পাওয়া গেল। পাসপোর্ট, আইডি ইত্যাদি সবই আছে। কিন্তু ফ্লপি ডিস্কটা নেই। মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। ডিস্কটা না পেলে কেউ ওরা বাঁচবে না। দানু এখানেই কোথাও লুকিয়ে রাখেনি তো? সার্চ করা দরকার। কোত্থেকে শুরু করবে ও?

মেগাডেথ প্রিভেনশন কমিটির পাঠানো সামরিক হেলিকপ্টার ট্রেনের মাথার ওপর চলে এসেছে। ট্রেন থেকে সঙ্কেত দিলেই একটা বাস্কেট সহ রশির মই নেমে আসবে, ফ্লপি ডিস্কটা ফেলে দিতে হবে তাতে।

স্টুয়ার্ড হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল। 'স্যার, মি. রানা, জেনারেল লাইনে রয়েছেন, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান!'

ব্যাগেজ কার থেকে বেরিয়ে এসে পোস্টাল কমিউনিকেশন কার-এর দিকে ছুটল রানা। প্রতিটি করিডরে প্রচণ্ড ভিড়, রীতিমত মারামারি করে এগোতে হচ্ছে ওকে। একজন কনডাকটার কাঁদতে কাঁদতে পিছু নিল, বলছে, 'স্যার, সেকেন্ড-ক্লাসের একটা কমপার্টমেন্টের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, ডাকাডাকি করেও কারও সাড়া পাইনি। স্পেয়ার কী দিয়ে তালা খুলেছি। ভেতরে বিশজন প্যাসেঞ্জার ছিলেন, সবাই বুড়ো মানুষ···স্যার, একজনও বেঁচে নেই। চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে মারা গেছে সবাই···'

রানার কান্না পাচ্ছে না। শোক, আতঙ্ক, বা রাগ, কোন অনুভূতিই নেই। শুধু একটা কর্তব্য বোধ ওকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। কাঁধে একটা হাত পড়ল, তাকিয়ে দেখে হাসান।

'মাসুদ ভাই, মিসেস ভৌমিক মারা গেছেন,' বলল সে। 'সন্দেশা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, আমি ওর কাছে যাচ্ছি। পিছনের ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

রেডিও-টেলিফোনে জেনারেল বললেন, 'আপনাদের জন্যে একটা সুখবর আছে, মি. রানা। আপনি শুধু যে-কোনভাবে ওদেরকে শান্ত রাখুন, তাহলেই সবাইকে বাঁচানো যাবে। আমি জানি প্যাসেঞ্জাররা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। আমার তরফ থেকে তাদেরকে আপনি আশ্বাস দিন, জেনেভাতে নয়, প্রতিষেধকটা আরও কাছাকাছি একটা শহরে তৈরি করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। জেনেভা থেকে ট্রেন এখন অনেক দূরে চলে গেছে, প্রতিষেধক তৈরি করার পর ট্রেনে পৌঁছে দিতে অনেক সময় লেগে যাবে। প্যারিসেই ল্যাব ফ্যাসিলিটি পেয়ে গেছি আমরা, সেখানেই প্রতিষেধক তৈরির কাজ পুরোদমে চলছে।'

'ফ্লপি ডিস্কটা দানুর কাছে পাওয়া যায়নি,' বাধা দিয়ে বলল রানা।

'হোয়াট!' জেনারেল যেন বিষম খেলেন। 'মি. রানা, তাকে আপনি ইন্টারোগেট করুন!'

'তার আগে আমার বোধহয় উচিত আপনাকে ইন্টারোগেট করা,' কর্কশ সুরে বলল রানা।

'মানে?' থতমত খেয়ে গেলেন জেনারেল।

'ফর্মুলা পেলেই যদি প্রতিষেধক তৈরি করা সম্ভব, সেটা আপনারা ফ্যাক্স করে আমেরিকা থেকে আনিয়ে নেননি কেন?' প্রশ্নটা দেরিতে হলেও মনে পড়েছে রানার।

পেন্টাগন থেকে যোগ্য লোককেই মেগাডেথ প্রিভেনশন কমিটির প্রধান করে পাঠানো হয়েছে, সন্দেহ নেই; জবাব দিতে এক মুহূর্তও দেরি করলেন না লী মার্শাল, 'এতক্ষণ তাহলে কি বললাম? প্যারিসে ল্যাব ফ্যাসিলিটি পেয়ে গেছি, সেখানেই প্রতিষেধক তৈরির কাজ চলছে। আপনাকে যখন দানুর কাছ থেকে ফ্লপি ডিস্ক উদ্ধার করতে বললাম, তার আগেই ফ্যাক্স করে আমেরিকা থেকে ফর্মুলাটা আনিয়ে নিয়েছি আমরা।'

'তাহলে সময় বেঁধে দিয়ে হেলিকপ্টার পাঠানোর নাটক করার কি দরকার ছিল?' রানা সন্দেহ-মুক্ত হতে পারছে না।

খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জেনারেল মার্শাল। 'আপনি একজন এসপিওনাজ এজেন্ট, মি. রানা। একমাত্র সুপার পাওয়ার যুক্তরাষ্ট্রের একটা ডিফেন্স প্রজেক্টে কত রকমের কনফিডেনশিয়াল ইনফরমেশন থাকতে পারে, আপনাকে তা ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। দানুর চুরি করা ফ্লপি ডিস্কটা আমরা চাইছি, তার কারণ ওটায় শুধু প্রতিষেধকের ফর্মুলা নয়, বি-টু-নেগেটিভ তৈরির ফর্মুলাও আছে। স্বভাবতই আমরা চাই না, বিশেষ করে ভাইরাস তৈরির ফর্মুলাটা অন্য কোন রাষ্ট্রের হাতে পড়ুক।'

যুক্তিটার মধ্যে সত্যতা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু রানা পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারছে না। 'আপনি তাহলে বলছেন প্রতিষেধক তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে? কতক্ষণ আগে শুরু হয়েছে? শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে?'

'কাজটা শুরু হয়েছে দু'ঘণ্টা আগে। শেষ হতে আরও দু'ঘণ্টা বা আড়াই ঘণ্টা লাগবে,' বললেন জেনারেল। 'ইতিমধ্যে আপনি আরও তল্লাশী চালান, খুঁজে বের করুন ফ্লপি ডিস্কটা।'

'সেটা পেলেই বা লাভ কি এখন?' রানার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। 'আপনিই তো বলেছেন নির্দিষ্ট একটা সময়ের পর ডিস্কটায় কিছুই থাকবে না, সব মুছে যাবে।'

হেসে ফেললেন জেনারেল। 'ওই যে বললাম, কনফিডেনশিয়াল ইনফরমেশন! মাফ করবেন, মি. রানা। বাধ্য হয়েই আপনাকে ভুল তথ্য দিয়েছিলাম, আপনি যাতে ডিস্কটা খোঁজার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। সত্যি আমি দুঃখিত, স্যার। দানুর চুরি করা ডিস্ক এখনও আমাদের দরকার। বিশ্বাস করুন, স্যার, ওটা দশ হাজার পারমাণবিক বোমার চেয়েও বিপজ্জনক।'

একজন জেনারেল ওকে 'স্যার স্যার' করছে, ব্যাপারটা রানার ভাল ঠেকল না। 'আচ্ছা, জেনারেল মার্শাল, একটা সত্যি কথা বলুন তো আমাকে। দানু আসলে কি চুরি করেছে? বি-টু-নেগেটিভের ফর্মুলা, নাকি এমথ্রীএক্স-এর ফর্মুলা?'

অপরপ্রান্তে বোবা হয়ে গেলেন জেনারেল।

'জেনারেল?' রানার গলা কঠিন ও কর্কশ।

জবাব না দিয়ে আরও কঠিন সুরে পাল্টা প্রশ্ন করলেন জেনারেল,

'এমথ্রীএক্স? এমথ্রীএক্স-এর কথা আপনি কিভাবে জানলেন?'

'কনফিডেনশিয়াল ইনফরমেশন!' বলল রানা। 'আমার প্রশ্নের জবাব দিন। ওটা কি এমথ্রীএক্স?'

'আমি অত্যন্ত নার্ভাস ও বিচলিত বোধ করছি, মি. রানা,' বললেন জেনারেল। 'এমথ্রীএক্স সম্পর্কে সারা দুনিয়ায় মাত্র বিশজন লোক জানে। আপনার তো কোনভাবেই তা জানার কথা নয়।'

'আমি এ-ও জানি যে এমথ্রীএক্স আপনারা তৈরি করেছেন ঠিকই, কিন্তু তার প্রতিশেধক তৈরি করতে পারেননি,' বলল রানা। 'এখনও সময় আছে, জেনারেল। দানু যদি এমথ্রীএক্সে সংক্রমিত হয়ে থাকে, কথাটা স্বীকার করুন—প্লীজ। কারণ আমি এমন একটা ল্যাবের কথাও জানি, যেখানে এমথ্রীএক্স-এর প্রতিষেধক তৈরি করা হয়েছে—প্রচুর পরিমাণে।'

মনে মনে তিক্ত হাসি হাসলেন জেনারেল, তাঁর ধারণা রানা প্রলাপ বকছে। যেখানে এমথ্রীএক্স-এর অস্তিত্ব সম্পর্কেই কারও কিছু জানার কথা নয়, সেখানে ওটার প্রতিষেধক তৈরির প্রশ্ন ওঠে কিভাবে? দ্রুত চিন্তা করে তিনি উপসংহারে পৌঁছুলেন—সিআইএ, পেন্টাগন, এমন কি হোয়াইট হাউসেও মাসুদ রানার বন্ধু আছে, তাদের কেউ নিজের অজান্তে তথ্যটা ফাঁস করে থাকতে পারে। একমাত্র এভাবেই তাঁর পক্ষে এই ভাইরাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা সম্ভব। কিন্তু প্রতিষেধকের কথা যেটা বলছেন, সেটা নির্জলা মিথ্যে। এখন যদি তিনি স্বীকার করেন দানু এমথ্রীএক্সে সংক্রমিত হয়েছে, মাসুদ রানা নিশ্চিত হয়ে যাবেন যে ভাইরাসটার সংক্রমণ ঠেকাবার জন্যে বারোশো যাত্রীকে তাঁরা হত্যা করার পরিকল্পনা করছেন।

'জেনারেল, প্লীজ!' জরুরী তাগাদার সুরে মিনতি জানাল রানা।

'ট্রেনটায় ন্যাটোর সবগুলো দেশের নাগরিক আছে,' জবাব দিলেন জেনারেল। 'শুধু আমেরিকানই আছে তিনশোর মত। আপনার মনে এই সন্দেহ কেন জাগবে যে আপনাদের সবাইকে আমরা মেরে ফেলতে চাইছি? আপনি যদি বলেন যে এমথ্রীএক্স-এর প্রতিষেধক আছে, কি কারণে আমরা সেটা ব্যবহার করতে চাইব না? না, মি. রানা, ইব্রাহিম দানু এমথ্রীএক্স ভাইরাসে আক্রান্ত হয়নি। সে বি-টু-নেগেটিভ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে, এবং দুই থেকে আড়াই ঘণ্টার মধ্যে বিলি করার জন্যে প্রতিষেধকও তৈরি হয়ে যাবে।'

রানা বলল, 'আমি আবার বলছি, এমথ্রীএক্স-এর প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে।'

'হলে ভাল কথা। এ-ব্যাপারে পরে আপনার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। কিন্তু আমাদের এখনকার সমস্যা ভিন্ন। ডিস্কটা যদি ট্রেনে থাকে, ওটা আপনি খুঁজে বের করুন, প্লীজ। ভাল কথা, মার্কিন সরকার একটা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, অবশ্যই আমার মাধ্যমে—ডিস্কটা যে খুঁজে দিতে পারবে তাকে বিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেয়া হবে, কোন ট্যাক্স কাটা হবে না।'

'মৃত একজন মানুষ বিশ বিলিয়ন ডলার পেলেই বা কি লাভ, জেনারেল?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি, আমিও সংক্রমিত হয়েছি।

এরইমধ্যে মারা গেছে অন্তত ত্রিশজন। সংক্রমিত হয়েছে তিনশো বা তারও বেশি। রোগটা দ্রুত ছড়াচ্ছে। জেনারেল, এখনও সময় আছে...'

'ওহ্ গড! আপনিও সংক্রমিত হয়েছেন?'

রানা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, 'আপনাদের কমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটির রেঞ্জ কতটুকু? আপনারা আমাকে হোয়াইট হাউসের লাইন পাইয়ে দিতে পারেন?'

'দুঃখিত, মি. রানা, এখান থেকে তা সম্ভব নয়।' যোগাযোগ হঠাৎ করেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সম্ভবত যান্ত্রিক কোন ত্রুটিই দায়ী।

পাঁচ

অকস্মাৎ দীর্ঘ একটা টানেলে ঢোকায় গোটা ট্রেন অন্ধকার হয়ে গেল।

একটু পরই অবশ্য সার্ভিস লাইট জ্বলে উঠল। প্রিস্টের কমপার্টমেন্টে প্রায় সবাই ঝিমাচ্ছে। সে দরদর করে ঘামছে, কান পেতে শুনছে করিডর থেকে ভেসে আসা প্যাসেঞ্জারদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। এরইমধ্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, প্যারিসেও ট্রেন থামবে না।

'এর কোন মানে হয় না! প্যারিসে আমার জরুরী মীটিং আছে!'

'আসলে ঘটছেটা কি?'

'শান্ত হন, শান্ত হন...'

মাথার ওপর র‍্যাক থেকে নিজের সুটকেসটা নামাচ্ছে প্রিস্ট, আলখেল্লার ঢোলা আস্তিন কনুইয়ের ওপরে সরে এল। তার পেশীবহুল বাহুতে উলকি আঁকা-নগ্ন এক নারী। হঠাৎ ব্যাপারটা খেয়াল করল সে, তাড়াতাড়ি র‍্যাক থেকে হাতটা নামিয়ে দ্রুত চারদিকে চোখ বোলাল। একা শুধু ডোনা তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, আর কেউ জেগে নেই। চোখাচোখি হতে মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল মেয়েটা, তারপর ঘুমের ভান করে চোখ বুজল।

চোখ বুজেই বিড়বিড় করছে ক্রাইচেক, 'ব্যাসেল হোক বা প্যারিস, কি আসে যায়।'

'কি আসে যায় মানে? ব্যাসেলে আমার জরুরী কাজ ছিল,' চোখ খুলে ফোঁস করে উঠল ফগেল।

'শেক্সপীয়ার একবার বলেছিলেন, অল দা ওয়ার্ল্ড ইজ অ্যান অয়স্টার,' বলল ক্রাইচেক। 'মানে দুনিয়াটা ঝিনুক।' এক মুহূর্ত পর আবার বলল, 'তবে যদি আমার অভিমত জানতে চাও, দোস্ত, ওটার বাইরে থাকার চেয়ে ভেতরে থাকাই ভাল।'

ক্রাইচেকের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ফগেল। 'তোমার পেশা কি শুধু ট্যুরিস্টদের কাছে ঘড়ি বিক্রি করা?' জানতে চাইল সে।

'বিক্রি হয় এমন সব জিনিসই আমি বিক্রি করি,' বলল ক্রাইচেক, তার বিষণ্ণ ও নির্লিপ্ত চোখ আধবোজা। 'এমন কি মৃত মানুষদের আত্মার জন্যে প্রার্থনাও করি

আমি–স্ত্রী নিয়ে।' চোখ বুজল সে, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

আরও তিনজন ডাক্তারকে পাওয়া গেল। সবাইকে নিয়ে কমিউনিকেশন কারে মীটিঙে বসল রানা। কনডাকটার আর স্টুয়ার্ডরাও থাকল, তবে শুধু মীটিঙের প্রথম পর্যায়ে। সন্দেশা, হাসান, ভেনাসের বয়ফ্রেন্ড নেলসন আর সুইডিশ আমেরিকান স্টুডেন্টদের কয়েকজনকেও ডাকা হলো। আরও ডাকা হলো আমেরিকান সৈনিকদের পুরো দলটাকে, যদিও তারা কেউ সশস্ত্র নয়–ছুটি কাটাতে স্টকহোম যাচ্ছে।

রানার অনুরোধে প্রথমে বক্তব্য রাখলেন জার্মান ডাক্তার মুলার। কি বলতে হবে আগেই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছে রানা। তিনি সংক্ষেপে জানালেন, প্যাসেঞ্জারদের বোঝাতে হবে ছোঁয়াচে একটা ফ্লু গোটা ট্রেনে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ছড়াবার গতি ঠেকাবার একমাত্র উপায় হলো মেলামেশা না করা অর্থাৎ যতটা সম্ভব ছোঁয়াছুঁয়ি এড়িয়ে থাকা। এক ধরনের কারফিউ জারি করার পরামর্শ দিলেন তিনি, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কমপার্টমেন্ট থেকে কেউ যেন বাইরে না বেরোয়। আশ্বাস দিলেন, এই 'ফ্লু'-র প্রতিষেধক আছে, এরইমধ্যে সেটা ট্রেনে আনার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সবশেষে বললেন 'কিছু' মানুষ মারা গেছে ঠিকই, কিন্তু তার জন্যে এই ফ্লু দায়ী কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। ফুড পয়জনিংও দায়ী হতে পারে। কনডাকটার আর স্টুয়ার্ডদের পরামর্শ দেয়া হলো, অন্তত দুটো কমপার্টমেন্ট খালি করে লাশ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। লাশ স্থানান্তরের কাজটা তদারক করবেন দু'জন ডাক্তার।

কনডাকটার আর স্টুয়ার্ডরা চলে যাবার পর রানা বক্তব্য রাখল। প্রথমেই ব্যাখ্যা করল, প্যাসেঞ্জারদের কাউকে কেন ট্রেন থেকে নামতে দেয়া যাবে না। মার্কিন সৈনিকরা সব মিলিয়ে বাইশজন, তাদেরকে করিডর পাহারা দেয়ার দায়িত্ব নিতে বলল ও, একটা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য হিসেবে কাজ করবে। তাদের একজন মুখপাত্র উত্তরে বলল, পাহারা দিতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু সঙ্গে অস্ত্র না থাকায় আতঙ্কিত প্যাসেঞ্জাররা খেপে উঠলে কিছুই তাদের করার থাকবে না।

কথাটায় যুক্তি আছে। সে থামতে চেলসি বলল, 'ট্রেনের পিছনে নতুন যে কারটা জোড়া লাগানো হয়েছে তাতে সশস্ত্র সিকিউরিটি আছে, তাদেরকে ডাকা হোক।'

চেলসিকে নিয়ে ট্রেনের পিছন দিকে চলে এল রানা। জানালা দিয়ে বাইরে মুখ বের করে সিকিউরিটি পুলিসদের ডাকা হলো। একজন সার্জেন্টের সঙ্গে কথা বলল রানা। ওর প্রস্তাব শুনে কর্কশ সুরে সে জানাল, 'আমাদের ওপর নির্দেশ আছে সিকিউরিটি কার থেকে মূল ট্রেনের কোন কারে যাওয়া চলবে না।'

রানা জানতে চাইল, 'তাহলে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে কেন?'

সার্জেন্টের পরিষ্কার জবাব, 'সিকিউরিটি কার থেকে আমরা ট্রেনের দু'পাশে লক্ষ রাখছি, আমাদের ওপর নির্দেশ আছে ট্রেন থেকে কাউকে নামতে দেখলেই গুলি করে ফেলে দিতে হবে।'

'এই নির্দেশ কে দিয়েছে তোমাদের?'

'জেনারেল লী মার্শাল, মেগাডেথ প্রিভেনশন কমিটির চেয়ারম্যান।'

হতাশ হয়ে ফিরে এল ওরা। পরিস্থিতি যে কতটা ভয়াবহ, মীটিঙে উপস্থিত সবাইকে তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হলো না। তবে রানার সঙ্গে সবাই একমত হলো, সাধারণ প্যাসেঞ্জারদের শান্ত রাখার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছুই করতে হবে। কোনভাবেই তাদেরকে আতঙ্কিত বা উন্মত্ত হতে দেয়া যাবে না। স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা বাড়াতে বলল রানা, বুদ্ধি দিল যে-সব প্যাসেঞ্জারের কাছে ব্যক্তিগত ফায়ার আর্মস আছে সেগুলো কৌশলে হাতিয়ে নিতে হবে।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা মায়ের মৃত্যুশোক ম্লান করে দিয়েছে, হাসানকে নিয়ে করিডরে পাহারা দিতে রাজি হয়ে গেল সন্দেশা। স্টুয়ার্ড টাওয়েলকে নিয়ে হাসান ফিরে এল মীটিঙে, তারা জানাল দু'জন ডাক্তার লাশ স্থানান্তর করার কাজ তদারক করছেন। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত মারা গেছে পঞ্চাশ জন। ক'জন সংক্রমিত হয়েছে বলা কঠিন, তবে পাঁচশোর কম হবে না।

রানার কানে ফিসফিস করল চেলসি, 'আমার জিভও ফুলছে!'

হাসান বলল, 'অভিনেত্রী ভেনাস ডেভনপোর্টের কুকুর অ্যাটমও মারা গেছে। ওটাকেও লাশগুলোর সঙ্গে একটা কমপার্টমেন্টে রাখা হয়েছে।'

একজন কনডাকটার ছুটে এসে খবর দিল, 'স্যার, মি. রানা, রেডিও-টেলিফোনের যান্ত্রিক ত্রুটি সেরে গেছে, জেনারেল মার্শাল আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'ভাইরাসের সায়েন্টিফিক নাম—প্যাস্টারেলা পেসটিস ব্যাসিলাই,' বললেন জেনারেল। 'একটা ভাইরাস দু'ঘণ্টায় এক মিলিয়ন ভাইরাসের জন্ম দেয়। চার ঘণ্টায় তৈরি হয় এক মিলিয়ন ভাইরাস কলোনি। এভাবে শুধু বাড়তেই থাকে...'

পাশে চেলসি, রানা জানতে চাইল, 'একজন মানুষকে মেরে ফেলতে কত ভাইরাস দরকার?'

'এর উত্তর দেয়া সম্ভব নয়, দুঃখিত,' বললেন জেনারেল। 'দু'ঘণ্টায় দশ লাখ ভাইরাস তৈরি হয়, হিসাব করে দেখুন দশ সেকেন্ডে ক'টা ভাইরাস তৈরি হবে। এ-কথা এ-জন্য বলছি যে পরীক্ষায় দেখা গেছে সংক্রমিত একজন মানুষ দশ সেকেন্ডের মধ্যেও মারা যেতে পারে। তবে আটচল্লিশ ঘণ্টা বেঁচে থাকার রেকর্ডও আছে।'

'প্রতিষেধক তৈরির কাজ কত দূর এগোল?' জানতে চাইল রানা। 'পরিমাণ সম্পর্কেও বলুন আমাকে। ধরুন দুর্ঘটনাবশত ট্রেনের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল ভাইরাসটা, তখন কি হবে?'

'দ্রুত কাজ চলছে, মি. রানা,' আশ্বাস দিলেন জেনারেল। 'কেউ এখানে আমরা বসে নেই। তৈরিও হচ্ছে কয়েকটা ল্যাবে, প্রচুর। কিন্তু প্রতিষেধক তৈরি হবার আগে আরও কাজ শেষ করতে হবে আমাদের। আর সেজন্যে আপনার পূর্ণ সহযোগিতা চাই।'

'বলুন কি করতে হবে আমাকে।'

‘প্রথম কাজ,’ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন জেনারেল, ‘ট্রেনটাকে আমরা সীল করে দেব।’

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল রানা, ‘জেনারেল, ট্রেন সীল করা আর যাত্রীদের নিয়তি সীল করা একই কথা। ট্রেনের পরিবেশ এমনিতেই দূষিত হয়ে পড়েছে। সাধারণ একটা ফ্লু এখানে সবাইকে মেরে ফেলতে পারে। আমি সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছি সবার প্রাণ বাঁচানোর শর্তে।’

রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে চেলসি। জীবন-মৃত্যু নিয়ে এক হাজার নাটক চাক্ষুষ করেছে সে, সে-সব নাটকে বহুবার তার নিজের জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। তার জীবনে এমন এক অবিশ্বাস্য পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে, যে কিনা নিজে সংক্রমিত হওয়া সত্ত্বেও একবারও নিজের কথা ভাবছে না, এমনকি শুধু বারোশো ট্রেন যাত্রীর কথাও ভাবছে না, প্রতিটি মহাদেশের সমস্ত মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করছে।

‘আপনি বলছেন দশ সেকেন্ড থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু অবধারিত,’ বলল রানা। ‘এর অর্থ হলো, প্রতিষেধক পেতে যত দেরি হবে তত বেশি লোক মারা যাব আমরা। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এমন একটা পরিস্থিতি যে-কোন মুহূর্তে সৃষ্টি হবে যখন আমরা প্যাসেঞ্জারকে সামলে রাখতে পারব না, তারা দরজা-জানালা ভেঙে বাইরে লাফিয়ে পড়বে--আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টায়। ভেবে দেখেছেন, তখন কি হবে?’

‘তখন এক বিলিয়ন মানুষ মারা যাবে,’ বললেন জেনারেল। ‘শুধু ইউরোপেই। সেজন্যেই তো বলছি, প্রথম কাজ ট্রেনটাকে সীল করে দেয়া।’

‘এর মানে হলো নিজেদের প্রাণ আপনাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছি আমরা,’ অসহায় রাগে চিৎকার করছে রানা। ‘আপনারা ট্রেন থামিয়ে আমাদের সবাইকে কোয়ারানটিনে পাঠাচ্ছেন না কেন?’

‘তাই তো পাঠাব, গন্তব্যে পৌঁছানোর পর।’

‘আমাকে বলবেন, আমাদেরকে কোন জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?’

পাশে দাঁড়ানো পাফ এরিকসনের দিকে দ্রুত একবার তাকালেন জেনারেল। পাফ নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন। ‘আপনাকে যথাসময়ে ইনফর্ম করা হবে, কথা দিচ্ছি, মি. রানা। আবার বলছি, চিন্তার কোন কারণ নেই। যারা মারা গেছে তাদের জন্যে সত্যি আমরা দুঃখিত। হয়তো আরও কিছু লোককে আমরা বাঁচাতে পারব না। কিন্তু, ভেবে দেখুন, আপনার সহযোগিতা না পেলে এক বিলিয়ন মানুষকে নির্ঘাত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হবে। আমরা এ-ও জানি যে বারোশো লোককে সামলে রাখা সহজ কাজ নয়...’

রানার চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল। ‘মিলিয়ন-বিলিয়ন নিয়ে সমস্যা আগে দেখা দিক, তখন তাদের কথা ভাবা যাবে,’ কঠিন সুরে বলল ও। ‘এই মুহূর্তে আমি ট্রেন যাত্রীদের নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই। এদের নিরাপত্তার জন্যে যা কিছু করার আছে আমি করব। কিন্তু, জেনারেল, এ যাত্রায় আমি যদি বেঁচে যাই, প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের জন্যে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।’

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা।

ফার্স্ট-ক্লাস কার-এর করিডরে বেরিয়ে এসে দরজার গায়ে ফিট করা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ প্রিস্ট। চারদিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল আশপাশে কেউ নেই। চোখে-মুখে সন্ত্রস্ত ভাব, হাতের ছোট সুটকেসটার দিকে একবার তাকাল। জানালার কাঁচ ও নেট লাগানো ফ্রেম নিচু করে মাথা গলাল, ট্রেনের সামনের দিকটা দেখছে।

বাইরে আলো কমে আসছে, একটু পরই রাত নামবে। উত্তর ফ্রান্সের মাউবিউজে স্টেশনে পৌঁছুতে যাচ্ছে ট্রেন। স্টেশনের একদিকে প্ল্যাটফর্ম, সেটা প্রায় খালিই বলা চলে–মাত্র দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে ট্র্যান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেসের জন্য। তাদের মধ্যে একজনের চোখে সানগ্লাস, অপরজনের পরনে ধর্মযাজকের ঢোলা পোশাক।

প্ল্যাটফর্মে চারজন সশস্ত্র পুলিস এল, নিজেদের মধ্যে সমান দূরত্ব বজায় রেখে পজিশন নিল তারা। বাকি দু'জন লোক সতর্ক দৃষ্টি বিনিময় করল। বাতাসে হিম ভাব, নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাষ্প বেরুচ্ছে। ট্রেন আসার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, তবে এখনও দেখা যাচ্ছে না।

হুইসেলের আওয়াজ ভেসে এল, লাইন পরিষ্কার রাখার নির্দেশ। পুলিস চারজন প্রায় একযোগে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল। অদূরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, লোক দু'জন সেদিকে পিছাতে শুরু করল।

অবশেষে দেখা গেল ট্রেনটাকে। তীরবেগে প্ল্যাটফর্মকে ছাড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, বিরতিহীন হুইসেল বাজিয়ে। গাড়ির কাছে পিছিয়ে যাওয়া লোক দু'জন হঠাৎ ট্রেনের জানালা দিয়ে মুখ বের করে থাকা প্রিস্টকে দেখতে পেল, আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ।

পুলিসরাও তাকে দেখল। হাত নেড়ে সঙ্কেত দিল, মাথা ভেতরে ঢোকাও। চিৎকার করে কিছু বলল প্রিস্ট, অসহায় ভঙ্গি করে হাতও নাড়ল। 'ট্রেন কোথাও থামছে না!'

লোক দু'জন পরস্পরের দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল। হোলস্টারে পিস্তল গুঁজে প্ল্যাটফর্ম ত্যাগ করল পুলিসরা।

'চিন্তা করো না,' সানগ্লাস পরা লোকটা আশ্বাস দিল সঙ্গীকে। 'এই কাজে ওর অভিজ্ঞতা আছে। কোথাও না কোথাও নিরাপদেই নেমে পড়বে।'

টয়লেটে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল প্রিস্ট। দরদর করে ঘামছে সে। আলখেল্লার সামনের অংশ খুলে ভেতরে তাকাল। কোমরে কয়েকটা পলিথিনের প্যাকেট গোঁজা রয়েছে, ভেতরে সাদা পাউডার। সারা শরীরে পাঁচ কিলো হেরোইন বহন করছে সে, বাংলাদেশী টাকায় দাম হবে সাত কোটি টাকার বেশি তো কম নয়। একটা পলিথিনের মুখ খুলে এক চিমটি বের করল, নাকের কাছে তুলে সজোরে শ্বাস নিল, চোখ বুজে থাকল দু'সেকেন্ড। তারপর সুটকেস খুলে একটা ওয়েবল ·৪৫ অটোমেটিক বের করল, গুঁজে রাখল আলখেল্লার ভেতর বেল্টে।

রাত নেমেছে। রেললাইনের পাশের আলোগুলো রকেটের বেগে পিছিয়ে যাচ্ছে। নিজের কমপার্টমেন্টের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে রানা, চোখে

সানগ্লাস, কপালে চিন্তার রেখা। কামরার আরেক প্রান্তে বসে রয়েছে চেলসি, কোলের ওপর খোলা একটা ক্যামেরা, ভেতরে ফিল্ম ভরছে।

প্রথম দফা মৃত্যু হানা দিয়েছিল প্রবল এক ঢেউয়ের মত, ষাটজনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সংক্রমণ থেমে থাকেনি, আরও দ্রুত ছড়িয়েছে, কিন্তু মৃত্যুর হার কমে গেছে। কারণটা আবিষ্কার করতে গবেষণা করতে হয়নি—ওই ষাটজনের রোগ-প্রতিরোধশক্তি ছিল খুবই কম, তারই মাসুল দিতে হয়েছে। তবে এই তথ্যে উৎফুল্ল হবার মত কিছু নেই। আকস্মিক মৃত্যুর দ্বিতীয় ঢেউটা যে-কোন মুহূর্তে আঘাত হানবে। আঘাতগুলো একের পর এক আসতেই থাকবে। সময়সীমা দশ সেকেন্ড থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টা—কখন কে মারা যাবে কেউ বলতে পারে না। তবে একটা সময় আসবেই, যখন একজনও ওরা বেঁচে থাকবে না।

যদি না প্রতিষেধক পাওয়া যায়।

হেড কনডাকটার রানার নির্দেশে প্যাসেঞ্জারদেরকে কয়েকটা অনুরোধ করেছে—বিশেষ প্রয়োজন না হলে কমপার্টমেন্ট বা কার থেকে কেউ বেরুবেন না; প্রতিটি কমপার্টমেন্টে খাবার পৌঁছে দেবে স্টুয়ার্ডরা, ডাইনিং কারে ভিড় করার দরকার নেই; ডাক্তারদের একটা গ্রুপ ট্রেনে টহল দিচ্ছেন, কেউ অসুস্থ বোধ করলে স্টুয়ার্ড বা কনডাকটারকে জানালেই হবে, সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যাবেন তাঁরা। আগেই ঘোষণা করা হয়েছে, বিশেষ ধরনের একটা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে ট্রেনে, তবে তাতে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই, সবাই যাতে চিকিৎসা পায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

প্যাসেঞ্জারদের জানানো হয়নি কতজন মারা গেছে। আর মৃত্যুর হার হঠাৎ কমে যাওয়ায় পরিবেশে খানিকটা শান্ত ভাবও ফিরে এসেছে। তবে গোটা ট্রেন থেকেই মাঝে মধ্যে কান্না, বিলাপ আর আকস্মিক শোরগোলের আওয়াজ ভেসে আসছে। সন্তানকে হারিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদছে মায়েরা, মা-বাবার মৃত্যু দেখে সন্তানরা ফোঁপাচ্ছে।

খানিক পর আবার লাউডস্পীকার জ্যান্ত হয়ে উঠল। কনডাকটার জানাল, রাতে কোথাও থামছে না ট্রেন, থামবে একেবারে সেই কোপেনহেগেনে পৌঁছে—পরদিন দুপুর দুটো পনেরোয়। সেই সঙ্গে আশ্বাস দিয়ে এ-ও বলা হলো যে তার আগেই হেলিকপ্টার যোগে ট্রেনে পৌঁছে যাবে 'ফ্লু'-র প্রতিষেধক।

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা ভাঙল চেলসি, 'আমরা তাহলে সত্যি মারা যাচ্ছি?'

রানা জবাব দিল না।

'আপনি সাধারণ কোন মানুষ নন,' বিড়বিড় করল চেলসি, ভাবেনি রানা শুনতে পাবে।

ক্ষীণ, তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'যেহেতু আপনার মুখ থেকে শুনছি, প্রশংসা বলেই ধরে নেব।'

'প্রশংসা আর ফুল একই জিনিস। কিন্তু শীতকালে খুব একটা পাওয়া যায় না।'

খানিকটা আড়ষ্ট সুরে বায়রনের একটা পঙক্তি আওড়াল রানা, 'শীত বসন্তের জননী।'

কে বলেছে জানে না, হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় চেলসি বলল, 'শীতের এক মাইলকে দু'মাইলের মত লাগে। কিছু কিছু হৃদয় এতটা ধকল সহ্য করতে পারে না। এপ্রিল পর্যন্ত টেকে না।'

'হৃদয় মেরামত করা যায়। দু'একটা আমি নিজেই মেরামত করেছি।'

'ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেলে সেটাকে আর জোড়া লাগাবেন কিভাবে!'

কিছুক্ষণ আর কোন কথা হলো না। নিস্তব্ধতা ভাঙল রানাই। 'ভয় পাচ্ছেন?'

'পাওয়াই কি স্বাভাবিক নয়? অথচ পাচ্ছি না। কারণটা...থাক, বললে আপনি হাসবেন।'

'মানুষের গভীর অনুভূতি নিয়ে সুস্থ কোন মানুষ হাসে না।'

'কেন ভয় পাচ্ছি না ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি,' বলল চেলসি। 'অনেক চিন্তা করে বের করেছি, আপনাকে দেখে এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটছে।'

তিক্ত হাসিটা আবার ফিরে এল ঠোঁটে, রানা বলল, 'কিন্তু কাউকে বাঁচাবার সাধ্য আমার নেই, এমনকি নিজেকেও নয়।' হাতটা বাড়িয়ে দিল। 'এখনও কিন্তু আমাদের পরিচয় হয়নি—আমি মাসুদ রানা।'

'অথচ তারপরও আপনি পুরোপুরি শান্ত। অথচ তারপরও আপনি সবার জন্যে সারাক্ষণ চিন্তা করছেন।' রানার বাড়ানো হাতটা ধরল চেলসি। 'আমি চেলসি মেয়র।'

হাত দুটো এক হয়ে থাকল। চেলসির চোখ রানার চোখ দুটোকে খুঁজে নিল। চুপচাপ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। অনেকক্ষণ পর চেলসি শুধু বলল, 'আপনাকে দেখে আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে।'

রানা উপলব্ধি করল, ওর বলার কিছু নেই।

মাঝরাত।

চুল আঁচড়ে শোয়ার প্রস্তুতি নিল চেলসি। তারপর বিছানায় শুয়ে অধীর অপেক্ষায় থাকল। আধ ঘণ্টা এ-পাশ ও-পাশ করে কাটাল, দরজায় নক হচ্ছে না। বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল সে, কান পাতল পাশের কমপার্টমেন্টের দেয়ালে। কোন শব্দ নেই। দুই কমপার্টমেন্টের মাঝখানের দরজার সামনে দাঁড়াল সে, হাত তুলল নক করার জন্যে। ব্যক্তিত্ব, লজ্জা, ভব্যতাবোধ, সব একসঙ্গে এসে বাধা হয়ে দাঁড়াল—ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ল বিছানায়। তীব্রগতি ট্রেনের যান্ত্রিক গর্জনকে ছাপিয়ে মাঝে মধ্যে ভেসে আসছে শোকাকুল কোন নারী বা পুরুষের হাহাকার—প্রিয়জনকে হারাবার ব্যথা সহ্য করতে পারছে না।

একটা ডায়েরীতে কলম চালাচ্ছে রানা, ট্রেনে ওঠার পর যা যা ঘটেছে সব লিখে রাখছে। একটানা এক ঘণ্টা লেখার পর হঠাৎ থেমে গেল হাত। কান পাতল। চেয়ার ছেড়ে চলে এল পাশের কমপার্টমেন্টের দরজার কাছে, কবাটে কান ঠেকাল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মাথা নাড়ল আপনমনে। ফিরে এসে আবার বসল টেবিলে, মন দিল লেখায়। মানুষের হাহাকার ও বিলাপধ্বনি অস্পষ্টভাবে কানে আসছে, তাদের শোক স্পর্শ করছে ওকে, থেকে থেকে মোচড় দিয়ে উঠছে বুকটা, কিন্তু নিজেকে কাঁদতে দিচ্ছে না।

আরও বিশ মিনিট পর বিছানা ছেড়ে আবার নামল চেলসি। এবার কোন রকম ইতস্তত না করে দরজায় নক করল সে। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে যাওয়ায় রীতিমত চমকে উঠল। কোন কথা হলো না, পরস্পরকে শক্ত আলিঙ্গনে বাঁধল ওরা। কান্নার দমকে চেলসির সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে।

ভোর চারটের দিকে মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির সব সদস্যকে ঘুম থেকে জাগানো হলো। পাফ এরিকসনের পিছু নিয়ে কমান্ড সেন্টারে ঢুকলেন সবাই।

লিখিত একটা রিপোর্ট পড়ে সবাইকে শোনালেন জেনারেল লী মার্শাল। 'এমথ্রীএক্স-এর প্রতিষেধক আছে, মি. মাসুদ রানার এই দাবি আমরা হালকাভাবে নিইনি। এ-ব্যাপারে ন্যাটোর অ্যান্টিডোট রিসার্চ সেন্টারের প্রধান বিজ্ঞানী জিম পোলাক হোয়াইটহেডকে প্রশ্ন করি আমরা। তিক্ত হেসে তিনি মন্তব্য করেছেন, মাসুদ রানা প্রলাপ বকছেন। তারপরও আমরা গত কয়েক ঘণ্টা ধরে খোঁজ-খবর নিয়েছি।

'অনুসন্ধানে যে তথ্য পাওয়া গেছে এখানে সংক্ষেপে তার উল্লেখ আছে। হু-র অঙ্গপ্রতিষ্ঠান "রেমিডি" নামে একটা রিসার্চ ল্যাব আছে জেনেভায়। এ-ব্যাপারে সরাসরি জাতিসংঘের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। দায়িত্ববান একাধিক কর্মকর্তা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে "রেমিডি"-র মূল কাজ প্রচলিত কেমিকেল ও বায়োলজিক্যাল উইপনের প্রতিষেধক তৈরি করা, কোন রকম ভাইরাস তৈরি করা "রেমিডি"-র কর্মসূচীর মধ্যে পড়ে না। তারপরও ড. নাসিমুল গনি যদি এমথ্রীএক্স বা তার প্রতিষেধক নিয়ে গবেষণা করে থাকেন, সেটা নেহাতই ব্যক্তিগত পর্যায়ে গোপনে করে থাকতে পারেন। সবশেষে তাঁরা প্রায় সবাই আনঅফিশিয়ালি মন্তব্য করেন যে ড. নাসিমুল গনি পাগলাটে টাইপের মানুষ, তাঁর দাবি বিশ্বাসযোগ্য হবার সম্ভাবনা কম...'

রিপোর্টের মাঝখানে বাধা পেলেন জেনারেল। ফ্রেঞ্চ প্রতিনিধি প্রায় চিৎকার করে জানতে চাইলেন, 'এত ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি ড. নাসিমুল গনির সঙ্গে যোগাযোগ করলেই তো হয়। ভদ্রলোক যদি সত্যি সত্যি প্রতিষেধক আবিষ্কার করে থাকেন, ট্রেনে যারা এখনও বেঁচে আছে তাদেরকে...'

'দুঃখিত, স্যার,' বললেন জেনারেল। 'যোগাযোগ করা হয়েছে। কিন্তু রেমিডি-র ল্যাব বা বাসায় ড. নাসিমুল গনিকে পাওয়া যায়নি। রাত দশটার দিকে তিনি কোথায় যেন গেছেন, কাউকে কিছু বলে যাননি রেমিডি-র অন্যান্য বিজ্ঞানীদের প্রশ্ন করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে তাঁরা কোন মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।'

কমান্ড সেন্টারে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

'এবার আরও একটা দুঃসংবাদ।' জেনারেলের ইঙ্গিতে ম্যাপ আলোকিত হয়ে উঠল। 'পোল্যান্ড, জেন্টেলমেন। একমাত্র পোল্যান্ড সরকারই ট্রেনটাকে তাদের দেশে থামাবার অনুমতি দিয়েছে–কিসের বিনিময়ে, সেটা উহ্যই থাক।' পয়েন্টার দিয়ে ম্যাপের এক জায়গায় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। 'জায়গাটাকে মরুভূমিই বলতে পারেন। শুধু একটা রেলপথ ছাড়া সভ্যতার অন্য কোন নিদর্শন চোখে পড়ে

না। ওখানে কয়েকটা বিল্ডিঙ আছে, নাৎসীদের পরিত্যক্ত কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। ট্রেনের প্যাসেঞ্জারদের বলা হবে ওখানে কোয়ারানটিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, প্রতিষেধকের সাহায্যে সবার চিকিৎসা করা হবে। বলাই বাহুল্য, আসলে তা সত্যি নয়।'

'পরিষ্কার করে বলুন কি বলতে চান!'

'ন্যাটোর সবগুলো রাষ্ট্রের প্রধানরা স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে,' বললেন জেনারেল। 'সহজ ভাষায়, সীমান্ত পেরিয়ে পোল্যান্ডে ঠিকই ঢুকবে ট্রেন, কিন্তু কনসেনট্রেশন ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছুবে না।'

'কেন?' কেউ একজন অবাক হয়ে জানতে চাইলেন।

'তার আগে এমথ্রীএক্স-এর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যাখ্যা করা দরকার,' বললেন জেনারেল। 'আপনারা জানেন, এমথ্রীএক্স শুধু স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে ছড়ায়। ওগুলোকে মারার একটাই উপায় এখন পর্যন্ত জানি আমরা—আগুনে পোড়ানো। কিন্তু বারোশো যাত্রীকে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত কেউ আমরা সমর্থন করতে পারি না। এখানেই এসে পড়ে ভাইরাসটার আরেকটা বৈশিষ্ট্যের কথা। শূন্য তাপমাত্রার পঞ্চাশ ডিগ্রী নিচে রাখা হলে এমথ্রীএক্স মারা যায় না, নির্জীব হয়ে থাকে, এ তো আমরা জানিই। সবাই যেটা জানি না তা হলো, পানিতেও এই ভাইরাস নির্জীব হয়ে পড়ে।'

'তো?' উত্তেজনায় কেঁপে গেল গলাটা, ঘাড় ফিরিয়ে কেউ তাকিয়েও দেখল না কে করল প্রশ্নটা।

'পোল্যান্ড সীমান্ত অতিক্রম করার পর একটা ব্রিজ পড়বে—পোলিশ নামটা আমার জন্যে উচ্চারণ করা কঠিন, তবে অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—সিনিস্টার ক্রসিং। এঞ্জিনিয়ারদের পাঠানো হচ্ছে ওখানে, তারা ব্রিজের নাট-বল্টু খুলে রাখবে...'

রাতে গোটা বেলজিয়াম আর নেদারল্যান্ডের বেশিরভাগ এলাকা পার হয়ে এসেছে ট্রেন, এখনও অনুসরণ করছে রেগুলার কোর্স—যে কোর্স কোপেনহেগেন হয়ে স্টকহোমে পৌঁছুবার কথা বোট ট্রেনের মাধ্যমে। রাত সাড়ে তিনটের দিকে পোল্যান্ড সরকারের অনুমতি পাওয়া গেছে। দক্ষিণ-পূর্ব পোল্যান্ডের 'জানাও' স্টেশনের কাছাকাছি কোয়ারানটিন সাইট তৈরি করা যাবে। জেনারেল লী মার্শাল জানেন ট্রেনটা ওখানে পৌঁছুবে না, তাসত্ত্বেও কোয়ারানটিন ফ্যাসিলিটি সাপ্লাই দেয়ার ব্যাপক তোড়জোড় শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ব্যাপারটা স্রেফ লোক-দেখানো, এতে ন্যাটোভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সমর্থনও আছে। সিনিস্টার ক্রসিং পেরুতে পারবে না ট্রেন, ক্রসিং ভেঙে পানিতে পড়ে যাবে। গোটা ব্যাপারটাকে এমনভাবে সাজানো হচ্ছে যাতে মনে হবে প্যাসেঞ্জারদের কোয়ারানটিনেই পাঠানো হচ্ছিল, কিন্তু দুর্ঘটনাবশত ব্রিজ ভেঙে ট্রেনটা নিচে পড়ে যাওয়ায় তা সম্ভব হয়নি।

রেগুলার কোর্স ত্যাগ করে ঘুরে গেল ট্রেন। ঘড়িতে তখন তিনটে বেজে

ঊনষাট মিনিট। ট্রেন পথ পরিবর্তন করল নেদারল্যান্ডে থাকার সময়। সীলিং অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে জার্মানীতে থাকা মার্কিন সৈন্যদের, প্রোটেকটিভ সুট সহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য ইকুইপমেন্ট সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে তারা। সীলিং পয়েন্ট বাছাই করা হয়েছে ডাচ-জার্মান সীমান্তে—ওটা রুর উপত্যকায়, ক্লিভ স্টেশনের কাছাকাছি। ধু-ধু প্রান্তর, সীমান্তের জার্মান দিকটায় পড়েছে।

ভোরের আলো তখনও ভাল করে ফোটেনি, ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ল। সীল করার এটাই আদর্শ সময়, প্যাসেঞ্জাররা যখন ঘুমিয়ে আছে। আকাশে মেঘ নেই। আশপাশের গাছপালা থেকে শুধু পাখিরা ডাকাডাকি করছে। তারপর শোনা গেল হেভী ট্রাক কনভয়ের গম্ভীর আওয়াজ। কিছু ট্রাকে সামরিক প্রতীক চিহ্ন আঁকা, বাকিগুলোয় রেড ক্রস-এর। অনেক আগে থেকেই নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে জার্মান মিলিটারি পুলিস, গোটা ট্রেন ঘিরে ফেলেছে তারা।

পুরোদস্তুর কমব্যাট ড্রেস পরা সৈনিকরা ভ্যান থেকে নামল ওয়েল্ডিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে। অ্যাসেটিলিন ও অক্সিজেন মাস্ক, লম্বা মেটাল টিউবিং ইত্যাদি ছাড়াও আরও নানা ধরনের ইকুইপমেন্ট নামাচ্ছে আরেক দল সৈনিক।

চারটে ভ্যান থেকে নামল একশো প্রোটেকটিভ সুট পরা সৈনিক, হাতে সাব-মেশিনগান, সুটের কোমরে জড়ানো বেল্টে গোঁজা অটোমেটিক পিস্তল আর বেঢপ আকৃতির টর্চের মত দেখতে ফ্লেইমথ্রোয়ার মেশিন। এরা ভ্যান থেকে নেমে ট্রেনের সামনের দিকে চলে গেল।

ট্রেনের একশো গজ সামনে পাঁচটা কার সহ আরও একটা ট্রেন রয়েছে। প্রোটেকটিভ সুট পরা সৈনিকরা দ্বিতীয় ট্রেনের কারগুলোয় উঠল। ওগুলোর সামনে একটা ডিজেল এঞ্জিন, সেটা পিছিয়ে আসতে শুরু করল। ট্র্যান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেসের সামনে জোড়া লাগানো হলো দ্বিতীয় ট্রেনটাকে। জোড়া লাগানো দুই ট্রেনের মাঝখানে একটা কানেকটিং ব্রিজ আছে, ব্রিজের দুই মাথায় ইস্পাতের দুটো দরজা।

একদল সৈনিক যান্ত্রিক রোবটের মত দ্রুত কাজ শুরু করল। প্যাসেঞ্জাররা বেশিরভাগ ঘুমিয়ে থাকলেও, দু'একজন জেগে থাকতে পারে, সে-কথা মনে রেখে সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রথমেই ট্রেনের কমপার্টমেন্ট সাইডের জানালার কাঁচ রঙ করা হবে, ট্রেন থেকে প্যাসেঞ্জাররা যাতে অপারেশনটা দেখতে না পায়। যা কিছু করা হবে, শুধু কমপার্টমেন্টসাইডের জানালা দিয়েই দেখতে পাওয়া যাবে। করিডর সাইডের জানালার কাচ রঙ করা হবে না, ফলে অন্তত এক দিক থেকে প্রাকৃতিক আলো পাবে প্যাসেঞ্জাররা। কমপার্টমেন্ট সাইডের জানালার কাঁচ রঙ করার আরেকটা কারণ হলো, ক্লিভ থেকে সিনিস্টার ক্রসিং পর্যন্ত যত স্টেশন পড়বে, প্রায় সবগুলোর প্ল্যাটফর্ম শুধু কমপার্টমেন্ট থেকেই দেখা যাবে।

চেলসি আর রানা রাত সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ডাক্তারদের সঙ্গে ছিল। রাতে আরও সাতজন সংক্রমিত ব্যক্তি মারা গেছে, তাদের মধ্যে কিশোরী এক মেয়েও আছে—ক্রাইচেক যাকে ঘড়িটা প্রেজেন্ট করেছিল। রানার পরামর্শ কাজে লাগান ডাক্তাররা—কেউ মারা যাবে বুঝতে পারলে চিকিৎসা করার কথা বলে খালি একটা

কমপার্টমেন্টে সরিয়ে এনেছেন তাকে। এর ফলে মারা যাবার খবরটা খুব বেশি লোকের মধ্যে ছড়ায়নি।

রানার অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। জিভ এতটাই ফুলে উঠেছে যে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, তোতলাচ্ছে, জড়িয়ে যাচ্ছে গলার আওয়াজ। ডাক্তার মলয় ভৌমিক ওর জ্বর মেপেছেন, একশো তিন ডিগ্রী। ডাক্তাররা সবাই সংক্রমিত হয়েছেন। নেলসন, হাসান, সন্দেশা আর স্টুডেন্টরাও সারারাত জেগে অসুস্থ লোকজনের দেখাশোনা করেছে। আমেরিকান সৈনিকরা করিডরে পাহারায় ছিল। ওদের মধ্যে সাতজন সংক্রমিত। আমেরিকান ছাত্ররা ছ'জন। সুইডিশ স্টুডেন্টদের মধ্যে এরিকা আর কার্লসন প্রথমে সংক্রমিত হয়, পরে আরও চারজন। ভেনাসও অসুস্থ, তবে সে তার কমপার্টমেন্ট থেকে বের হয়নি। নিজের অসুস্থতার চেয়ে বেশি কাতর অ্যাটমের মৃত্যুতে। হাসানও অসুস্থ। শুধু নেলসন আর সন্দেশা এখনও সুস্থ।

রাতে মারা গেছে সাতজন, কিন্তু সংক্রমিত হয়েছে আরও প্রায় তিনশো।

চেলসির অবস্থা অতটা খারাপ নয়, এখনও খুব একটা ফোলেনি জিভ, চোখ দুটোও তেমন লাল হয়নি। রানার ছায়াই বলা যায় তাকে, মুহূর্তের জন্যেও কাছছাড়া হচ্ছে না।

হাসান কমপিউটর এঞ্জিনিয়ারিঙের ছাত্র, সঙ্গে একটা পি.সি-ও আছে, কথা প্রসঙ্গে এটা জানার পর দানুর চুরি করা ফ্লপি ডিস্কের খোঁজে আরেকবার ব্যাগেজ কারে ঢুকেছিল রানা, প্রথম বার ভাল করে সার্চ করা হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয়বার তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ডিস্কটা পাওয়া গেল না।

পৌনে চারটের দিকে চেলসি জোর করে টেনে আনল রানাকে, ওর কমপার্টমেন্টের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলল, 'মরার আগেই মরতে চান নাকি? আমি পাহারায় থাকলাম, আপনাকে ঘুমাতে হবে।' পাহারায় না থাকলেও চলত, একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল রানা। একটা সীটে বসে চিন্তা করছে চেলসি, এক সময় সে-ও ঘুমিয়ে পড়ল।

রঙ নয়, কমপার্টমেন্ট সাইডের প্রতিটি জানালার কাঁচে আলকাতরা লাগানো হচ্ছে। আসল সীলিঙের কাজ করছে অন্য একদল জার্মান সৈনিক–দরজা ও জানালায় অ্যারোসল সিলিন্ডারের সাহায্যে প্লাস্টিক ফোম ম্যাটেরিয়াল স্প্রে করছে তারা, যেখানে যত ফাঁক-ফোকর আছে সব বন্ধ করে দিচ্ছে। মৌমাছির মত ব্যস্ত সবাই। ওদিকে ট্রেনের প্রায় সব প্যাসেঞ্জারই গভীর ঘুমে অচেতন।

তবে একজন দু'জন করে জাগছে এবার।

সারারাত জেগে থাকলেও নেলসন ক্লান্তি বোধ করছে না। নিজেদের কমপার্টমেন্টে ফিরে এসে দেখল ভেনাস ঘুমাচ্ছে, তবে কান্নাকাটি করায় চোখের কোণে এখনও পানির লালচে ফোঁটা জমে রয়েছে। বিষণ্ন বোধ করল নেলসন, তবে একটু পরেই রোজকার অভ্যাস মত ব্যায়াম শুরু করল সে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে জানালার দিকে তাকাতেই দেখল, বাইরে থেকে একজন সৈনিক একটানে বন্ধ করে দিল জানালা, আরেকজন সৈনিক কাচে আলকাতরা মাখাতে শুরু করল,

তৃতীয়জন প্লাস্টিক ফোম স্প্রে করছে ফ্রেমের চারধারে।

হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকল নেলসন।

একদল জার্মান সৈনিক ট্রেনের ছাদে উঠে ভেন্টিলেটরগুলো লোহার পাত দিয়ে ঢেকে ওয়েল্ডিং মেশিনের সাহায্যে জোড়া লাগাচ্ছে। আরেকদল অক্সিজেন ট্যাংক তুলছে ট্রেনে। তৃতীয় গ্রুপটা টেনে আনছে জেনারেটর ইকুইপমেন্ট, দীর্ঘ পাইপ, ইলেকট্রিক কেবল আর নানা ধরনের টুলস। এদের প্রত্যেকের পরনে প্রোটেকটিভ সুট।

ট্রেনের সামনে যে নতুন পাঁচটা কার জোড়া হয়েছে তার দুটোয় আছে খাবার পানি, ওষুধ-পত্র, খাবারদাবার আর ডিজেল এঞ্জিনের জন্যে ফুয়েল। বাকি কারগুলোয় প্রোটেকটিভ সুট পরা সৈনিকরা উঠেছে। এই সুট মাত্র পাঁচ ঘণ্টা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে এমথ্রীএক্স ভাইরাসকে, ফলে পাঁচ ঘণ্টা পরপর বদলাতে হবে ওগুলো, পরিত্যক্ত সুটগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু সুটের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় সৈনিকদের মিথ্যে কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে সুটগুলো দশ ঘণ্টা পর বদলাতে হবে।

মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির কমান্ড সেন্টারে বারোজন সদস্যকে ব্রিফিং করছেন জেনারেল লী মার্শাল। 'সীল করা হয়ে গেলে ট্রেনে প্রেশারাইজ অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করা হবে, ঠিক কমার্শিয়াল এয়ারক্রাফটের মত, তবে কম মাত্রায়। জীবাণু-মুক্ত বিশুদ্ধ বাতাস সাপ্লাই দেবে স্ট্যান্ডার্ড রেট অনুসারে, মাথাপিছু প্রতি মিনিটে দশ কিউবিক ফুট।' ইঙ্গিতে ইন্টারনাল ভেন্টিলেশন সিস্টেমের খুদে একটা মডেল দেখালেন।' 'গোটা ট্রেনে অবশ্য প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন থাকবে।'

'প্রায় ছয় মাইল জিঙ্ক টিউবিং তোলা হয়েছে ট্রেনে।' কল্পনার চোখে ক্লিভ-এ কি ঘটছে চাক্ষুষ করছেন। 'শুধু এয়ার সাপ্লাই সিস্টেমের কাজে লাগবে, তা নয়; মানুষের বর্জ্যও সংগ্রহ করা হবে, পরে ধ্বংস করার জন্যে।

'এই ভাইরাস থেকে গ্রহটাকে বাঁচানোর জন্যে আমেরিকা কত বড় ত্যাগ স্বীকার করছে, এবার সেটা আপনাদেরকে জানাই। পাঁচ ঘণ্টা পর প্রোটেকটিভ সুট পরা মার্কিন সৈনিকরা সংক্রমিত হবে, কিন্তু তারা জানে দশ ঘণ্টা পর। ওদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে প্রোটেকটিভ সুট সংখ্যায় কম হওয়ায়। ওরা সংক্রমিত হয়েছে, এ খবর পাওয়ার পর ওদেরকে ট্রেন থেকে নামিয়ে কোয়ারানটিনে পাঠাবার কথা বলে ঢোকানো হবে ক্রেমাটরিয়াম-এ। একই সময় ট্রেনে তুলে দেয়া হবে আরেক দল সৈনিককে, প্রয়োজনে তাদেরকেও একসময়...তবে তার প্রয়োজন হবে বলে মনে করছি না, তার আগেই সিনিস্টার ক্রসিঙে ফেলে দেয়া যাবে ট্র্যান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেসকে।

'নদীতে প্রোটেকটিভ সুট পরা আরও একদল সৈনিক অপেক্ষা করবে, ট্রেনের ধ্বংসাবশেষ থেকে লাশগুলো সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলার জন্যে। ট্রেন নদীতে পড়ার পর যে-সব প্যাসেঞ্জার বেঁচে থাকবে, তাদেরকে নদীর পাড়ে উঠতে দেয়া হবে না বা দূরে কোথাও ভেসে যেতে দেয়া হবে না...'

কারও মুখে কথা নেই। সবাই বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

*

টয়লেট থেকে দাড়ি কামিয়ে করিডরে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল ক্রাইচেক। প্রথমে ব্যাপারটা সে ধরতে পারল না। তারপর খেয়াল করল—করিডরের দিকের জানালা দিয়ে আলো আসছে, কিন্তু দরজা খোলা কমপার্টমেন্টের ভেতর জানালা কালো হয়ে আছে। রানা আর চেলসিকে ছুটে আসতে দেখে পথ আটকাল সে, জানতে চাইল, 'মশিয়ে, কি ব্যাপার বলুন তো…'

তাকে ধাক্কা দিয়ে ট্রেনের সামনের দিকে ছুটল ওরা, কথা বলার সময় নেই।

ওদের কমপার্টমেন্টে একা শুধু ডোনা জেগে আছে। চোখ ঘুরিয়ে প্রিস্টের দিকে তাকাল সে। এই সময় ঘুম থেকে জাগল প্রিস্ট। ডোনা জানতে চাইল, 'করিডরে আলো আছে, কিন্তু কমপার্টমেন্ট অন্ধকার কেন?'

ব্যাপারটা প্রিস্টও খেয়াল করল। 'সাড়ে সর্বনাশ! ব্যাপারটা কি?' তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বসল সে।

কমপার্টমেন্টের বাকি সবাই জেগে উঠছে। প্রিস্ট বিছানা থেকে নেমে কালো জানালার সামনে চলে এল, ভেতর থেকে খোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু জানালার ফ্রেম এক চুল নড়ছে না। খেপে গিয়ে জানালার গায়ে দমাদম ঘুসি মারতে শুরু করল।

সদ্য ঘুম ভাঙা প্যাসেঞ্জাররা হতভম্ব হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে, চোখে শুধু প্রশ্ন নয়, অজানা ভয়ও। কমপার্টমেন্টের জানালায় সুবিধে করতে না পেরে ছুটে করিডরে বেরিয়ে এল প্রিস্ট। করিডরের জানালায় আলকাতরা মাখানো হয়নি, কিন্তু বহু চেষ্টা করে সেটাও সে এক চুল নাড়াতে পারল না।

অকস্মাৎ প্রতিটি কমপার্টমেন্ট থেকে চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে এল, প্যাসেঞ্জাররা জানালা খোলার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু করিডর বা কমপার্টমেন্ট, কোনদিকের একটা জানালাও খোলা যাচ্ছে না। করিডর ধরে ছুটোছুটি করছে প্রিস্ট, প্রতিটি জানালা পরীক্ষা করে দেখছে। টয়লেটের দিকে এগোবার সময় চারদিক থেকে শোরগোলের আওয়াজ পেল সে।

'একি কাণ্ড! এর ব্যাখ্যা কি?'

'এ স্রেফ একটা দুঃস্বপ্ন!'

'বদ্ধ জায়গার ভেতর আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, আমি না ভয়েই আত্মহত্যা করে বসি!'

'যেভাবে হোক জানালা ভাঙো! এসো, ট্রেন থেকে নামার চেষ্টা করি আমরা!'

টয়লেটে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল প্রিস্ট। কালো ছোট জানালাটা খুলতে ব্যর্থ হয়ে আলখেল্লার ভেতর থেকে পিস্তল বের করল, উল্টো করে ধরে কাচে বাড়ি মারছে।

পাঁচ-সাতটা বাড়ি খেয়ে ফেটে গেল কাচ, ছোট্ট একটা ফুটোও তৈরি হলো—পিস্তলের ব্যারেলটা কোন রকমে ঢুকবে। ফুটোটা আরও বড় করছে।

গর্তটায় এবার একটা মুঠো ঢুকবে। তাতে চোখ রেখে বাইরে কি ঘটছে

দেখতে যাবে, দু'চোখের মাঝখানে ঠেকল সাব-মেশিনগানের মাজল, অস্ত্রের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রোটেকটিভ সুট পরা একজন জার্মান সৈনিক।

আঁতকে উঠে পিছিয়ে এল প্রিস্ট।

সৈনিকের ইঙ্গিতে আরও দু'জন এগিয়ে এল, জানালার ভাঙা কাচ নামিয়ে নতুন কাচ লাগাচ্ছে তারা।

ট্রেনের সামনে চলে এসে এমন এক জায়গায় পজিশন নিল চেলসি, যেখান থেকে বাইরে কি ঘটছে তার ফটো তোলা যায়। মূল ট্রেনের শেষ কার-এ রয়েছে ও, শেষ কম্পার্টমেন্টের দরজার গায়ে ফিট করা জানালা দিয়ে জোড়া লাগানো নতুন কারগুলো দেখতে পাচ্ছে। মূল ট্রেন আর নতুন কারগুলোর মাঝখানে একটা ব্রিজ আছে। জানালা দিয়ে মাথা বের করে নতুন কারগুলোয় দাঁড়িয়ে-বসে থাকা প্রোটেকটিভ সুট পরা সৈনিকদেরও দেখতে পাচ্ছে সে। বিস্ময় বা অবিশ্বাস, কোনও বোধই নেই তার; সে তার কাজ করে চলেছে।

হাসানের কাছে একটা পিসি আছে, কথাটা মাথা থেকে সরাতে পারছে না রানা। ওর ধারণা যেহেতু ব্যাগেজ কারে আশ্রয় নিয়েছিল দানু, ফ্লপি ডিস্কটা সেখানেই কোথাও লুকিয়ে রাখবে সে। কিন্তু ব্যাগেজ কার দু'বার সার্চ করেও পাওয়া যায়নি সেটা। তারপরও মনটা খুঁত খুঁত করছে–কি যেন একটা ভুল হয়েছে ওর। কি?

ব্যাগেজ কারে দানুর সঙ্গে ছিল কুকুরটা। দু'জনেই ওরা মারা গেছে। লাশ ভর্তি কমপার্টমেন্টে রাখা হয়েছে ওদেরকে। অ্যাটমকে রাখা হয়েছে বেতের ঝুড়িতে। ভেতরে ঢুকে বেতের ঝুড়িটা খুঁজছে ও, লাউডস্পীকার থেকে বলা হলো, 'অ্যাটেনশন! অ্যাটেনশন! অ্যাটেনশন! এই ঘোষণা ইংরেজি, জার্মান, ফ্রেঞ্চ ও ইটালিয়ান ভাষায় প্রচার করা হবে–মাত্র একবার করে। কাজেই দয়া করে মন দিয়ে শুনুন সবাই।'

বেতের ঝুড়িটায় ছোট একটা লেপ রয়েছে, তলায় হাত দিয়ে খুঁজছে রানা।

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন,' লাউডস্পীকার আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল। 'মারাত্মক ফ্লু জাতীয় একটা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আপনারা, কাজেই আপনাদেরকে একটা কোয়ারানটিন সাইটে নিয়ে যাওয়াটা অত্যন্ত জরুরী। ওটা একটা হেলথ ক্যাম্প, যেখানে আপনাদেরকে একুশ দিন মেডিকেল অবজারভেশনে রাখা হবে...'

করিডরে প্রচুর লোক, তাদের মধ্যে প্রিস্টও আছে। দরদর করে ঘামছে সে। ইতিমধ্যে দিগন্ত ছাড়িয়ে উঠে এসেছে সূর্য, জানালা দিয়ে রোদ ঢুকছে ভেতরে।

'সমস্ত আধুনিক চিকিৎসাই দেয়া হবে আপনাদের, সেজন্যে কাউকে কোন খরচা দিতে হবে না। কোয়ারানটিন সাইটে পৌঁছুতে চোদ্দ ঘণ্টা লাগবে, পথে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ট্রেন থামবে না, থামলেও কাউকে কোথাও নামতে দেয়া হবে না। আপনাদের সবার তালিকা আছে আমাদের কাছে, যার যার নিকটাত্মীয়ের কাছে খবর পাঠানো হবে...

ডোনা বলল, 'আমার ন্যানি, মিসেস আধুরাকে সেই রাত থেকে কোথাও

দেখছি না। আপনি জানেন, উনি কোথায়?'

শুনতে পেলেও জবাব দিল না প্রিস্ট। আধুরা যে মারা গেছে, এ-কথা কেউ তাকে বলেনি।

জোড়া লাগানো নতুন কার থেকে ব্রিজ পার হয়ে প্রোটেকটিভ সুট পরা সৈনিকরা মূল ট্রেনে চলে আসছে, করিডরে পজিশন নিচ্ছে তারা, হাতে বাগিয়ে ধরা আগ্নেয়াস্ত্র।

'এখন যে নির্দেশগুলো দেয়া হবে সেগুলো অবশ্য পালনীয়,' লাউডস্পীকার আবার জ্যান্ত হলো, সিস্টেমটা ফিট করা হয়েছে নতুন জোড়া লাগানো একটা কারে। 'এক–প্রোটেকটিভ সুট পরা সৈনিকদের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলুন। আতঙ্ক অবশ্যই পরিহার করতে হবে। কোন রকম বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না। দুই–ট্রেন নিশ্ছিদ্রভাবে সীল করে দেয়া হয়েছে। এই সীল ভাঙার কোন চেষ্টা করা হলে সৈনিকরা গুলি করবে...'

কোণঠাসা ইঁদুরের মত দেখাচ্ছে প্রিস্টকে। এদিকের করিডরে প্রোটেকটিভ সুট পরা সৈনিকরা পৌঁছে গেছে। মরিয়া হয়ে আলখেল্লার ভেতর থেকে পিস্তলটা বের করল সে, লুকিয়ে রাখল হাতের তালুতে। ডোনার আরও একটু কাছে সরে এল।

'তিন–ধূমপান সম্পূর্ণ নিষেধ...'

হাই অক্সিজেন সাপ্লাই এখনও শুরু হয়নি, তবু যারা ধূমপান করছিল তারা তাদের সিগারেট বা চুরুট নিভিয়ে ফেলল।

'সমস্ত সিগারেট, লাইটার, ফায়ার আর্মস সংগ্রহ করা হবে। এক এক করে সবাইকেই সার্চ করা হবে, দয়া করে কেউ বাধা দেবেন না...'

লাশ ভর্তি কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল রানা, চেহারায় নির্লিপ্ত গাম্ভীর্য। ওর খোঁজে এদিকেই আসছিল চেলসি, দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'ওখানে কেন ঢুকেছিলেন? এখনও কি সেই ডিস্কটা খুঁজছেন আপনি?'

রানা কিছু বলতে গিয়েও বলল না, তাকাল ক্রাইচেকের দিকে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে চেলসিও সেদিকে তাকাল। সুটকেস থেকে মুঠো মুঠো সিগারেট লাইটার বের করে লুকোবার জন্যে পকেটে ভরছে সে। দেখতে পেয়ে ছুটে এল একজন সৈনিক। আঙুল নেড়ে লাইটারগুলো বের করতে বলল।

'তিনটের দাম দুই ডলার,' বলল ক্রাইচেক। 'ফেলো কড়ি, মাখো তেল।'

রাইফেলের ডগায় বেয়োনেট ফিট করা রয়েছে, সৈনিকটা সেটা ক্রাইচেকের পেটের দিকে তাক করল। হাত তুলে সারেন্ডার করল ক্রাইচেক, তারপর পকেট থেকে লাইটারগুলো বের করে সৈনিকের হাতে তুলে দিল।

'...চার–সমস্ত প্যাসেঞ্জারের প্রতিনিধি হিসেবে মি. মাসুদ রানাকে নির্বাচন করা হয়েছে। আপনাদের কারও যদি কিছু সমস্যা হয় বা যদি কিছু জানার বা বলার থাকে, তাঁর মাধ্যমে বলতে বা জেনে নিতে পারবেন...'

কোলে তিন মাসের এক শিশুকন্যাকে নিয়ে এক মা ডুকরে কেঁদে উঠল। বাচ্চাটা শ্বাসকষ্টে ভুগছে, ঠোঁটের কোণ থেকে গড়িয়ে নামছে লালচে লালা। চোখ কুঁচকে আছে, উজ্জ্বল আলো সহ্য করতে পারছে না।

চেলসির কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিসফিস করল রানা, 'স্বেচ্ছাসেবকদের খবর দিন—যার যার ফায়ার আর্মস কমপার্টমেন্টের ভেতর লাশের স্তূপে লুকিয়ে রাখতে হবে।' চেলসি চলে গেল।

'...পাঁচ—যতটা সম্ভব যে-যার কমপার্টমেন্টেই থাকবেন। তবে যে-যার কার ছেড়ে অবশ্যই বেরুবেন না...'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করল প্রিস্ট, সশস্ত্র সৈনিকরা এক করিডর থেকে আরেক করিডরে যাবার পথ বন্ধ করে দিচ্ছে।

'...সর্বশেষ নির্দেশ—আরও পরামর্শ সহ একটা করে লিফলেট পাবেন সবাই, সেটা সবাই মন দিয়ে পড়বেন।'

ক্রাইচেককে সম্পূর্ণ শান্ত দেখাচ্ছে। তবে ফগেল খুব ভয় পেয়েছে। তাকে অভয় দিচ্ছে ক্রাইচেক। 'এত চিন্তার তো কিছু দেখি না আমি। হেলথ ক্লাবে নিয়ে যাচ্ছে, একুশ দিন ফ্রী খাওয়া-দাওয়া করা যাবে। তারপর তুমি তোমার পথে চলে যাবে, আমি আমার।'

ফগেল ঘন ঘন হাত কচলাচ্ছে। কিছু বলতে যাবে, এই সময় আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল লাউডস্পীকার। 'দয়া করে সহযোগিতা করুন। আপনাদের সবার জীবন বিপন্ন! "জানাও" স্টেশনে থামবে ট্রেন, ওটাই আপনাদের গন্তব্য, পোল্যান্ডের দক্ষিণ-পুব দিকে। আপনাদের সবার মঙ্গল ও নিরাপত্তা কামনা করে শেষ করছি।'

তারপরই জার্মান ভাষায় শুরু হলো।

হঠাৎ করে বিহ্বল দেখাল ক্রাইচেককে, সে যেন ভূত দেখেছে। 'কি বলল?' ফগেলকে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল। 'কি বলল?'

তাকাল ফগেল, ক্রাইচেককে পাগল মনে হলো তার। 'আমাদের সবার মঙ্গল কামনা করল...'

'না!' উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠল ক্রাইচেক, আরও জোরে ঝাঁকাচ্ছে ফগেলকে। 'গন্তব্য? কোথায়? কোথায়?'

'পোল্যান্ডের কোথায় যেন।'

এবার একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল ক্রাইচেক। 'না...না...ওখানে না! ওরা বুঝতে পারছে না, ওখানে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়! ওহ্ গড, তুমি এত নিষ্ঠুর হও কি করে...' নেতিয়ে পড়ল সে, ফগেলের গায়ে হেলান দিল। ঠেলে তাকে সরিয়ে দিল ফগেল।

দু'একজন হেসে উঠল, তারা ভাবছে এটা ক্রাইচেকের আরও একধরনের তামাশা।

ক্রাইচেক ছুটল। চিৎকার করছে, 'ট্রেন থামাও! আমি পোল্যান্ডে যাব না! ওখানে ওরা আমার বোনকে রেপ করেছে...'

ট্রেন, বলাই বাহুল্য, দাঁড়িয়েই আছে। ক্রাইচেক সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাচ্ছে, অথচ যারা তাকে আগে দেখেছে তারা ভাবছে সে বোধহয় কৌতুক করছে। অনেকেই এখন উৎসাহ দিচ্ছে তাকে।

কারও দিকে খেয়াল নেই ক্রাইচেকের। ওর পিছু নিয়ে ছুটে আসছে রানা,

তা-ও জানে না। সে করিডর ধরে ছুটছে। পকেটে লুকিয়ে রাখা কয়েকটা লাইটার পড়ে গেল, তাকিয়েও দেখল না। একটা তীরের মত ভিড় ভেদ করে যাচ্ছে সে। লোকজনের হাসাহাসি থেমে যাচ্ছে।

করিডরের শেষ মাথায়, দরজায় পৌঁছে গেল ক্রাইচেক। ওখানে একজন সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে থেমে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সে। 'যদি ইচ্ছে হয় এখানেই আমাকে মেরে ফেলো তোমরা, তবু পোল্যান্ডে নিয়ে যেয়ো না! ওরা আমার মাকে রেপ করেছে। আমার বোনকে রেপ করেছে, আমার বাপকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে।' পোলিশ ভাষায় কাকুতি-মিনতি করছে সে। 'লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি আর ব্যবসা ফেলে চলে এসেছি আমি, পথে পথে ফেরি করি, কিন্তু পোল্যান্ডে কোনদিন ফিরিনি। আমাকে তোমরা দয়া করো, ওখানে পাঠিয়ো না...'

সৈনিক তার রাইফেলের বাঁট দিয়ে ক্রাইচেকের বুকে বাড়ি মারতে গেল, ছুটে এসে সেটা খপ করে ধরে ফেলল রানা। 'ওর গায়ে হাত তুলবে না,' চোখ রাঙিয়ে বলল ও।

'বাবা,' রানাকে জড়িয়ে ধরল ক্রাইচেক। 'আমাকে ট্রেন থেকে ফেলে দাও! যদি ইচ্ছে হয় মেরে ফেলো! কিন্তু পোল্যান্ডে নিয়ে যেয়ো না!'

কথা না বলে রানা তাকে বুকে টেনে নিল, জোর করে টেনে সরিয়ে আনছে। 'আপনি শান্ত হন। আমার সঙ্গে আসুন।'

তাকে তার কমপার্টমেন্টে এনে বসাল রানা। ক্রাইচেক এমন এক অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ল, কোন বাচ্চা ছেলেও বোধহয় এভাবে কখনও কাঁদেনি।

সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না রানা। ইহুদিদের ওপর নাৎসী বাহিনীর অত্যাচার সম্পর্কে জানে ও।

ওদের সঙ্গে চেলসিও রয়েছে, তবে সে অন্যমনস্ক। আপনমনে মাথা নাড়ল একবার। তারপর বিড়বিড় করল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই!'

'মানে?' রানা অবাক।

'আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেননি,' ফিসফিস করল চেলসি। 'তারমানে ডিস্কটা খুঁজে পেয়েছেন।'

এবারও রানা কোন মন্তব্য করল না। শুধু বলল, 'হাসানকে দরকার আমার।'

ছয়

সীল করা ট্রেনে আটকা পড়া প্যাসেঞ্জাররা আতঙ্কিত তো বটেই, তবে অসহায় বোধটা তারচেয়েও বেশি; সবাই যেন ভাবছে দেখা যাক নিয়তি ও ঈশ্বর তাদেরকে নিয়ে কি করে। সৈনিকরা হেলমেট আর মাস্কসহ প্রোটেকটিভ সুট পরে আছে দেখে অনেকেই নাকে-মুখে রুমাল বেঁধেছে, যেন তাতে ভাইরাস ঠেকানো যাবে।

এক সময় চার ভাষায় প্রচারিত ঘোষণা শেষ হলো। তারপরই সচল হলো

ট্রেন। সৈনিকরা অস্ত্র হাতে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে করিডরে, আরেক দল প্রতিটি কমপার্টমেন্টে ঢুকে সার্চ করছে। কাজে কোন খুঁত রাখছে না—বাক্স, ব্যাগ, পকেট সবই সার্চ করা হচ্ছে, এমনকি কমপার্টমেন্টের প্রতিটি ইঞ্চিও। ধরনটা দেখে রানার অন্তত বুঝতে বাকি থাকল না কি খুঁজছে তারা। একজন মেজর রানাকে খুঁজে বের করল, সবিনয়ে জানাল কর্তৃপক্ষের নির্দেশ আছে, ওকেও তাদের সার্চ করতে হবে। রানা বাধা না দিয়ে শ্রাগ করল। কিন্তু রানাকে সার্চ করে ওরা যা খুঁজছে সেটা পেল না। এমনকি কোন আগ্নেয়াস্ত্রও না।

অকস্মাৎ ডোনাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে অপর হাতের পিস্তলটা তার মাথায় ঠেকাল প্রিস্ট, দ্রুত পিছিয়ে নিজেদের কমপার্টমেন্টে ঢুকে পড়ছে। দেখতে পেয়ে বেয়োনেট উঁচিয়ে ছুটে এল একজন সৈনিক। 'খবরদার! আর এক পা-ও সামনে বাড়বে না। বাড়ালেই গুলি করব!' চিৎকার করছে প্রিস্ট। প্যাসেঞ্জাররা ভয়ে কাঠ, কেউ কেউ কেঁদে ফেলল। ডোনা কাঁদছে না, শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ক্রাইচেকের দিকে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সৈনিক।

'কমপার্টমেন্ট থেকে বেরোও সবাই।' নির্দেশ দিল প্রিস্ট, দাঁড়িয়ে আছে দরজার একপাশে। মুহূর্তের মধ্যে কমপার্টমেন্ট খালি হয়ে গেল। সৈনিকের দিকে তাকিয়ে হিসহিস করে উঠল সে, 'মন দিয়ে শোনো। ট্রেন থেকে নেমে যাব আমি। আমার একটা প্লেন চাই, পাইলট আর ফুয়েল সহ--দু'হাজার মাইল ওড়ার মত। পরিষ্কার?'

মাথা ঝাঁকাল সৈনিক, হাতের রাইফেল নিচু করল।

প্রিস্ট হাত ঘড়ি দেখল। 'এক ঘণ্টা সময় দিলাম।' কমপার্টমেন্টে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

সকাল সাড়ে ছ'টা।

মারা যেতে বসেছে, এমন ছ'জন অসুস্থ লোককে নিয়ে ডাক্তাররা বেরিয়ে এসেছেন করিডরে। লাশগুলো বহন করছে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক—হাসান, নেলসন, সন্দেশা, নিরস্ত্র প্যাসেঞ্জার তিনজন আমেরিকান সৈনিক, তিনজন আমেরিকান ছাত্র আর ছ'জন সুইডিশ ছাত্র-ছাত্রী। এরই মধ্যে খালি দুটো কমপার্টমেন্ট লাশে বোঝাই হয়ে গেছে, লাশের স্তূপ সিলিং ছোঁয় ছোঁয় অবস্থা। সব মিলিয়ে ইতিমধ্যে মারা গেছে নব্বুইজন, এই ছয়জন বাদেই।

ওদের সঙ্গে রানা আর চেলসিও রয়েছে। লাশ বহন করা হচ্ছে সশস্ত্র সৈনিকদের কাছ থেকে পাওয়া স্ট্রেচারে। রানা, চেলসি আর হাসান ছাড়া আর কেউ জানে না একটা স্ট্রেচারে কোন লাশ নেই, এমন ভঙ্গিতে কয়েকটা কুশনের ওপর চাদর ঢাকা দেয়া হয়েছে যে দেখে লাশ ছাড়া অন্য কিছু মনে হবে না। কুশনগুলোর সঙ্গে লুকানো আছে হাসানের পি.সি—পার্সোনাল কমপিউটর।

ওরা তিনজন যে কমপার্টমেন্টে ঢুকল তাতে নতুন কোন লাশ ভরা যাবে না। এখানেই দানু আর অ্যাটমের লাশ রাখা হয়েছে। অনেক কষ্টে স্ট্রেচারটা ঢোকানো

হলো, তারপর ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়া হলো দরজা।

কমপিউটরটা বের করে সকেটে প্লাগ ঢোকাল হাসান, রানা বেতের ঝুড়ির ভেতর হাত গলিয়ে বের করে আনল ফ্লপি ডিস্কটা। ব্যাগেজ কারে লুকিয়ে ছিল দানু, তখনই কোন এক সময় ঝুড়িটার ভেতর ডিস্কটা রাখে সে। শেষ বার সার্চ করতে এসে দেখে গেছে রানা।

কমপিউটরে ডিস্কটা ঢোকানো হলো। বেতের ঝুড়িটা উল্টো করে সেটায় বসল রানা, কমপিউটর রাখা হয়েছে লাশের একটা স্তূপে। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে হাসান আর চেলসি। রানা ওর সন্দেহের কথা ওদেরকে এরইমধ্যে বলেছে। ওর ধারণা, ডিস্কটায় বি-টু-নেগেটিভ নয়, এমথ্রীএক্স-এর ফর্মুলা আছে। তা যদি সত্যি হয়, মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটি রানাকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছে। কারণ এমডিপিসি-র কাছে এই ভাইরাসের কোন প্রতিষেধক নেই। এর একটাই অর্থ করতে হয়, মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটি ট্রেন যাত্রীদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে না, বরং উল্টোটা সত্যি–প্রতিটি প্যাসেঞ্জারকে তারা মেরে ফেলার ব্যবস্থা করছে, রোগটা যাতে ট্রেনের বাইরে না ছড়াতে পারে।

অথচ রানা জানে হু-র অঙ্গপ্রতিষ্ঠান রেমিডি-তে এমথ্রীএক্স-এর প্রতিষেধক আছে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে ড. নাসিমুল গনি এই ভাইরাস আর তার প্রতিষেধক তৈরি করে রেখেছেন। ন্যাটোর ল্যাবে এমথ্রীএক্স তৈরি করা হচ্ছে, এই খবর গোপন সূত্রে পান তিনি, কিন্তু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনকে বলেও ব্যাপারটা বিশ্বাস করাতে পারেননি, ফলে গবেষণার জন্যে বাজেট সংগ্রহেও ব্যর্থ হন ভদ্রলোক। অগত্যা সহকারী দু'জন বিজ্ঞানীকে নিয়ে 'রেমিডি'-র ল্যাবে গোপনে কাজ শুরু করেন, ভাইরাস আর তার প্রতিষেধক তৈরিতে সফলও হন। কিন্তু ন্যাটো ও অন্যান্য সংস্থার তরফ থেকে চুরি অথবা স্যাবোটাজ করা হবে ভেবে ব্যাপারটা চেপে রাখেন। তবে চেপে রাখা উচিত হচ্ছে কিনা, তা সম্ভবই বা কতদিন, ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ করার জন্যেই রানাকে তিনি জেনেভায় ডিনার খাবার আমন্ত্রণ জানান। রানা তাকে পরামর্শ দিয়েছে, ভাইরাসটা নয়, শুধু প্রতিষেধকটা যেন বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়, বিশেষ করে মুসলমান-প্রধান রাষ্ট্রগুলোয়–যে-সব দেশ ন্যাটো বা আমেরিকার হুমকির মুখে রয়েছে।

মুশকিল হলো, ফ্লপি ডিস্কে যদি এমথ্রীএক্স-এর ফর্মুলা পাওয়া যায়, অর্থাৎ প্যাসেঞ্জাররা যদি এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকে, মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির মাধ্যমে 'রেমিডি' থেকে প্রতিষেধকটা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। কারণ ওই কমিটির জেনারেল মার্শাল সহ কেউই বিশ্বাস করে না যে এমথ্রীএক্স-এর প্রতিষেধক কেউ আবিষ্কার করেছে।

সেক্ষেত্রে, রানা ভাবছে, হয় নিয়তির লিখন বলে মনে করে ওদের সবাইকে মারা যেতে হবে, তা না হলে সশস্ত্র সৈনিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। তবে জেনেভা থেকে এত দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এসে এখন বাঁচার চেষ্টা করাও হাস্যকর একটা ব্যাপার হবে। কে আনবে প্রতিষেধক? আনতে কতক্ষণ সময় লাগবে?

এ-সব প্রশ্ন আপাতত মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়ে হাতের কাজে

মন দিল রানা।

কমপিউটরের স্ক্রীনে লাল হরফে লেখাগুলো ফুটে উঠল–'টপ সিক্রেট'।

আবার একটা বোতামে চাপ দিল রানা। স্ক্রীনে এবার যে লেখাগুলো ফুটল, সেগুলো দেখে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল ওর। 'মাসুদ ভাই, এখন কি হবে!' বলে কেঁদেই ফেলল হাসান।

স্ক্রীনের লেখাগুলোর দিকে বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা, হাসানের কথা শুনতে পায়নি– 'মাল্টিপ্‌ল্‌ এক্স এক্স এক্সঃ ফর্মুলা'।

সকাল সাড়ে আটটার দিকে নতুন কার থেকে ট্রেন যাত্রীদের পাউরুটি, মাখন, পনির আর মিনারেল ওয়াটার বিলি করা হলো।

ন'টার দিকে রক্তবমি শুরু হলো ক্রাইচেকের, ভয়ে কমপার্টমেন্ট খালি করে করিডরে বেরিয়ে এল বাকি প্যাসেঞ্জাররা। গলায় আঙুল দিয়ে ক্ষত তৈরি করেছে ক্রাইচেক, রক্ত বেরুবার সেটাই কারণ। যাত্রীরা কমপার্টমেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে যেতে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল সে। তারপর সুটকেস থেকে একটা হাতুড়ি বের করে জানালার কাঁচ ভাঙতে শুরু করল।

ফর্মুলাটা দীর্ঘ, সবটুকুর ওপর চোখ বুলাতে বেলা দশটা বেজে গেল। রানার মনে ক্ষীণ আশা ছিল, ফর্মুলার বিবরণ শেষ হলে প্রতিষেধক সম্পর্কে কিছু না কিছু থাকবে, অন্তত কেন প্রতিষেধক তৈরি সম্ভব হয়নি সে-সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা না থেকেই পারে না। আরও থাকতে পারে রোগ উপশমের উপায় সম্পর্কে উপদেশ বা পরামর্শ। কিন্তু না, সে-সব কিছুই নেই। ফর্মুলা শেষ হবার পর সাত লাইনে কয়েকটা মাত্র বাক্যে লেখা হয়েছে–সংক্রমিত ব্যক্তিকে আগুনে পুড়িয়ে মারাই সবদিক থেকে নিরাপদ–যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আর মারা গিয়ে থাকলে তো কথাই নেই, সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলতে হবে–তার কাপড়চোপড়, ব্যবহার করা জিনিস-পত্র, প্রস্রাব ও বিষ্ঠাসহ। লাশের সংখ্যা যাই হোক, এর কোন বিকল্প নেই। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সংক্রমিত ব্যক্তিকে পানিতে ডুবিয়ে রাখলে বা পানিতে ফেলে দিলে সে মারা যাবে বটে, কিন্তু ভাইরাসটা নির্জীব হয়ে পড়বে। এমথ্রীএক্স-এর এটা একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য, পানিতে ভাইরাসটা ছড়ায় না।'

'এখন আমরা কি করব?' বিড়বিড় করল চেলসি।

একটু পর মুখ খুলল রানা। 'প্রথমে জানতে হবে ওরা আমাদেরকে পোড়াবে, নাকি ডোবাবে।'

'একি সত্যি? একি সম্ভব?' কাঁদো কাঁদো গলায় জিজ্ঞেস করল হাসান। 'বারোশো মানুষকে মেরে ফেলতে নিয়ে যাচ্ছে ওরা?'

রানার মাথায় দ্রুত চিন্তা চলছে। একই সঙ্গে কথাও বলছে, 'ট্রেন থেকে আমাদের কারও নামা চলবে না, কারণ তাতে কোন লাভ তো নেইই, বরং ভাইরাসটা গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে।'

'মাসুদ ভাই, আমি বাঁচতে চাই!' হাসানকে মরিয়া দেখাল। 'আমি আমার মা-বাবার একমাত্র সন্তান...'

'চুপ করো!' ভাঙা গলায় ধমক দিল রানা, এখন আর নিজের গলাও চিনতে

পারছে না। 'বাঁচতে আবার কে চায় না! এ এমন এক পরিস্থিতি, বাঁচলে আমরা সবাই বাঁচব, তা না হলে একজনও বাঁচব না। আমাকে চিন্তা করতে দাও।'

চেলসির মাথাও দ্রুত কাজ করছে। হঠাৎ সে বলল, 'ডুবিয়ে মারা হবে।' তার গলার স্বর আড়ষ্ট।

'কি করে জানছেন?' ঝট করে তার দিকে তাকাল রানা। ঝাঁকি খাওয়ায় সানগ্লাসে আড়াল করা চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত ছিটকে পড়ল চেলসির কপালে।

ঠোঁটের কোণ থেকে বেরিয়ে আসা রক্তের ধারা রুমাল দিয়ে মুছল চেলসিও, ঢোক গিলে খানিকটা খেয়েও ফেলল, তারপর জড়ানো গলায় আবার বলল, 'জেনারেল আপনাকে বলেছেন পোল্যান্ডের জানাও স্টেশনের কাছাকাছি কোয়ারানটিন সাইট তৈরি করা হচ্ছে, ওখানেই আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে, ঠিক?' সে লক্ষ করল, ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছে না হাসান, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বমি করল খানিকটা।

'হ্যাঁ।' নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, বেশ কয়েক জায়গায় কুঁচকে যাবার পর চামড়া আর সমান হয়নি।

'গোটা ব্যাপারটাই মিথ্যে,' থেমে থেমে বলল চেলসি। 'কোয়ারানটিন হয়তো তৈরি করা হচ্ছে, তবে সেটা নেহাতই লোক দেখানো। জানাও স্টেশনে পৌঁছনোর অনেক আগেই পথে পড়বে সিনিস্টার ক্রসিং। ব্রিজটা দুশো বারো বছরের পুরানো, খুব কম ব্যবহার করা হয়। ম্যাপ থাকলে দেখাতে পারতাম। আমার ধারণা, ওই ব্রিজ থেকে পানিতে ফেলে দেয়া হবে ট্রেন…'

'প্রতি কমপার্টমেন্টে একটা ম্যাপ আছে,' বলল রানা। 'এখানেও থাকার কথা…'

'লাশের আড়ালে হারিয়ে গেছে,' বলল চেলসি। 'চলুন আমার কমপার্টমেন্টে যাই।'

দু'জন সৈনিক ছুটে এসে ভেঙে ফেলল কমপার্টমেন্টের দরজা। আর ঠিক তখনই হাতুড়ির বাড়ি মেরে ক্রাইচেকও জানালার কাচ ভেঙে ফেলল। প্রেশারাইজড বাতাস জানালায় সদ্য তৈরি হওয়া ফুটো দিয়ে হিস হিস আওয়াজ তুলে বেরিয়ে যাচ্ছে, ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে ফুটোর কিনারা থেকে কাচের টুকরো। পিছন থেকে সৈনিকরা জড়িয়ে ধরল তাকে, কেড়ে নিতে চেষ্টা করায় হাতুড়িটা ছিটকে পড়ল মেঝেতে। তারপরও ক্রাইচেককে থামানো গেল না, সে খালি হাত দিয়েই ফুটোটা বড় করার চেষ্টা করল, এমন ধস্তাধস্তি করছে যে সৈনিকরা তাকে সরিয়ে আনতে পারছে না।

অবশেষে রাইফেলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মারা হলো তার মাথায়। এই সময় ঝড়ের বেগে কমপার্টমেন্টে ঢুকল রানা। একজন সৈনিক চিৎ হয়ে পড়ে থাকা ক্রাইচেকের বুকে বেয়োনেট গাঁথতে যাচ্ছে, খপ করে তার হাতটা ধরে ফেলল ও। 'আমাকে চেনো তোমরা? মাসুদ রানা, প্যাসেঞ্জারদের প্রতিনিধিত্ব করছি। যাও, বেরোও এখান থেকে, একে সামলানোর দায়িত্ব আমি নিলাম।'

সৈনিক দু'জন নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল, তারপর বেরিয়ে গেল কমপার্টমেন্ট ছেড়ে।

রানার চোখে চোখ রেখে ক্রাইচেক বলল, 'তুমি বুঝছ না, বাপ। তুমি বুঝছ না!' জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে। মাথাটা তো ফেটেছেই, তার হাতও কয়েক জায়গায় কেটে গেছে।

রানার পিছু নিয়ে হাসান আর চেলসিও ঢুকেছে ভেতরে। ওরা আসলে ট্রেনের পিছন দিকে যাচ্ছিল, সৈনিকরা ক্রাইচেককে মারধর করছে দেখে ভেতরে ঢুকেছে। হাসানকে ডাক্তার ডাকতে পাঠাল রানা, তারপর চেলসিকে নিয়ে বেরিয়ে এল করিডরে।

এক করিডর থেকে আরেক করিডরে আসা-যাওয়া করা নিষেধ, এই নিয়ম শুধু রানা আর ওর নির্বাচিত কয়েকজনের জন্যে শিথিল করা হয়েছে। সৈনিকদের একজন মেজর, ডিক মনরো, রানার কাছে একটা তালিকা চেয়েছিল। তালিকায় ডাক্তার আর স্বেচ্ছাসেবক দলের সবার নাম দিয়েছে ও। মেজর মনরো নিজের সই করা কাগজের একটা স্লিপ দিয়েছে তাদের সবাইকে। ওই স্লিপ দেখাতে পারলে সৈনিকরা কাউকে আটকাবে না।

নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে পরবর্তী কর্তব্য স্থির করতে বেশ অনেকটা সময় বেরিয়ে গেছে। তবে তারপর কাজ শুরু হয়েছে ঝড়ের বেগে। এরইমধ্যে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে ডাক্তার আর স্বেচ্ছাসেবক দলের সবাইকে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। রানা নির্দেশ দিয়েছে, লুকিয়ে রাখা অটোমেটিক পিস্তল বের করে নিজেদের সঙ্গে রাখতে হবে, তবে ওর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ওগুলো ব্যবহার করা যাবে না, ওদের কর্মসূচী সম্পর্কে সাধারণ প্যাসেঞ্জারদের এখুনি কিছু বলাও যাবে না।

রানা ঠিক করেছে, প্রথমে ট্রেনের ভেতর নিজেদের অনুকূল একটা পরিবেশ তৈরি করবে। একটা ব্যাপারে প্রায় সবাই ওর সঙ্গে একমত হয়েছে, সৈনিকদের দলে টানা প্রায় অসম্ভব, যদিও এক পর্যায়ে সে চেষ্টাও করা হবে। তার আগে দলে টানতে হবে ট্রেনের পিছনের কারে থাকা সশস্ত্র সিকিউরিটি পুলিসকে। সংখ্যায় ওরা কতজন তা জানা না গেলেও ওদের রাইফেলগুলো কাজে লাগবে।

দীর্ঘ আলোচনায় আরও একটা ব্যাপারে একমত হয়েছে ওরা—মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটি যেহেতু ওদেরকে মেরে ফেলতেই নিয়ে যাচ্ছে, তাদের কাছে সাহায্য চেয়ে কোন লাভ নেই। ট্রেনের পরিস্থিতি যতটা সম্ভব নিজেদের অনুকূলে ও নিয়ন্ত্রণে আনার পর অ্যাড্রেস সিস্টেমের সাহায্যে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে সাধারণ প্যাসেঞ্জারদের সব কথাই জানানো হবে, সেই সঙ্গে সৈনিকদের বলা হবে তোমরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দাও। বাঁচার কি উপায় করা যায় সে-বিষয়েও কথা বলবে রানা।

ম্যাপ দেখে সময়ের একটা হিসাব করেছে ওরা। এখন বাজে সাড়ে এগারোটা। ট্রেন সিনিস্টার ক্রসিঙে পৌঁছুতে সময় নেবে আরও সাড়ে পাঁচ থেকে ছ'ঘণ্টা।

দুপুর বারোটা।

বোহেমিয়ান বনভূমির ভেতর দিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ায় ঢুকল ট্র্যান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেস, চারপাশে পাথুরে পাহাড় আর ছড়ানো-ছিটানো কিছু গাছপালা ছাড়া আর কিছু নেই, ট্রেন ছুটে চলেছে উত্তর-পুব ঘেঁষা রুট ধরে ওস্ট্রাভা ক্রিসেন্ট-এর দিকে। সোজা-সরল রেললাইন ছেড়ে ঘুরপথ ধরেছে ট্রেন, জন বহুল শহরগুলোকে এড়াবার জন্যে—তার মধ্যে প্রাগ, হারাডেস, ক্রালভ, কারভিনা আর ওস্ট্রাভাও আছে। ঘুরপথ নির্ধারিত করা হয়েছে মেগাডেথ প্রিভেনশন কমিটি থেকে, কমান্ড সেন্টারের কমপিউটরের সাহায্যে। ইলেকট্রিক ও ডিজেল এঞ্জিনের শক্তি এক হওয়ায় ট্রেনের স্পীড বেড়ে গেছে, ফলে ঘুরপথ ধরলেও সময়ের চেয়ে এগিয়ে না থাকলেও, পিছিয়ে যাচ্ছে না। রেকর্ড সময়ের ভেতর বোহেমিয়া আর মোরাভিয়া পার হয়ে এল ওরা। এই মুহূর্তে কার্পেথিয়ান পার্বত্য এলাকায় রয়েছে ট্রেন, ক্রমশ ওপরে উঠছে, সামনে পড়বে আঁকাবাঁকা রেলপথ। চেক, স্লোভাক, জার্মান আর ইংরেজি ভাষায় লেখা একটা সাইনও পড়বে, তাতে লেখা—'জাবলুনকভ পাস, হাইটার্টা রেঞ্জ, কার্পেথিয়ান মাউন্টিনস, অলটিচ্যুড সেভেন থাউজেন্ড ওয়ান হানড্রেড টুয়েলভ ফিট।'

সাড়ে বারোটা।

ট্রেনের পিছনে এসে রানা ও চেলসি দেখল প্রোটেকটিভ সুট পরা দু'জন সৈনিক পাহারা দিচ্ছে, করিডরের একেবারে শেষ মাথায়। কারণটা বোঝা গেল না, তাদেরকে উদ্বিগ্ন ও বিচলিত দেখাল। 'মেজর মনরো তোমাদের ডাকছেন,' বলল রানা, পকেট থেকে কাগজের স্লিপ বের করে দেখাল।

কোন রকম ইতস্তত বা প্রশ্ন না করে চলে গেল তারা, হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হলো যেন পালিয়ে বাঁচল। করিডর থেকে তারা বেরিয়ে যেতেই দরজা বন্ধ করে দিল চেলসি, আর রানা করিডরের দিকের একটা জানালা ভাঙার জন্যে এগোল। ক্রাইচেকের হাতুড়িটা সবার অলক্ষ্যে পকেটে করে নিয়ে এসেছে ও।

ভাঙতে গিয়ে দেখে জানালার কাচ ফাটা। ব্যাপারটা কি? ভাল করে পরীক্ষা করতে দেখল, শুধু ফাটা নয়, ছোট আকারের একটা ফুটোও তৈরি হয়েছে। ফুটোটা বড় করতে বেশি সময় লাগল না। প্রয়োজন হবে, তাই জানালার সবটুকু কাচ ভেঙে ফেলল ও। বাইরে মাথা বের করতেই সৈনিকদের বিচলিত বোধ করার একটা কারণ অন্তত জানা গেল।

সিকিউরিটি পুলিসের তিন-চারজন লোক নিজেদের কার থেকে বেরিয়ে ট্রেনের গায়ে ঝুলে রয়েছে, চিৎকার করে কি যেন বলতে চাইছে তারা। জানালার কাঁচ ভাঙতে না পেরে বা ভাঙতে গিয়ে বাধা পাওয়ায় ফিরে যাচ্ছিল তারা, আন্দাজ করল রানা, ওকে দেখে থেমে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেছে। হাতছানি দিয়ে তাদেরকে কাছে ডাকল ও।

জানালার সামনে চলে এল পুলিসদের চীফ, সার্জেন্ট রিচার্ড কক। 'আমরাও সংক্রমিত হয়েছি! আমার চারজন লোক মারা গেছে! আমাদের ওষুধ দরকার!'

রানা তাকে জানালা গলে মূল ট্রেনের করিডরের ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করল। 'কেউ আমরা বাঁচব না,' এভাবে শুরু করে, প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে

সংক্ষেপে একটা ধারণা দিল ও।

'তাহলে আসুন ট্রেন থামাতে বাধ্য করি ড্রাইভারদের, সবাই নেমে পড়ি, তারপর কাছাকাছি কোন হাসপাতালে চলে যাই...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'পিছনের এঞ্জিন থামলেও, সামনেরটা থামাবেন কিভাবে? প্রোটেকটিভ সুট পরা একশো মার্কিন সৈনিক আছে ট্রেনে, তাদের ওপর নির্দেশ আছে কোন অবস্থাতেই ট্রেন থামানো যাবে না। প্রয়োজনে গুলি করবে ওরা, তবু ট্রেন থামাতে দেবে না।'

'ট্রেন তো পাহাড়ে চড়ছে, গতি এখন একদম কম,' বলল সার্জেন্ট কক। 'প্যাসেঞ্জারদের বলুন জানালা ভেঙে নিচে লাফিয়ে পড়ুক।'

মাথা নাড়ল রানা। 'এমথ্রীএক্স ভাইরাস সম্পর্কে কিছু জানেন না, তাই এ-কথা বলতে পারছেন। ট্রেন থেকে আমরা নামলে ভাইরাসটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে, ফলে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে এক বিলিয়ন মানুষ সাফ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, প্রতিটি মহাদেশে এই রোগ ছড়াবে।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল কক।

'হাসপাতালে গিয়েও কোন লাভ নেই,' বলল রানা। 'কারণ মাল্টিপল এক্সএক্স-এর কোন প্রতিষেধক এদিকে আপনি পাবেন না।'

'এদিকে পাব না? তারমানে প্রতিষেধক আছে, কিন্তু অন্য কোথাও?'

সার্জেন্টের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে খুশি হলো রানা। 'হ্যাঁ, জেনেভাতে আছে—আমি জানি। কিন্তু কে আনবে? আনতে কতক্ষণ লাগবে?'

'ওহ্ গড!'

'এখন আর শুধু তাঁকে ডেকে কোন লাভ নেই,' বলল রানা। 'আসল কাজটা নিজেদেরকে করতে হবে—যদি বাঁচতে চাই।'

'আসল কাজ? কি সেটা?' ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চাইল কক।

'সেটা পরে জানতে পারবেন,' বলল রানা। 'তার আগে আপনাদের সবার সহযোগিতা দরকার আমার। পাব?'

রানার দিকে পাঁচ সেকেন্ড নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল সার্জেন্ট। 'আপনি কে?' চেলসির দিকেও তাকাল সে। 'ওঁকে চিনি বলে মনে হচ্ছে—চেলসি মেয়র না, বিখ্যাত রিপোর্টার?'

কথা না বলে চেলসি মাথা ঝাঁকাল।

'আমি মাসুদ রানা,' সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিল রানা, তারপর বলল, 'মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে। ওরা আমাদেরকে বাঁচাতে নয়, মেরে ফেলতে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনারা সবাই যদি আমাকে সাহায্য করেন, আমি একটা শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই...'

'মারা তো যাচ্ছিই, আপনার কথা শুনলে যদি বাঁচার সুযোগ পাই, কেন সাহায্য করব না?'

'তাহলে আপনার লোকদের ডাকুন,' নির্দেশ দিল রানা। 'ওদেরকে আশ্বস্ত করুন, বলুন, এই রোগের প্রতিষেধক আছে। আমার পরিচয় দিয়ে বলুন, মাসুদ রানা ট্রেন দখল করতে যাচ্ছে, তাকে যাহায্য করতে হবে।'

জানালা দিয়ে মুখ বের করে সিকিউরিটি পুলিসদের উদ্দেশে চিৎকার জুড়ে দিল সার্জেন্ট, 'ভয় পাবার কোন কারণ নেই। বাঁচার উপায় আছে! তোমরা একে একে এখানে চলে এসো…'

সাত

বেলা একটা।

পোস্টাল কমিউনিকেশন কার থেকে বহু চেষ্টা করেও রেডিও-টেলিফোনে জেনারেল লী মার্শালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হলো রানা। জেনারেল কানেকশন বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন, রানাকে এখন আর তাঁর দরকার নেই। এই মুহূর্তে সৈনিকদের লীডার মেজর মনরোর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি, নতুন কারে ফিট করা রেডিও-টেলিফোনে।

আতঙ্কিত মেজর রিপোর্ট করল, 'জেনারেল, প্রোটেকটিভ সুটে নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি আছে! কারণ আমরাও সংক্রমিত হয়েছি!'

'জানি,' মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির কমান্ড সেন্টার থেকে শান্ত গলায় বললেন জেনারেল। 'তাতে আতঙ্কিত হবার কিছুই নেই! ট্রেনের মাথায় পৌঁছে গেছে আপনাদের রিপ্লেসমেন্ট, চারটে হেলিকপ্টারে একশো নতুন সৈনিক, নতুন প্রোটেকটিভ সুট পরা…'

'জেনারেল, আপনার কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি না!'

'আপনারা ট্রেন থামান। কয়েকজন সৈনিককে পিছন দিকে পাঠিয়ে দিন, পিছনের এঞ্জিনের ড্রাইভারদের অস্ত্রের মুখে এঞ্জিন বন্ধ করতে বাধ্য করবে তারা। পুলিস বা অন্য কেউ বাধা দিলে গুলি করবেন,' বললেন জেনারেল। কমিউনিকেশন সিস্টেমের রেঞ্জে কুলাচ্ছে না, জেনেভা থেকে অনেক দূরে চলে গেছে ট্রেন।

'ট্রেন থামার পর সবাই আপনারা নেমে পড়বেন, হেঁটে চলে যাবেন আধ মাইল পিছনে। ওখানে আপনারা অপেক্ষা করবেন। হেলিকপ্টারগুলো নামবে ট্রেনের সামনে, নতুন সৈনিকরা আপনাদের ত্যাগ করা কার-এ উঠবে। তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া আছে, দুটো এঞ্জিনই দখল করে নেবে তারা। তাদেরকে বলা হয়েছে, সংক্রমিত কোন প্যাসেঞ্জার মারা গেলে লাশ রেখে না দিয়ে ফ্লেইমথ্রোয়ার দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

'খালি কপ্টারগুলো ট্রেন থেকে আধ মাইল দূরে এসে আপনাদেরকে তুলে নেবে, পৌঁছে দেবে কোয়ারানটিনে। চিকিৎসার সমস্ত আয়োজন করা হয়েছে, কথা দিচ্ছি সময় মত পৌঁছুতে পারলে আপনারা কেউ মারা যাবেন না। এটাই আপনার সঙ্গে আমার শেষ যোগাযোগ। আশা করি ট্রেন থামাবার গুরুত্ব আপনাকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।'

সৈনিকরা ট্রেন থামিয়ে পালিয়ে বাঁচার জন্যে ব্যস্ত, রানা বা স্বেচ্ছাসেবকদের

কর্মব্যস্ততার দিকে তাদের তেমন খেয়াল নেই। জানালা গলে মূল ট্রেন থেকে পিছনের কার হয়ে এঞ্জিন রূমে কয়েকজন সৈনিককে যেতে দেখল রানা, তবে কারণটা ঠিক বুঝতে পারল না।

পাঁচ মিনিট পরই থেমে গেল ট্রেন। পিছনের এঞ্জিনরূমে যারা গিয়েছিল আর করিডরে যে-সব সৈনিক পাহারায় ছিল তারা ব্রিজ হয়ে নিজেদের কার-এ ফিরে গেল। করিডর ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় কমপার্টমেন্ট থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে যাত্রীরা। তবে সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল স্বেচ্ছাসেবকরা, এখন তাদের সঙ্গে ফায়ার আর্মসও আছে, আছে চোদ্দজন সিকিউরিটি পুলিসের হাতে চোদ্দটা সাব-মেশিনগান।

ট্রেনের সামনে থেকে সৈনিকদের পালা বদলের পুরো ঘটনাটা ক্যামেরায় বন্দী করল চেলসি।

আধ ঘণ্টা পর আবার রওনা হলো ট্রেন। কানেকটিং ব্রিজের ওপারে, সামনের কারগুলোয় এখন নতুন সৈনিক। তাদের লীডার মেজর ডানহিল সবাইকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছে। প্রথম কাজ পিছনের লোকোমটিভ দখল করতে হবে।

বেলা দেড়টা। আর সাড়ে তিন ঘণ্টা পর সিনিস্টার ক্রসিঙে পৌঁছুবে ট্রেন।

রানার নির্দেশে সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করেছে স্বেচ্ছাসেবক দল, সিকিউরিটি পুলিস সহ তাদের সংখ্যা এখন পঞ্চাশজন। নতুন সৈনিকরা কানেকটিং ব্রিজ পেরিয়ে মূল ট্রেনে পজিশন নেয়ার আগেই কানেকটিং ব্রিজের এপারের তিনটে কার খালি করে ফেলা হয়েছে, সেগুলোয় লুকিয়ে আছে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকরা। সিনিস্টার ক্রসিঙে পৌঁছুবার আগে ট্রেন থামাতেই হবে; বলে দিয়েছে রানা, সেক্ষেত্রে যুদ্ধ একটা বাধবেই।

ট্রেনে অ্যাসেটিলিন মেশিন বা টর্চ পাওয়া গেছে, তবে সেটা ব্যবহার করার জন্যে কোন অপারেটর পাওয়া যায়নি। তারপর জানা গেল, নেলসন লোহা গলাবার এই মেশিন দু'একবার ব্যবহার করেছে। তাকে এক জোড়া কারের মাঝখানের কাপলিং গলাবার কাজ দেয়া হলো—কাজটা শেষ হলে মূল ট্রেনের তিনটে কার, কানেকটিং ব্রিজ আর পরে জোড়া লাগানো পাঁচটা কার সহ ডিজেল এঞ্জিনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

পিছনের এঞ্জিনের চারজন ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে এসেছে রানা, সঙ্গে ছিল সার্জেন্ট কক। রানার যুক্তি মেনে নিয়ে ড্রাইভাররা সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছে।

সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করার পর শুরু হলো রানার কাজ। পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের সাহায্যে প্রথমে প্যাসেঞ্জারদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখল ও। কোন কিছু গোপন না করে আসলে কি ঘটেছে এবং এখন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা পর কি ঘটতে যাচ্ছে সবই ব্যাখ্যা করল ও। সবশেষে জানাল, 'মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির নির্দেশে সিনিস্টার ক্রসিং থেকে নদীতে ফেলে দেয়া হবে ট্রেন। এই ভাইরাস পানিতে নির্জীব হয়ে থাকে, ফলে রোগটা তখন আর ছড়াতে পারবে না, কিন্তু আমরা যারা সংক্রমিত হয়েছি তারা কেউ বাঁচব না। বারোশো যাত্রীর মধ্যে

সাতশো এরইমধ্যে সংক্রমিত হয়েছি, তাদের মধ্যে মারা গেছে একশোজনের মত। বাকি পাঁচশো প্যাসেঞ্জারও আগামী সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে সংক্রমিত হবে, এবং চিকিৎসা না পেলে মারা যাবে।

'মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির জেনারেল লী মার্শালকে আমি বারবার বোঝাতে চেষ্টা করেছি, এই ভাইরাসের প্রতিষেধক কোথায় আছে আমি জানি, কিন্তু তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেননি।

'আপনাদেরকেও খোদার কসম খেয়ে বলছি, এই রোগের প্রতিষেধক সত্যিই আছে। আপনারা যদি আমার কথা বিশ্বাস করেন, ট্রেন থামাবার জন্যে স্বেচ্ছাসেবক দলকে সব রকম সাহায্য করুন। ট্রেন থামলে আমি একা নেমে যাব। কোথাও থেকে ফোন করে হু-র অঙ্গপ্রতিষ্ঠান "রেমিডি"-র সঙ্গে যোগাযোগ করব, বলব হেলিকপ্টারে করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ট্রেনে যেন প্রতিষেধক পৌঁছে দেয়া হয়। মাত্র দু'দিন আগে রেমিডির প্রধান বিজ্ঞানী ড. নাসিমুল গনির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে–তিনি আমাকে জানিয়েছেন এমথ্রীএক্স-এর প্রতিষেধক তাঁরা আবিষ্কার করেছেন।

'তবে আমি জানি না প্রতিষেধক পৌঁছুতে কতক্ষণ সময় লাগবে। প্রতিষেধক এসে পৌঁছানোর আগেই যদি ট্রেন সিনিস্টার ক্রসিঙে পৌঁছে যায়, কেউ আপনারা বাঁচবেন না! কাজেই আমি চলে যাবার পর যে-কোনও ভাবে ট্রেন থামিয়ে রাখতে হবে আপনাদের। আমার এই প্রস্তাবে আপনারা রাজি কিনা স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে আমাকে জানান।

'এবার প্রোটেকটিভ সুট পরা আমেরিকান সৈনিকদের উদ্দেশে কিছু বলতে চাই আমি। আগেই বলেছি, এমথ্রীএক্স ভাইরাসের কোন প্রতিষেধক মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির কাছে নেই, আর কারও কাছে আছে বলে তারা বিশ্বাসও করে না। আপনাদের আগে যে একশো সৈনিক ট্রেনের সামনে ছিল তারা সংক্রমিত হওয়ায় তাদের জায়গায় আপনাদেরকে পাঠানো হয়েছে। সংক্রমিত হওয়ায় ওরাও বাঁচবে না। বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, ওদেরকে ক্রেম্যাটরিয়মে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার জন্যে। আমি বলতে চাইছি, প্রোটেকটিভ সুটও এই ভাইরাস ঠেকাতে পারবে না–পাঁচ ঘণ্টা পর আপনারাও সংক্রমিত হবেন। তবে আমি জানি আপনাদের বলা হয়েছে প্রোটেকটিভ সুটগুলো অন্তত দশ ঘণ্টা ভাইরাস ঠেকিয়ে রাখতে পারে। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে আপনারাও মারা যাবেন। প্রোটেকটিভ সুট আপনাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

'ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে আপনাদের আমি অনুরোধ করছি, ট্রেন থামাতে আমাকে সাহায্য করুন। সামরিক কমান্ডের নির্দেশ অমান্য করলে আপনাদের কোর্ট মার্শাল হবে, আমি জানি। কিন্তু যদি প্রমাণ করা যায় মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আপনাদেরকে তারা ভুল বুঝিয়েছে, আর সবশেষে যদি দেখা যায় প্রতিষেধক পাওয়ায় প্যাসেঞ্জাররা সহ আপনারা সবাই বেঁচে আছেন, তাহলে কি হবে? তখন আপনাদের নয়, কোর্ট মার্শাল হবে জেনারেল লী মার্শালের, পেন্টাগন থেকে তাঁকে যারা বুদ্ধি-পরামর্শ যুগিয়েছে, তাদের। প্রয়োজন

হলে ট্রেনের সমস্ত যাত্রী এবং আমি নিজে আপনাদের পক্ষে সাক্ষী দেব।

'আমি আপনাদের সিদ্ধান্ত জানার অপেক্ষায় আছি,' বলে বক্তব্য শেষ করল রানা।

প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হলো, তবে সেটা বোমা বিস্ফোরণের মতই তীব্র। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ও বর্ণবাদী কিছু জার্মান ও পশ্চিম ইউরোপের কিছু লোক রানার একটা কথাও বিশ্বাস করল না। ন্যাটো আর যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা স্বগোত্রীয় বারোশো প্যাসেঞ্জারকে মেরে ফেলতে চাইছে, এটা অশ্বেতাঙ্গ মাসুদ রানার উদ্ভট কল্পনা বলে ধরে নিল তারা, কেউ কেউ এমনকি এর মধ্যে রানার অশুভ কোন ষড়যন্ত্র আছে বলেও সন্দেহ করল।

ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যাদের আপনজন বা বন্ধু-বান্ধব মারা গেছে তারা প্রায় সবাই রানার কথা বিশ্বাস করল, বিশ্বাস করল বেশিরভাগ সংক্রমিত ব্যক্তিও। তবে তাদের মনেও সন্দেহ আর প্রশ্ন কম নয়। মাসুদ রানা বলছে না কেন কোথায় পাওয়া যাবে এমথ্রীএক্স-এর প্রতিষেধক? সেটা ট্রেনে নিয়ে আসতে কতক্ষণ লাগবে, সেটাই বা কেন গোপন করে যাচ্ছে?

স্বেচ্ছাসেবকরা এ-সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। ভাইরাসের প্রতিষেধক আছে জেনেভায়। ট্রেন থেকে নেমে গিয়ে রানা ফোন করলে হেলিকপ্টারে করে পাঠানো হবে।

ব্যাপারটা কেউ বিশ্বাস করল না। জেনেভা থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরে সরে এসেছে ট্রেন, সময় লেগেছে সাড়ে তেরো ঘণ্টা। হেলিকপ্টারে করে জেনেভা থেকে প্রতিষেধক আনতেও ওই রকম সময় লাগবে। অথচ ট্রেন সিনিস্টার ক্রসিঙে পৌঁছুতে সময় লাগবে আর মাত্র তিন ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট।

স্বেচ্ছাসেবকরা জবাব দিল, সেজন্যেই তো মাসুদ রানা ট্রেন থামিয়ে রাখার অনুরোধ করেছেন। বাঁচার এই একটাই উপায়, প্রতিষেধক নিয়ে রানা ফিরে না আসা পর্যন্ত ট্রেনটাকে সিনিস্টার ক্রসিঙে পৌঁছুতে দেয়া যাবে না।

ট্রেনের প্রতিটি কমপার্টমেন্টে যখন হুলস্থূল কাণ্ড চলছে, কানেকটিং ব্রিজের ওপার থেকে মার্কিন সৈনিকদের কমান্ডার মেজর ডানহিল নিজেদের অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে ঘোষণা করল, 'মেজর মাসুদ রানা, মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে আপনাকে অ্যারেস্ট করার নির্দেশ দিচ্ছি আমি। স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করলে ভাল, আপনাকে শুধু আমরা বন্দী করে রাখব। কিন্তু বাধা দিলে গুলি করা হবে।'

কানেকটিং ব্রিজের ওপর দশজন সৈনিককে দেখা গেল, প্রত্যেকে হেলমেট আর মাস্ক সহ প্রোটেকটিভ সুট পরে আছে, সবার হাতে একটা করে সাব-মেশিনগান, কোমরে অটোমেটিক পিস্তল আর ফ্লেইমথ্রোয়ার। মারমুখো ভঙ্গি, অস্ত্র বাগিয়ে ধরে সাবধানে মূল ট্রেনে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা।

মূল ট্রেনের তিনটে কার আগেই খালি করা হয়েছে, সেখানে পজিশন নিয়েছে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকরা। প্রকৃত পরিস্থিতি প্রকাশ করার পর কি ঘটতে পারে তা আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিল রানা, তাই প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়ে রেখেছে। ফলে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল সশস্ত্র প্রতিরোধ। কানেকটিং ব্রিজ পেরিয়ে

ইস্পাতের দরজা খুলে মূল ট্রেনে পা রাখল মার্কিন সৈন্যরা, দেখতে পেয়েই স্বেচ্ছাসেবকরা খালি কারগুলোর কমপার্টমেন্টের দরজা থেকে গুলি করল। প্রেশারাইজ অ্যাটমস্ফিয়ার ভেদ করে ছোটার সময় প্রতিটি বুলেট আগুনের একেকটা গোলায় পরিণত হলো।

দশজন সৈনিকের মধ্যে ছ'জনই মারা গেল, চোখের পলকে তাদের সুটে আগুন ধরে গেল। বাকি চারজন পিছিয়ে গেল ভয়ে।

পাঁচ মিনিট পর নতুন করে শুরু হলো হামলা। এবার মার্কিন সৈনিকরা গ্রেনেড চার্জ করল। কানেকটিং ব্রিজ পেরিয়ে মূল ট্রেনে চলে এসেছে তারা, সংখ্যায় বারোজন। গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো মূল ট্রেনের করিডরে, ফলে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ফায়ার এক্সটিংগুইশার নিয়ে ছুটে এল একদল সৈনিক, আগুন নেভাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল তারা।

তিনটে খালি কারের প্রথমটায় রয়েছে রানা, দ্বিতীয় কমপার্টমেন্টে ওর নির্দেশে স্বেচ্ছাসেবকরা কেউ গুলি করছে না, সবাই যার যার কমপার্টমেন্টের দরজা বন্ধ করে দিয়ে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় আছে।

ডোনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তার চোখ। মুখের ভেতর এত ফুলে উঠেছে জিভ, সারাক্ষণ হাঁ করে থাকতে বাধ্য হচ্ছে বেচারি। চোখের কোণ বেয়ে রক্তও গড়াচ্ছে।

কমপার্টমেন্টের দরজা খোলার সময় নিষ্পাপ বাচ্চা মেয়েটাকে অকথ্য ভাষায় গাল দিচ্ছে প্রিস্ট, 'তোর মা বেশ্যা ছিল! তুই আমাকে ডোবালি!' দরজা খুলে ডোনাকে করিডরে ঠেলে দিল সে, পরমুহূর্তে আবার বন্ধ করে দিল দরজা।

পিস্তলের বাঁট দিয়ে জানালা ভাঙছে সে। আগেই খানিকটা ভেঙে রেখেছিল, বাকিটুকু ভাঙতে খুব বেশি সময় লাগল না। ট্রেন এখনও ঢাল বেয়ে পাহাড়ের ওপর উঠছে, গতি তেমন বেশি নয়। জানালা গলে নিচে লাফ দিল প্রিস্ট।

মার্কিন সৈনিকদের কয়েকজন স্নাইপার তাদের কার-এর ছাদ থেকে নজর রাখছিল ট্রেনের দু'দিকে। প্রিস্টকে তারা ট্রেন থেকে নিচে লাফিয়ে পড়তে দেখল। একসঙ্গে গুলি করল সৈনিকরা। ট্রেন থেকে মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝরা হয়ে গেল ভুয়া প্রিস্ট।

খালি প্রথম কারের করিডর ধরে এগোচ্ছে মার্কিন সৈনিকরা, অত্যন্ত সাবধানে। গ্রেনেড ফাটাবার পর প্রতিপক্ষ পাল্টা গুলি করেনি, ফলে তারাও আর অস্ত্র বা গ্রেনেড ব্যবহার করছে না। দরজা ভেঙে প্রথম কারের প্রথম কমপার্টমেন্টে ঢুকল তারা, ভেতরে কাউকে দেখতে পেল না। করিডরে বেরিয়ে এসে এক সঙ্গে নয়, দু'জন দু'জন করে এগোচ্ছে তারা।

সামনে প্রথম কারের দ্বিতীয় কমপার্টমেন্ট। করিডরে দাঁড়িয়ে পড়ল দশজন, বাকি দু'জন ভেতরে ঢুকবে। কিন্তু কমপার্টমেন্টের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। গুলি করলে বা গ্রেনেড চার্জ করলে আবার আগুন ধরে যাবে, সঙ্গে চাবিও নেই যে বাইরে থেকে তালা খুলবে, কাজেই বাধ্য হয়ে গায়ের জোরে দরজা ভাঙার চেষ্টা

করছে তারা।

কাজটায় অনেকেই হাত লাগাল। সৈনিকরা এক জায়গায় জড়ো হয়েছে, কমপার্টমেন্টের ভেতর থেকে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরে সাব-মেশিনগান থেকে এক পশলা গুলি করল রানা।

পাঁচজন সৈনিক গুলি খেলো, পরমুহূর্তে পাঁচজনই পরিণত হলো জ্বলন্ত মশালে। বাকি সাতজন ছিটকে দূরে সরে গেল—না পারছে গুলি করতে, না পারছে গ্রেনেড চার্জ করতে। কানেকটিং ব্রিজের দরজা খুলে মূল ট্রেন থেকে বেরিয়ে গেল তারা, দরজাটাও বন্ধ করে দিল।

মেজর ডানহিল রেডিও-টেলিফোন হাতে নিয়ে চিৎকার করছে, কিন্তু অপরপ্রান্ত অর্থাৎ মেগাডেথ প্রিভেনশন কমিটির কমান্ড সেন্টার থেকে কোন সাড়া পাচ্ছে না। 'জেনারেল, মেজর মাসুদ রানার নেতৃত্বে ট্রেনের প্যাসেঞ্জাররা বিদ্রোহ করেছে। ট্রেন তারা দখল করে নিয়েছে, কানেকটিং ব্রিজ পেরিয়ে মূল ট্রেনে আমরা ঢুকতেই পারছি না। এখন কি করব বলে দিন!'

কোন সাড়া নেই।

রিসিভার নামিয়ে রেখে দুই মিনিট পায়চারি করল মেজর ডানহিল। তারপর অ্যাড্রেস সিস্টেমের সামনে থামল, মাইক্রোফোনের মাউথপীসটা হাতে নিয়ে মুখের সামনে আনল। 'মেজর মাসুদ রানা,' হিসহিস করে বলল সে। 'আধ ঘণ্টা সময় দেয়া হলো আপনাকে। এরমধ্যে আপনি যদি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করেন, মূল ট্রেনে আমরা আগুন ধরিয়ে দেব। প্যাসেঞ্জাররা সবাই পুড়ে মারা যাবে, এবং সেজন্যে একা আপনি দায়ী থাকবেন। প্যাসেঞ্জারদের বলছি, মাসুদ রানা আপনাদের সঙ্গে বেঈমানী করছে। তার কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না। এই ভাইরাসের প্রতিষেধক আছে, পোল্যান্ডে আপনাদের জন্যে কোয়ারানটিন সাইট তৈরি করা হয়েছে। আমি আপনাদেরকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, সময় মত চিকিৎসা পেলে সবাই সুস্থ হয়ে উঠবেন, একজনও মারা যাবেন না। যেভাবে পারেন, মাসুদ রানা আর তার লোকজনকে নিরস্ত্র করুন। তা না হলে সবাইকে পুড়ে মরতে হবে।'

মেজর ডানহিলের বক্তব্য প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করল। সন্দেহের দোলায় দুলছে, জানে না কার কথা বিশ্বাস করবে। দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল তারা, একদল রানার বক্তব্য সত্যি বলে মানতে রাজি, আরেক দল রানার বিরুদ্ধে চলে গেল। যারা বিরুদ্ধে তারা রীতিমত হিংস্র হয়ে উঠল। রানাকে তারা খুঁজছে, হাতের কাছে পেলে স্রেফ খুন করে ফেলবে।

ট্রেন এখনও ঢাল বেয়ে উঠছে। ইচ্ছে করলে একটা দরজা বা জানালা ভেঙে নিচে লাফিয়ে পড়তে পারে রানা। ইতিমধ্যে দুটো বেজে গেছে, আর মাত্র তিন ঘণ্টা পর সিনিস্টার ক্রসিঙে পৌঁছে যাবে ট্রেন।

'ওরা সত্যি ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেবে,' চেলসিকে বলল রানা, করিডর ধরে

এইমাত্র ডোনাকে নিয়ে রানার কাছে চলে এসেছে সে। কমপার্টমেন্টে ওদের সঙ্গে সন্দেশা, হাসান, ভেনাস, সাতজন পুলিস আর ফগেল রয়েছে। ফগেল এইমাত্র ভেতরে ঢুকল। তার সঙ্গে আরও ছয়-সাতজন প্যাসেঞ্জার এসেছে, কমপার্টমেন্টে না ঢুকে বাইরে অপেক্ষা করছে তারা।

'এখন কি করা?' সন্দেশা জানতে চাইল। ইতিমধ্যে সে-ও সংক্রমিত হয়েছে। সংক্রমিত হয়নি এমন প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এখন পাওয়াই কঠিন।

ফগেল বলল, 'আমরা বেশিরভাগ প্যাসেঞ্জারই কোয়ারানটিনে যেতে চাই। ওদের সবার তরফ থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছে।' রানার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে সে। 'মেজর রানা, আপনি সারেন্ডার করুন।' হঠাৎ তার হাতে একটা অটোমেটিক পিস্তল বেরিয়ে এল।

'সাবধান!' চেঁচিয়ে উঠল হাসান। 'গুলি করলে কমপার্টমেন্টে আগুন ধরে যাবে!'

'যায় যাক!' হিসহিস করে উঠল ফগেল, রানার কপালে পিস্তল তাক করেছে সে। 'হয় সারেন্ডার করুন, তা না হলে গুলি খেয়ে মরুন।'

দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে আরও ছয়-সাতজন ভেতরে ঢুকে পড়ল, প্রত্যেকের হাতে লোহার রড বা ছোরা।

'আপনারা শান্ত হন,' নরম সুরে বলল রানা। 'আগেই বলেছি, এই ভাইরাসের প্রতিষেধক কোথায় আছে আমি জানি...'

'জানেনই যদি, বলছেন না কেন কোথায় আছে?' খেঁকিয়ে উঠল ফগেল।

'জেনেভায় আছে,' বলল রানা।

'জেনেভা থেকে কত দূরে চলে এসেছি, সে খেয়াল আছে?' ফগেলের পিছন থেকে বলল একজন। 'ওখান থেকে প্রতিষেধক আনতে কতক্ষণ লাগবে হিসেব করেছেন?'

'হ্যাঁ, অনেক সময় লেগে যাবে,' বলল রানা। 'সেজন্যেই তো ট্রেন দাঁড় করিয়ে রাখার কথা বলেছি আমি।'

'চাইলেই কি ট্রেন দাঁড় করাতে পারব আমরা?' ম্লান সুরে বলল সন্দেশা, সে-ও রানার ওপর আস্থা রাখতে পারছে না।

'আমার একটা প্ল্যান আছে,' বলল রানা। 'আপনারা সবাই সহযোগিতা করলে ট্রেন দাঁড় করিয়ে রাখা সম্ভব।'

'কি প্ল্যান? আমাদেরকে জানান!' আবার খেঁকিয়ে উঠল ফগেল। 'তাছাড়া, আপনার কথা কেন আমরা বিশ্বাস করব? সৈন্যরাও তো বলছে, আমাদের জন্যে কোয়ারানটিনের ব্যবস্থা...'

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ক্রাইচেক, হাত ও মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। বাইরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিল। ফগেলের পিছন থেকে সে হঠাৎ হেসে উঠল। ফগেল বোকা নয়, ক্রাইচেকের হাসি শুনেও এক চুল নড়ল না, হাতের পিস্তল এখনও রানার কপালে তাক করে রেখেছে।

'কে হাসে?' জানতে চাইল সে।

'আমি, তোমার দোস্ত,' বলল ক্রাইচেক। 'ট্রেন দাঁড় করিয়ে রাখার প্ল্যানটা

আমি জানি, কারণ আমি স্বেচ্ছাসেবকদের একজন। তুমি জানো না, কারণ তুমি আমাদের দলে নাম লেখাওনি। তোমার অসমাপ্ত প্রশ্নের উত্তরে বলছি, মার্কিন সৈনিকদের মেজর মিথ্যে কথা বলছে—ওদের কাছে প্রতিষেধক নেই।'

'তোমার লেকচার শোনার সময় নেই আমার,' বলল ফগেল। 'হয় মাসুদ রানাকে সারেন্ডার করতে হবে, তা না হলে গুলি খেয়ে মরতে হবে...'

রানার ইঙ্গিতে হাসান আর সুইডিশ ছাত্রদের কয়েকজন ফায়ার এক্সটিংগুইশার নিয়ে তৈরি হলো।

ক্রাইচেক আবার হেসে উঠল, বলল, 'ওগুলোর দরকার হবে না, অন্তত এখুনি নয়। ও হে, ফগেল, তুমি বোকার মত ভুল করছ। ওই পিস্তল আমি তোমার কাছে বিক্রি করেছি। আমিও জানি, তুমিও জানো—ওটা একটা খেলনা পিস্তল!'

'এটা সেটা নয়,' বলে অকস্মাৎ ঘুরল ফগেল, ক্রাইচেকের বুকে পিস্তলের মাজল ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দিল।

চোখের পলকে জ্বলন্ত মশালে পরিণত হলো ক্রাইচেক। আগুন নেভাবার সরঞ্জাম নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কয়েকজন, আগুনটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিভেও গেল, কিন্তু ক্রাইচেককে বাঁচানো গেল না—বুলেটটা তার হৃৎপিণ্ড ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। ফগেলকে কোন সুযোগ দেয়নি রানা, ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে পিস্তলটা। বাকি সবাই তার সঙ্গীদেরও নিরস্ত্র করল।

হাতঘড়ি দেখল রানা, কব্জির চামড়া নরম কাদার মত হয়ে গেছে। ও কি বলে শোনার জন্যে অস্থির ব্যাকুলতা নিয়ে অপেক্ষা করছে সবাই। 'প্যাসেঞ্জাররা আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে,' বলল ও। 'গায়ের জোরে বা অস্ত্রের মুখে ওদের সমর্থন আদায় করা সম্ভব নয়।'

'না,' ফিসফিস করল চেলসি। 'সম্ভব নয়।'

'ওদের অ্যাকটিভ সাপোর্ট ছাড়া ট্রেন থামানো, থামানোর পর দাঁড় করিয়ে রাখাও অসম্ভব,' বলল রানা।

'হ্যাঁ,' সায় দিল চেলসি, ঘন ঘন চোখ আর মুখের রক্ত মোছায় হাতের রুমালটা ভিজে জবজবে হয়ে গেছে।

'জেনেভা থেকে প্রতিষেধক আসতে দশ-বারো ঘণ্টাও লেগে যেতে পারে,' রানার ঘড়ঘড়ে, বেসুরো গলায় হতাশা। 'ট্রেন দাঁড় করিয়ে রাখতে না পারলে ফিরে এসে দেখব অনেক আগেই সিনিস্টার ব্রিজ থেকে নদীতে পড়ে গেছে ট্রেন।'

ভেনাস আর সন্দেশা কেঁদে ফেলল।

'প্যাসেঞ্জারদের মুখোমুখি হব আমি,' বলল রানা, 'ওরা যদি ট্রেন থামাতে সাহায্য করতে রাজি না হয়, আমি প্রতিষেধক আনতে পারলেও কোন লাভ হবে না।'

'না, মাসুদ ভাই!' প্রতিবাদ করল হাসান। 'ওরা আপনাকে দেখা মাত্র মেরে ফেলবে।'

'হ্যাঁ, সাংঘাতিক খেপে আছে সবাই...'

'এ ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই,' বলল রানা, হাতের সাব-মেশিনগানটা হাসানের হাতে ধরিয়ে দিল। 'খালি হাতে যাব আমি।'

'কিন্তু ওরা যদি আপনার যুক্তি না মানে?'

'সেক্ষেত্রে ট্রেনে তোমাদের সঙ্গেই থাকব আমি,' বলল রানা। 'কোথাও যাব না।'

'মানুষগুলো বোকামি করবে, আর তাদের বোকামির জন্যে আমরা সবাই মারা যাব?' চেলসি টলছে দেখে তাকে ধরে ফেলল ভেনাস, দু'জনেই জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

মাথা নাড়ল রানা। 'ভেবেছিলাম চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে যাব আমি,' বলল ও। 'তারপর প্যাসেঞ্জারদের সাহায্য নিয়ে আপনারা ট্রেন থামাবেন। কিন্তু প্যাসেঞ্জাররা যেভাবে খেপে উঠেছে, এখন আর তা সম্ভব নয়। প্রথমে হয় ট্রেন থামাতে হবে, তা না হলে মূল ট্রেনের তিনটে কার সহ সামনের অংশ আলাদা করে ফেলতে হবে। দুটোর যে-কোন একটা ঘটুক, তারপর আমি প্রতিষেধক আনতে যাব।' কমপার্টমেন্ট ছেড়ে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। ওর পিছু নিল কয়েকজন, হাত নেড়ে তাদেরকে নিষেধ করল ও।

আট

রানা নিষেধ করা সত্ত্বেও চেলসি, ভেনাস, হাসান আর দু'জন সুইডিশ ছাত্র রানার পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল কমপার্টমেন্ট থেকে। হামলা হলে ঠেকাবার জন্যে সাতজন পুলিস থাকল কমপার্টমেন্টে, ওদের সঙ্গে ডোনাও আছে।

খালি তিনটে কার-এর শেষটায় ঢুকল ওরা। শেষ কার-এর শেষ কমপার্টমেন্ট থেকে দরজা খুলে বেরুলে একটা ডায়াফ্র্যাম কানেকটিং ব্রিজে পৌঁছানো যায়, পরবর্তী কার-এর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছে ব্রিজটা। দরজার সামনে হাতে অ্যাসেটিলিন টর্চ নিয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে নেলসন, পাশে এরিকার হবু বর কার্লসন। আরও কয়েকজন প্যাসেঞ্জারও রয়েছে, সবাই বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে নেলসনের দিকে।

রানাকে দেখে নেলসন প্রায় কেঁদে ফেলল। 'মি. রানা, টর্চটা কাজ করছে না!' হাঁপাচ্ছে সে। 'এদিকে আরেক বিপদ—ব্রিজের ওপারে প্যাসেঞ্জাররা জড়ো হয়েছে, আপনাকে চাইছে তারা, বলছে খুন করে ফেলবে...'

কথা না বলে ডায়াফ্র্যামের দরজাটা খুলল রানা। ব্রিজ পেরিয়ে অপরপ্রান্তের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, সেটা খুলে সামান্য একটু ফাঁক করল। দরজার ওদিকের করিডরে গিজগিজ করছে প্যাসেঞ্জার, রানাকে দেখতে পেয়ে মারমুখো হয়ে তেড়ে এল তারা। দরজা পুরোপুরি খুলে ট্রাফিক পুলিসের মত হাত তুলে তাদেরকে থামার ইঙ্গিত দিল রানা। 'আমি নিরস্ত্র, বিশ্বাস না হলে সার্চ করে দেখতে পারেন,' শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল ও। 'আমি জানি, আমার কথা আপনারা সবাই বিশ্বাস করতে পারছেন না। নতুন করে আপনাদেরকে আমার কিছু বলারও নেই।' হাতঘড়ি দেখল ও। 'আমি শুধু একটা অনুরোধ করব। মেজর

ডানহিল বলেছে আমি সারেন্ডার না করলে আধ ঘণ্টা পর ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেবে সে। আমার অনুরোধ, আপনারা আর বিশ মিনিট অপেক্ষা করুন। বিশ মিনিট পর তার দেয়া সময়সীমা পার হয়ে যাবে। তখন যদি ওরা ট্রেনে আগুন ধরাতে আসে, আমি কথা দিচ্ছি নিজেকে ওদের হাতে তুলে দেব।

'আপনারা আমাকে জিম্মি করে রাখুন। এখন থেকে ঠিক বিশ মিনিট পর, ট্রেনে যদি আগুন লাগাতে শুরু করে ওরা, আমাকে ধরে ওদের হাতে তুলে দেবেন–কিংবা নিজেরাই এখানে আমাকে খুন করবেন। আমার এই ছোট্ট একটা অনুরোধ আপনারা রাখবেন না?'

প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। তারপর একজন জিজ্ঞেস করল, 'তারমানে আপনার ধারণা, মেজর ডানহিল মিথ্যে হুমকি দিয়েছেন? আপনি সারেন্ডার না করলেও ওরা ট্রেনে আগুন লাগাবে না?'

'নিজেদের কল্পনাশক্তি ব্যবহার করুন,' নরম সুরে বলল রানা। 'এক হাজারের ওপর যাত্রী, ট্রেনে আগুন দেয়া হলে তারা কি করবে? বলুন, কি করবেন আপনারা?' উত্তরের অপেক্ষায় পাঁচ সেকেন্ড থাকল ও, কিন্তু কেউ কথা বলছে না দেখে আবার নিজেই বলল, 'স্বভাবতই জানালা-দরজা ভেঙে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করবেন–তাই না?'

'হ্যাঁ!' এবার একসঙ্গে কয়েকজন বলে উঠল। 'অবশ্যই!'

'কিন্তু সেটা ওরা ঘটতে দেবে না। কারণ ওদের ওপর নির্দেশ আছে ট্রেন থেকে সংক্রমিত একজন লোকও যেন নামতে না পারে। অর্থাৎ ট্রেনে আগুন লাগানোর কথা যেটা বলা হয়েছে সেটা স্রেফ মিথ্যে একটা হুমকি।' আবার হাতঘড়ি দেখল রানা। 'আর আঠারো মিনিট পর আমার কথার সত্যতা আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন। আমি শুধু এই আঠারোটা মিনিট অপেক্ষা করতে বলছি আপনাদের।'

মারমুখো প্যাসেঞ্জাররা দ্বিধায় পড়ে গেল।

'আমার সঙ্গে আসুন,' বলে দরজার সামনে থেকে পিছিয়ে এল রানা। 'আমাকে ঘিরে রাখুন, আমি যাতে পালাতে না পারি।'

পিছিয়ে এসে ব্রিজের মাঝখানে থামল রানা। প্রতিপক্ষ প্যাসেঞ্জাররা অনেকেই হুড়মুড় করে ব্রিজে ঢুকে পড়ল। নেলসন, কার্লসন, চেলসি, ভেনাস, সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'নেলসন, সামনের করিডরে সৈনিকরা কয়েকটা ফ্লেইমথ্রোয়ার ফেলে গেছে, অন্তত একটা হলেও নিয়ে আসতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ছুটল নেলসন।

হাসানের হাত থেকে নিজের সাব-মেশিনগানটা চেয়ে নিল রানা। উপস্থিত সবাই যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে, তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কানেকটিং ব্রিজের মেঝেতে থেমে থেমে গুলি করল রানা, চারকোনা একটা নকশা তৈরি করছে ইস্পাতের প্লেটে। সবাই জানে স্টীল প্লেটের নিচেই আছে কাপলিং ডিভাইস, দুটো কারকে এক করে রেখেছে।

বুলেটে ঝাঁঝরা স্টীল প্লেট, চৌকো একটা টুকরো, সরিয়ে ফেলল রানা।

ওদের নিচে কাপলারটা দেখা যাচ্ছে। ওটা কয়েকটা স্টীল নাকল-এর সমষ্টি, তার নিচে মাটি আর ক্রস-টাই সগর্জনে এত দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে যে ঝাপসা একটা ঝলকের মত লাগছে দেখতে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল নেলসন, তার হাত থেকে ফ্লেইমথ্রোয়ারটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল রানা। কাপলিং ডিভাইসে তাক করল ওটা, বোতামে চাপ দিতেই চোখ-ধাঁধানো তীব্র নীল আগুন বিস্ফোরিত হলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিচের ইস্পাত টকটকে লাল হয়ে উঠল।

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'আর দু'মিনিট,' বলে হাসান আর ছাত্রদের দিকে তাকাল। 'একটা জানালা ভাঙো।' প্রতিপক্ষ প্যাসেঞ্জারদের দিকে ফিরে বলল, 'আপনাদের কয়েকজন সামনে চলে যান, যদি দেখেন সৈনিকরা ট্রেনে আগুন ধরাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, চিৎকার করে জানাবেন। এখানে আপনাদের বাকি লোকজন থাকুক, তারা তখন আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারবে–কেউ বাধা দেবে না। ঠিক আছে?'

কয়েকজন প্যাসেঞ্জার মাথা ঝাঁকিয়ে ট্রেনের সামনের দিকে ছুটল।

দু'মিনিট পার হয়ে গেল। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই। ইতিমধ্যে ব্রিজের একটা জানালা ভেঙে ফেলা হয়েছে। ট্রেনের সামনে থেকে কোন চিৎকার আসছে না। আরও দু'মিনিট অপেক্ষা করল রানা। তারপর বলল, 'এবার আমাকে যেতে হয়। ট্রেনের প্রতিটি প্যাসেঞ্জারকে বলে যাচ্ছি, ট্রেন দাঁড় করিয়ে রাখার দায়িত্ব আপনাদের সবার।'

কারও মুখে কথা নেই।

ম্যাপ থেকে চোখ তুলে চেলসি বলল, 'আর তিন মিনিট পর পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে যাবে ট্রেন। সেই সঙ্গে স্পীডও বাড়বে। নামলে এখনই, পরে আর সুযোগ পাবেন না।'

সন্দেশা বলল, 'কিন্তু, মাসুদ ভাই, নামলেই তো ছাদ থেকে গুলি করবে ওরা–প্রিস্টকে যেভাবে করেছিল।'

'আমরা এখন কোথায়?' চেলসিকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'ট্রেন থেকে নেমে কোনদিকে যাব? কোথায় পাব শহর বা টেলিফোন?'

'ঘড়িতে আড়াইটা বাজে,' বলল চেলসি। 'আর আড়াই ঘণ্টা পর সিনিস্টার ক্রসিঙে পৌঁছুবে ট্রেন, যদি থামাতে না পারি।' ম্যাপে একটা আঙুল রাখল সে, রানাকে দেখিয়ে বলল, 'আমরা সম্ভবত এখানে রয়েছি–জায়গাটার নাম ওয়াকাস। আপনি দক্ষিণ দিকে যাবেন, রেললাইনের দেড়-দু'মাইল দূরে একটা ওয়েদার স্টেশন আছে। আর কিছু পাবেন না–ম্যাপে দেখা যাচ্ছে গোটা এলাকা ফাঁকা। পাথুরে মাটি, লোকবসতি নেই...'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'নেলসন, চেলসি, হাসান–সবাই মন দিয়ে শুনুন,' বলল রানা। 'প্ল্যানটা আরেকবার মনে করিয়ে দিচ্ছি। স্বেচ্ছাসেবক ও সমস্ত প্যাসেঞ্জার, সবাই মিলে চেষ্টা করলে তবেই ট্রেন দাঁড় করিয়ে রাখা সম্ভব। আমি নেমে গেলে পিছনের এঞ্জিন রিভার্স করতে বলবেন ড্রাইভারদের। ব্যাপারটা রশি টানাটানির মত হবে–সামনের এঞ্জিন ট্রেনটাকে সামনে টানবে, পিছনেরটা পিছনে

টানবে। পাহাড় থেকে ঢাল বেয়ে নামার সময় এতে খুব একটা লাভ হবে না, তবে গতি কমিয়ে দেয়া যাবে। সামনে চড়াই-উৎরাই দুটোই পড়বে, কাজেই ঢাল বেয়ে ওঠার সময় সামনের এঞ্জিন যতই টান দিক, ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য।

'তখন সৈনিকরা আবার হামলা করতে আসবে। যাই ঘটুক, তারা যেন পিছনের এঞ্জিন দখল করতে না পারে।' সদ্য ভাঙা জানালার সামনে চলে এল রানা। 'বিদায়। তবে কথা দিচ্ছি, আমি ফিরে আসব—এমন কি প্রতিষেধক যদি নাও পাই।'

'আর দু'মিনিট পর পাহাড়ের মাথায় উঠবে ট্রেন,' বিড়বিড় করল চেলসি।

জানালা দিয়ে মাথা বের করে বাইরে তাকাল রানা। ওর কোমরে একটা ফ্লেইমথ্রোয়ার আর একটা পিস্তল গুঁজে দিল চেলসি। ট্রেনের গতি এখন খুবই কম। লাফ দিয়ে পড়লে হাড়গোড় ভাঙার তেমন আশঙ্কা নেই। তবে গুলি খাবার ভয় ষোলোআনাই আছে, কারণ সামনের একটা কার-এর মাথায় কয়েকজন সৈনিককে দেখা যাচ্ছে, ট্রেনের দু'দিকেই নজর রাখছে তারা।

জানালা থেকে লাফ দেয়ার আগে ইতস্তত করছে রানা। হাতে সাব-মেশিনগান। ভাবছে। কেন যাচ্ছে ও? গিয়ে কি লাভ? জেনেভা থেকে হাজার মাইল দূরে চলে এসেছে ট্রেন, সেখান থেকে রেমিডির প্রতিষেধক পৌঁছুতে সময় লাগবে কম করেও দশ থেকে বারো ঘণ্টা, অথচ ট্রেন সিনিস্টার ক্রসিঙে পৌঁছুবে আর মাত্র আড়াই ঘণ্টা পর। দক্ষ একদল মার্কিন সৈন্যের সঙ্গে চোদ্দজন সিকিউরিটি পুলিস আর পঞ্চাশজন অদক্ষ স্বেচ্ছাসেবক কতক্ষণ লড়তে পারবে?

ওকে ইতস্তত করতে দেখে পিছন থেকে চেলসি বলল, 'আমাকে সঙ্গে নেবেন, প্লীজ? আমাকে বা আর কাউকে? দু'মাইল হাঁটতে হবে, পথে যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন?'

'না। ঝুঁকির মাত্রা তাতে বাড়বে।' মাথা নাড়ল রানা।

রানাকে টেনে সরিয়ে আনল দু'জন পুলিস। 'স্যার, ছাদ থেকে ওরা আপনাকে গুলি করবে। তার আগে আমরা যদি গুলি করি, ওরা আড়াল নিতে বাধ্য হবে, সেই সুযোগে লাফ দেবেন আপনি।'

জানালা দিয়ে সাব-মেশিনগান বের করে ট্রেনের সামনের দিকে কার-এর ছাদ লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করল ওরা, ওদের ফাঁক গলে জানালার ফ্রেমে উঠল রানা, তারপর লাফিয়ে পড়ল মাটিতে।

ঢাল থেকে গড়িয়ে শুকনো একটা নালায় পড়ল রানা, সেটাই আড়াল হিসেবে কাজে লেগে গেল। সৈনিকরা ছাদ থেকে অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে গুলি করছে, একটাও লাগল না।

ঢালের গা থেকে পাহাড়ের মাথায় উঠে যাচ্ছে ট্রেন, একেবারে শম্বুকগতিতে। পিছনের ইলেকট্রিক এঞ্জিনের ড্রাইভাররা রানার নির্দেশ মত কাজ শুরু করেছে—রিভার্স করে দিয়েছে এঞ্জিন।

তবে দেরি হয়ে গেছে, পূর্ণ শক্তি ফিরে পেতে সময় নিচ্ছে এঞ্জিন। গতি কমলেও, ট্রেন পাহাড়ের মাথায় উঠে যাচ্ছে। সামনের ডিজেল এঞ্জিনের টান অনেক বেশি।

নালা থেকে উঠে এল রানা। জানে এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করা বোকামি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওয়েদার স্টেশনে পৌঁছুতে হবে ওকে, ফোন করতে হবে জেনেভায়, কি ঘটছে আর কি চাই সব কথা ব্যাখ্যা করে বলতে হবে ড. নাসিমুল গনিকে। প্রতিষেধক পাঠানোর জন্যে প্রস্তুতি নিতে তাঁরও অনেক সময় লাগবে। রানা জানে রেমিডি-র নিজস্ব হেলিকপ্টার আছে, তা থাকলেও ল্যাব থেকে বের করে প্রতিষেধক তুলতে হবে তাতে। কয়েকটা দেশ পার হয়ে পোল্যান্ডে পৌঁছুতে হলে রিফুয়েলিঙের জন্যে নামতে হবে কয়েক জায়গায়। সব মিলিয়ে হেলিকপ্টারের পৌঁছুতে সময় লেগে যেতে পারে পনেরো থেকে বিশ ঘণ্টা।

কোন যুক্তিই বলে না ট্রেন যাত্রীদের বাঁচানো সম্ভব। অথচ সবাইকে কথা দিয়ে এসেছে, প্রতিষেধক নিয়ে ফিরে আসবে। এমনকি প্রতিষেধক আনতে না পারলেও ফিরে আসবে। তিক্ত হেসে নিজেকে একটা গাল দিল রানা, শালা মিথ্যুক!

দেরি তো হয়েই গেছে, নাহয় আরও একটু হোক। অদ্ভুত হলেও সত্যি, রানা কোন ব্যস্ততা অনুভব করছে না। পরাজয় সুনিশ্চিত বলে জানে, সেটাই হয়তো কারণ।

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা ট্রেনটার দিকে। পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে অনেক সময় নিচ্ছে। তবে উঠল। পরম স্বস্তি আর আনন্দ অনুভব করল রানা। চূড়ায় ওঠার পর দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্রেন। সবটুকু নয়, ট্রেনের শেষ একটা কার আর এঞ্জিন রূমটা দেখতে পাচ্ছে ও। একচুল নড়ছে না।

দুই এঞ্জিনের মধ্যে শুরু হয়েছে টাগ-অভ-ওঅর।

কোত্থেকে যেন নতুন শক্তি ফিরে এল শরীরে, মনে জাগল নতুন আশা। রেললাইনের দিকে পিছন ফিরে ছুটল রানা, যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে। ছোটার মধ্যেই মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে, দেখে নিচ্ছে ট্রেনটাকে। সেই একই জায়গায় স্থির হয়ে রয়েছে ট্র্যান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেস।

ফাঁকা মাঠ, এখানে সেখানে পাতাবিহীন দু'চারটে গাছপালা, শুকনো নালা, মাথার ওপর নীল আকাশ, এছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। এক সময় পিছন ফিরে ট্রেনটাকে আর দেখতে পেল না রানা, দৃষ্টিসীমার বাইরে এখন সেটা।

ট্রেন থেকে নামার পর আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। সম্ভবত মাইলখানেক এগোতে পেরেছে রানা। অকস্মাৎ পায়ে কি যেন বিঁধল, তীব্র জ্বালা যেন আগুন ধরিয়ে দিল সারা শরীরে। নিজেকে সামলাতে পারল না, শিশুর মত ককিয়ে কেঁদে উঠল। দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাঁপাচ্ছে। পায়ের দিকে তাকাতে সানগ্লাসের ভেতর বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল। তিন গজ পিছনে পড়ে রয়েছে ডান পায়ের বুটটা। আবার নিজের পায়ে ফিরে এল দৃষ্টি। শুধু বুট নয়, বুটের সঙ্গে ডান পায়ের সবটুকু চামড়াও খসে গেছে। পায়ের তলা আর পায়ের পাতার ওপরে দেখা যাচ্ছে ত্বকবিহীন মাংস, দগদগে ঘায়ের মত লাল।

বসে পড়ল রানা। কাঁধ থেকে সাব-মেশিনগান নামিয়ে পাশে রাখল। কোমর থেকে ফ্লেইমথ্রোয়ার ও অটোমেটিক পিস্তলটাও বের করে আরেক পাশে রাখল।

গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে দিয়েছে চেলসি, ধীরে ধীরে খুলল সেটা। শার্ট খুলে ছিঁড়ল, কয়েকটা ফালি দিয়ে জড়াল ডান পা। তারপর, ধীরে ধীরে, বাঁ পায়ের বুটটা খুলতে চেষ্টা করল।

যতই সাবধান হোক, বুটের সঙ্গে বাঁ পায়ের চামড়াও উঠে এল। ছেঁড়া শার্টের বাকি ফালিগুলো দিয়ে এই পায়েও ব্যান্ডেজ বাঁধল। গায়ে গেঞ্জি আছে, সেটার দিকে তাকাতে ঘিন ঘিন করে উঠল শরীর। গায়ের চামড়া আলগা হয়ে খুলে এসেছে, সেঁটে আছে গেঞ্জির সঙ্গে। মাথা চুলকে ভাবছে গেঞ্জিটা গা থেকে খোলা উচিত হবে কিনা, কয়েক গাছি চুল উঠে এল হাতে।

সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, কথাটা প্রতি মুহূর্তে নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছে রানা। সাব-মেশিনগানটা নিল না। শুধু ফ্লেইমথ্রোয়ার আর পিস্তলটা নিয়ে সিধে হলো। পায়ের ব্যান্ডেজ যথেষ্ট পুরু নয়, এখন আর রানা ছুটতে পারছে না, হাঁটছেও টলতে টলতে। প্রথমে পিছিয়ে এসে ডান পায়ের বুটটা পোড়াল, তারপর দ্বিতীয়টা।

আরও আধ মাইল পেরিয়ে এল রানা। সময় লাগল প্রায় এক ঘণ্টা। শরীর আর চলতে চাইছে না। সামনে মৃত্যু এসে হাজির হলে বা চরম কোন বিপদে পড়লে মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে ডাকে, তাঁর রহমত কামনা করে–প্রচণ্ড রাগে উল্টোটা করছে রানা--তুই নির্মম! তোর দয়ামায়া বলে কিচ্ছু নেই!

পরমুহূর্তে শুরু হলো রক্তবমি। কিন্তু জেদ, থামবে না। বমি করলেই পিছিয়ে আসছে, মাটি আর ঘাস সব পুড়িয়ে দিচ্ছে ফ্লেইমথ্রোয়ারের আগুন দিয়ে।

তারপর সটান আছাড় খেয়ে পড়ে গেল কিংবদন্তীর নায়ক। পড়ার পর আর নড়ছে না।

পাহাড়ের ঢাল থেকে এদিকেই তাকিয়ে ছিল এক রাখাল, সঙ্গে দুটো ছাগল। রানাকে পড়ে যেতে দেখে ছুটল সে। ছাগল দুটোর গলায় বাঁধা রশি জোড়া মুঠোয় ধরে আছে।

মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির কমান্ড সেন্টারে টান টান উত্তেজনা, সদস্যরা সবাই একদৃষ্টে ওয়াল স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে। স্ক্রীনে প্রজেক্ট করা ম্যাপে ট্রেনের পজিশন স্পষ্ট লাল একটা বিন্দু। ঘড়িতে এই মুহূর্তে চারটে বাজে। তিনটে থেকেই ট্রেনের গতি কমে গেছে। পাহাড়ী ঢাল বেয়ে উঠতে হচ্ছে, সেটাই মন্থরগতির কারণ বলে ধরে নেয়া হয়েছিল। তারপর পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আসে ট্রেন, সেই সঙ্গে ট্রেন একেবারে অচল হয়ে পড়ে।

কমান্ড সেন্টারে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সবাই। রেডিও-টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অনেক আগেই, ট্রেনে কি ঘটছে জানার কোন উপায় নেই। রিমোট সেনসিং ডিভাইস শুধু ট্রেনের পজিশন জানাতে পারছে।

পাফ এরিকসন ফিসফিস করে জানতে চাইলেন, 'দুটো এঞ্জিন, তাই না? কোন্টার শক্তি বেশি?'

অস্থির উত্তেজনায় পায়চারি করছেন জেনারেল লী মার্শাল। 'পিছনেরটা ইলেকট্রিক এঞ্জিন, সামনেরটা ডিজেল। শক্তি দুটোরই সমান।'

'মাসুদ রানা পিছনের এঞ্জিন দখল করে নিয়েছে, প্যাসেঞ্জারদের সাহায্যে,' বললেন পাফ। 'দুই এঞ্জিনের মধ্যে টাগ-অভ-ওঅর শুরু হয়েছে।' হাতঘড়ি দেখলেন। 'সিনিস্টার ক্রসিং আর পঞ্চাশ মাইল দূরে। আমাদের হিসাব অনুসারে পাঁচটা তেরো মিনিটে ট্রেন ব্রিজে উঠবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, এখন থেকে এক ঘণ্টা বারো মিনিট পর,' বললেন জেনারেল। 'কিন্তু আদৌ কি ট্রেনটা সিনিস্টার ক্রসিঙে পৌঁছুবে? ট্রেন থেমে আছে, ইতিমধ্যে যদি প্যাসেঞ্জাররা নিচে লাফিয়ে পড়ে থাকে—কেয়ামত নেমে আসবে! আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সাফ হয়ে যাবে দুনিয়ার মানুষ!'

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল পাফ এরিকসনের চেহারা। 'জেনারেল! পিছনের এঞ্জিন বিদ্যুতের সাহায্যে চলছে, তাই না? রেললাইনের পাশের ইলেকট্রিক লাইন থেকে পাওয়ার সাপ্লাই পাচ্ছে এঞ্জিনটা, ঠিক? সৈনিকরা ছাদে উঠে লাইন কেটে দিলেই তো পারে, পিছনের এঞ্জিন সঙ্গে সঙ্গে অচল হয়ে পড়বে।'

পায়চারি থামিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন জেনারেল, 'ওহ্ গড!' তাই তো পরমুহূর্তে হতাশায় চুপসে গেলেন। 'কিন্তু মেজর ডান হিলকে বুদ্ধিটা দেবে কে?'

পাফ এরিকসন আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'এটা তো অত্যন্ত সাধারণ একটা বুদ্ধি, এক সময় তিনি নিজেই বুঝতে পারবেন।'

পাহাড়ের চূড়া তিনমাইল দীর্ঘ, পুরোটাই সমতল, তারপর আবার শুরু হয়েছে ঢাল, নেমে গেছে বিশাল এক উপত্যকায়। উপত্যকার শেষে আবার একটা পাহাড়, ওটাই শেষ, তারপরই সিনিস্টার ক্রসিং আর সতেরো মাইল দূরে থাকবে।

চূড়ায় ওঠার পর প্রথম এক ঘণ্টা দুই এঞ্জিনের টাগ-অভ-ওঅর কেউ হারেনি বা কেউ জেতেনি। পিছনের এঞ্জিন ট্রেনটাকে পিছন দিকে টানছে, সামনেরটা সামনের দিকে ধাতব তর্জন-গর্জনই সার—প্রায় স্থির হয়ে আছে ট্রেন, কারণ দুটো এঞ্জিনের শক্তিই সমান।

তবে মাঝে মধ্যে কারেন্ট ফ্লাকচিউয়েট করল, তখন ডিজেল এঞ্জিন ট্রেনটাকে খানিকটা টেনে নিল সামনের দিকে। এভাবে কিছুক্ষণ পর পর কারেন্ট সাপ্লাইয়ের বিঘ্ন ঘটায় তিন মাইল সমতল রেলপথ ধরে একটু একটু করে এগোচ্ছে ট্রেন। সমতল পথটুকু পার হতে পারলেই সামনের ডিজেল এঞ্জিন জিতে যাবে, পিছনের এঞ্জিনের সাধ্য নেই ট্রেনটাকে ঢাল থেকে নিচে নামতে বাধা দেয়।

সংযোগ লাইন কেটে দিয়ে ইলেকট্রিক সাপ্লাই বন্ধ করে দেয়া হতে পারে, এই আশংকা ট্রেনে প্রথম জাগে চেলসির মাথায়। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে যারা সাব-মেশিনগান চালাতে জানে তাদের ছ'জনকে ইলেকট্রিক লোকোমটিভের মাথায় তুলে দেয়া হয়েছে। ব্যাগেজ কমপার্টমেন্ট থেকে কয়েকটা ময়দার বস্তাও নিয়ে গেছে তারা, ট্রেনের সামনে থেকে মার্কিন সৈনিকরা গুলি করলে ওগুলোকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

ডাক্তারদের পরামর্শে বেশিরভাগ প্যাসেঞ্জার কাপড়চোপড় খুলে ফেলেছে, কারণ কাপড়ের ঘষা লাগায় গায়ের চামড়া উঠে আসছিল। নারী-পুরুষ কেউই লজ্জা পাচ্ছে না, প্রায় সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে যে-যার কমপার্টমেন্টে বসে

ঈশ্বরকে ডাকছে।

চেলসির মাথা থেকে খানিক পরপর একটা করে বুদ্ধি গজাচ্ছে। সন্দেশাকে সে বলল, 'রানা যখন হেলিকপ্টার নিয়ে ফিরে আসবেন তখন যদি ট্রেন চলন্ত অবস্থায় থাকে, উনি ল্যান্ড করবেন কোথায়?'

'ল্যান্ড করতেই হবে? হেলিকপ্টার থেকে রশির মই বেয়েও তো নামা যায়,' উত্তর দিল সন্দেশা।

'নামলে ছাদে নামবে, তাই না? ছাদ থেকে ট্রেনে ঢুকবে কিভাবে, বিশেষ করে তখন যদি ট্রেনে সৈনিকদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকদের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়?'

চেলসির কথা শেষ হতে যা দেরি, ছুটে এসে হাসান খবর দিল, 'সৈন্যরা আবার মূল ট্রেনে ঢোকার চেষ্টা করছে।'

তারপরই শোনা গেল গোলাগুলির বিরতিহীন গর্জন। কমপার্টমেন্ট থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল হাসান।

নেলসন আর কার্লসন ডায়াফ্রাম কানেকটিং ব্রিজের কাপলিং খোলার কাজে ব্যস্ত। হাসানকে ছুটে যেতে দেখে নেলসন চিৎকার করে বলল, 'যেভাবে পারো সৈন্যদের ঠেকাও! দরকার হলে ফ্লেইমথ্রোয়ার ব্যবহার করতে বলো। কোনভাবেই যেন এদিকে আসতে না পারে ওরা!'

রাখাল আর ছাগল দুটো আর যখন মাত্র ষাট কি সত্তর ফুট দূরে, রানার জ্ঞান ফিরে এল। রক্তবমির ওপর শুয়ে আছে, কিন্তু সে দিকে খেয়াল নেই, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে বসল। 'পালাও! ভাগো!' চিৎকার করছে ও, কিন্তু গলা থেকে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে, একটা শব্দও পরিষ্কার নয়।

কিশোর রাখালের চেহারায় বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করার ব্যাকুলতা, আরও জোরে ছুটে আসছে। পিস্তলটা বেল্ট থেকে বের করে গুলি করবে রানা, কিন্তু নড়াচড়া করতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। ছেলেটা ত্রিশ ফুটের মধ্যে এসে পড়ল, এই সময় প্রথম গুলিটা করতে পারল। খুলি উড়ে যাওয়ায় ছিটকে পড়ে গেল একটা ছাগল। দ্বিতীয় ছাগলটা ব্যা-ব্যা করে চিৎকার জুড়ে দিল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রাখাল। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে।

'তুমি বা তোমার ছাগল, কেউ তোমরা কাছে আসবে না,' পোলিশ ভাষায় বলল রানা। ইঙ্গিতে ঘায়ে দগদগে নিজের শরীরটা দেখাল। 'আমি অসুস্থ, রোগটা ছোঁয়াচে।'

একটা আঙুল নিজের কানে তাক করল ছেলেটা, তারপর হাত নাড়ল, অর্থাৎ বলতে চাইছে রানার গলার আওয়াজ এতটাই দুর্বোধ্য যে কিছুই সে বুঝতে পারছে না।

গলায় আঙুল দিয়ে ইচ্ছে করে আরেকবার বমি করল রানা, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কাছে এসো না, আমি অসুস্থ—রোগটা ছোঁয়াচে। এদিকে একটা আবহাওয়া স্টেশন থাকার কথা, সেটা কোনদিকে তুমি জানো?'

গলার আওয়াজ আগের চেয়ে পরিষ্কার, রানার কথা ধরতে পেরে হাত তুলে

রানার পিছন দিকটা দেখাল ছেলেটা।

ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকাতেই গাছপালার আড়ালে ভাঙাচোরা একটা বিল্ডিঙের আভাস চোখে পড়ল। 'ছাগল নিয়ে চলে যাও তুমি।' টলতে টলতে দাঁড়াল ও, ফ্লেইমথ্রোয়ারের সাহায্যে খানিকটা মাটি ও তরল বমি পুড়িয়ে ফেলল, যেখানে এতক্ষণ শুয়ে ছিল।

কি বুঝল কে জানে, মরা ছাগলটাকে ফেলেই ছুটল রাখাল, পালিয়ে যাচ্ছে।

ফুলে ঢোল হয়ে গেছে শরীর, গায়ে চামড়া বলতে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই, খুলি থেকে খসে পড়েছে বেশিরভাগ চুল, চাপ দিলে খুলির চামড়াও বোধহয় হড়কে নেমে আসবে মাথা থেকে। মনের সমস্ত ইচ্ছে শক্তি এক করে এক পা করে হাঁটছে ও, পিছনে ফেলে আসা পদচিহ্ন আগুনে পোড়াতে ভুল করছে না। মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে বিল্ডিংটা, পৌঁছুতে বিশ মিনিট লেগে গেল। কব্জির চামড়া গলে গেছে, গলিত চামড়ায় ঢাকা পড়ে গেছে হাতঘড়ির ডায়াল। ট্রাউজারে ঘষে ডায়ালটা পরিষ্কার করতে হলো।

ট্রেন থেকে নেমে আসার পর দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, চারটে বাজে। ট্রেন থেমে না থাকলে আর এক ঘণ্টা পর সিনিস্টার ক্রসিঙে পৌঁছে যাবে।

ওয়েদার স্টেশনে কাউকে পেল না রানা। বিল্ডিংটার ছাদই নেই, অনেক আগেই ধসে পড়েছে। এটা একটা পরিত্যক্ত স্টেশন। হঠাৎ পাগলের মত হেসে উঠল রানা, সেটাকে কান্নারই নামান্তর বলা চলে। ভাঙা দরজা দিয়ে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ঢুকছে আর বিড়বিড় করছে আপন মনে, 'ফোন? পাগল নাকি! এখানে ফোন থাকে কি করে!' আরেকটা ঘরে ঢুকল ও। সব ক'টা চেয়ার ওল্টানো, শুধু ডেস্কটা খাড়া করা। তাতে ফোনের রিসিভার দেখে নিজেকে ব্যঙ্গ করল ও, 'শালা, মনকে চোখ ঠাওরে কোন লাভ আছে?'

ডেস্কের কাছে পৌঁছানো হলো না, আবার আছাড় খেলো রানা।

তবে এবার জ্ঞান হারায়নি, হামাগুড়ি দিয়ে ডেস্কের দিকে এগোচ্ছে, মেঝের ধুলোতে ফেলে যাচ্ছে রক্ত আর হাঁটু ও কনুই থেকে খসে পড়া চামড়া। ডেস্কের পায়া ধরে নিজেকে সিধে করল। এই মুহূর্তে সৃষ্টিকর্তাকে গালমন্দ করছে না। 'শক্তি দাও!' প্রার্থনা করছে। 'খোদা, শেষ একটা সুযোগ দাও আমাকে! অন্তত নিজেকে যেন সান্ত্বনা দিতে পারি চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি আমি।'

রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল রানা। পরমুহূর্তে বোকা হয়ে গেল।

ফোনটা ঠিক আছে, ডায়াল টোন পাচ্ছে রানা। কিন্তু ড. নাসিমুল গনির দেয়া ইরিডিয়াম ফোন নম্বরটা যে নোটবুকে লিখে রেখেছিল, সেটা ফেলে এসেছে ট্রেনে।

ইচ্ছে হলো মাথার চুল ছেঁড়ে, কিন্তু চুলের সঙ্গে খুলির আবরণও উঠে আসবে–নিজেকে অনেক কষ্টে দমন করল। ডেস্কের কিনারায় বসল রানা। 'শান্ত হও, লক্ষ্মী ভাই আমার!' নিজেকে বোঝাচ্ছে। 'অশান্ত মন কিছু মনে করতে পারে না। তোমার স্মরণ শক্তি খুবই ভাল, চেষ্টা করলে নম্বরটা মনে করতে পারবে।'

চোখ বন্ধ করে চিন্তা করলে মনঃসংযোগ বাড়ে, কিন্তু চোখের মণি বাইরে

বেরিয়ে প্রায় ঝুলে পড়েছে, পাতা দুটোর পক্ষে সিকি ভাগও ঢাকা সম্ভব হলো না।

ডায়াল করছে রানা, যদিও আট সংখ্যার মাত্র চারটে মনে করতে পারছে। প্রথম চারটে সংখ্যা ডায়াল করার পর ক্রেডলে রেখে দিল রিসিভার, বাকি চারটে সংখ্যা মনে পড়ছে না। নাই পড়ুক মনে, আবার রিসিভার তুলে ডায়াল করল। এবারও চারটে সংখ্যা···না, পাঁচটা। কিন্তু বাকি তিনটে?

তৃতীয়বারের চেষ্টায় আটটা সংখ্যাই মনে করতে পারল রানা। অপরপ্রান্ত থেকে সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত গলা ভেসে এল, 'হু ইজ দেয়ার?'

জবাব দেয়ার আগে কয়েকবার কেশে গলাটা যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে নিল রানা। 'মাসুদ রানা···'

'কোত্থেকে করছ?' ড. নাসিমুল গনির গলা কেঁপে গেল। 'ট্রেন থেকে নেমেছ কেন? কতজন নেমেছ তোমরা? ট্রেন এখন কোথায়···' একসঙ্গে একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছেন তিনি।

বাধা দিল রানা। 'ট্রেন সম্পর্কে আপনি জানেন? এমথ্রীএক্স সম্পর্কে?'

'আমি সব জানি।'

'কিভাবে?' হাঁপাচ্ছে রানা।

'প্যারিস থেকে ইরাকী এমব্যাসীর অ্যামব্যাসাডর আমাকে ফোন করে জানান। জানতে অনেক দেরি করে ফেলেন তিনি। ট্রেন জেনেভা থেকে রওনা হবার দশ ঘণ্টা পর, রাত দশটায়। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষেধক নিয়ে রওনা হয়েছি। রানা, কি ঘটেছে বলো আমাকে। ট্রেন এখন কোথায়?'

'ট্রেনের সবাই মারা যাচ্ছে, ডক্টর। আমার সন্দেহ ন্যাটোর মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিনিস্টার ক্রসিঙে ফেলে দেয়া হবে ট্রেন। ট্রেনের দুটো এঞ্জিনের মধ্যে টাগ-অভ-ওঅর চলছে। আমি একা নেমে এসেছি আপনাকে ফোন করার জন্যে। আপনি কোথায়, ডক্টর? কিসে?'

'আমরা হেলিকপ্টারে। রেগুলার রুটে ট্রেন পাইনি, তাই চারদিকে খুঁজছি। তুমি কোথায়?'

'পোল্যান্ডে। জায়গাটার নাম ওয়াকাস। পরিত্যক্ত একটা ওয়েদার স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে দেড় মাইলের মত হেঁটে আসতে হয়েছে। ডক্টর, প্রতিষেধক নিয়ে সরাসরি ট্রেনে চলে যান, প্লীজ।

'ওয়াকাস থেকে ষাট মাইল দূরে রয়েছি আমরা, তবে রেলপথের উত্তর দিকে,' ডক্টর গনি বললেন। 'ঠিক আছে, সরাসরি ট্রেনেই যাচ্ছি আমরা।' তারপর হঠাৎ মনে পড়ায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু তুমি? তোমার কি হবে?'

'আমাকে আপনারা বাঁচাতে পারবেন না,' হাতের তালুর চামড়া সহ রিসিভারটা খসে পড়ে যাচ্ছে হাত থেকে, সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল রানা। 'বাঁচতে আমি চাইও না–বীভৎস এই চেহারা আমার দরকার নেই।'

'আমরা তোমার কাছে আসছি,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন ড. গনি। 'তোমার প্রতি আমার অনুরোধ, আর চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো। ফুয়েল

নিতে নামতে হচ্ছে আমাদের, তা না হলে আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারতাম। রানা, মাই ডিয়ার বয়, কথা দিচ্ছি, তোমার আগের চেহারা ফিরিয়ে দেয়া হবে। গায়ের সব চামড়াও যদি খসে গিয়ে থাকে, আবার তৈরি হতে মাত্র দেড় থেকে দু'মাস সময় লাগবে...'

'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, কিন্তু না!' প্রতিবাদ করল রানা। 'আমি এখানে একা, আর ট্রেনে এখনও বেঁচে আছে প্রায় এক হাজার মানুষ। ওদের কাছাকাছি রয়েছেন আপনারা, কাজেই...'

কথা না বলে যোগাযোগ কেটে দিলেন ড. গনি।

নয়

চারটে তিপ্পান্ন মিনিট। মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির কমান্ড সেন্টারের ম্যাপে লাল আলো আবার সচল হয়ে উঠেছে। ট্রেনের স্পীড এই মুহূর্তে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল। সিনিস্টার ক্রসিং থেকে আর মাত্র সতেরো মাইল দূরে রয়েছে ট্র্যান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেস। এখন ঢাল বেয়ে নামছে, তবে খানিক পর আরেক ঢাল বেয়ে পাহাড় চূড়ায় উঠতেও হবে। ওঠার সময় স্বভাবতই স্পীড কমে যাবে, পিছনের এঞ্জিন উল্টোদিকে টান দেয়ায়। জেনারেল আশা করছেন, যতই দেরি হোক, খুব বেশি হলে আধ ঘণ্টার মধ্যে সিনিস্টার ক্রসিঙে উঠে পড়বে ট্রেন।

যুদ্ধ চলছে ট্রেনের ছাদে, দুই এঞ্জিনের মাথা থেকে সিকিউরিটি পুলিস আর মার্কিন সৈন্যরা পরস্পরকে লক্ষ্য করে গুলি করছে। সৈন্যদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার, পিছনের ইলেকট্রিক লোকোমটিভের ছাদে পৌঁছুতে চায় তারা। ট্রেনের সঙ্গে ইলেকট্রিক কেবল-এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারলেই এঞ্জিন অচল হয়ে পড়বে। কিন্তু সিকিউরিটি পুলিস সামনে ময়দার বস্তা স্তূপ করে রাখায় ভাল আড়াল পেয়ে গেছে, সৈন্যরা সুবিধে করতে পারছে না। দুই এঞ্জিনের মাঝখানে একুশটা কার, দূরত্ব অনেক বেশি বলে কোন পক্ষই টার্গেটে গুলি লাগাতেও পারছে না।

যুদ্ধ চলছে ট্রেনের ভেতরও। স্বেচ্ছাসেবক আর পুলিসরা এখানে বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না। মূল ট্রেন আর নতুন জোড়া লাগানো পাঁচটা কারের মাঝখানের কানেকটিং ব্রিজ প্রথম থেকেই তাদের দখলে ছিল, এখন তারা মূল ট্রেনের তিনটে খালি কারের প্রথমটাও দখল করে নিয়েছে—বেদখল হয়েছে ওই কারের সবগুলো কমপার্টমেন্ট। ওই কারেরই একটা কমপার্টমেন্টে ছিল ডোনা, পুলিসরা পিছু হটে দ্বিতীয় কার-এ চলে আসার সময় তার কথা ভুলে যায়। তখন সে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে ছিল সীটের ওপর, সেটাই কারণ। কম্বলটাকে কম্বল বলেই ধরে নেয় তারা, বুঝতে পারেনি ভেতরে ডোনা আছে। দ্বিতীয় কার থেকে এখন তার কান্নার

আওয়াজ পাচ্ছে তারা। অথচ কারও কিছু করার নেই।

পাঁচটা বেজে আট মিনিট।

ফাঁকা একটা করিডর ধরে ছুটছে চেলসি, সামনে পড়ে যাওয়ায় ধাক্কা খেলো ভেনাসের সঙ্গে। 'ডোনাকে কোথাও দেখছি না! আপনি তাকে দেখেছেন?' হাঁপাচ্ছে সে।

'সর্বনাশ! তাকে তো খালি কার থেকে আনাই হয়নি!'

'ওহ্ মাই গড!' কেঁদে ফেলল চেলসি, ছুটল ট্রেনের সামনের দিকে।

পিছন থেকে চিৎকার করল ভেনাস। 'দাঁড়ান! শুনুন!'

আওয়াজটা চেলসিও শুনতে পেয়েছে। হেলিকপ্টারের আওয়াজ না? মনে পড়ল নেলসন আর কার্লসন দু'জোড়া কারের ডায়াফ্র্যাম কানেকটিং ব্রিজে আছে, ওখানে একটা জানালা ভাঙা হয়েছে–রানা যখন নেমে যায়। 'আসুন,' বলে আবার ছুটল সে।

ড. নাসিমুল গনির ভরাট গলার অট্টহাসি শুনে মনে হবে ভদ্রলোক পাগল হয়ে গেছেন। 'বিনয়ের নিকুচি করি, সত্যি কথাটা হলো–আমাকে ওদের নোবেল প্রাইজ দেয়া উচিত!'

হেলিকপ্টারের পাইলট ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল, ঠোঁটে সশ্রদ্ধ স্মিত হাসি লেগে রয়েছে।

রানার দিকে তাকালেন তিনি, ওর পাশের সীটেই হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন, ভঙ্গিটা আয়েশী। 'আমাকে তুমি জিজ্ঞেস করছ, ট্রেনে যেহেতু ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে, কাজেই আমার ওখানে যাওয়া উচিত হবে কিনা!' আবার হেসে উঠলেন তিনি। 'মাত্র দুই ফোঁটা ওষুধ খাইয়েছি তোমাকে, ঠিক? কতক্ষণ আগে? বিশ মিনিট। কেমন বোধ করছ বলো?'

'চোখ সাদা হয়ে গেছে, রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে, বমিও হচ্ছে না...'

'শুধু যে শরীরের বাইরে তা নয়, তোমার ভেতরের সমস্ত ক্ষতও সেরে উঠছে,' বাধা দিয়ে বললেন ড. গনি। 'আমার এই আবিষ্কারকে প্রতিষেধক বললে আমাকে অপমান করা হয়, ডিয়ার বয়। প্রতিষেধক নয়, আমাকে তোমরা মিরাক্‌ল্‌-এর জনক বলতে পারো। জাদুকর বললেও অসম্মান বোধ করব না। এক ফোঁটা ওষুধই যথেষ্ট, পেটে পৌঁছানোর প্রয়োজন হয় না, জিভে ছোঁয়ালেই কাজ শুরু করে দেয়...'

'স্যার!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল পাইলট। 'ট্রেন!'

পাইলটের পিঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা ও ড. গনি। 'কই? কোথায়?' একযোগে জানতে চাইল ওরা।

পাহাড় চূড়ায় উঠে আবার স্থির হয়ে গেছে ট্রেন, সমান শক্তি নিয়ে দুটো এঞ্জিন দু'দিকে টানছে ওটাকে। এই চূড়া দু'মাইল দীর্ঘ, তারপরই সিনিস্টার ক্রসিং, দুশো

বারো বছর ধরে দুটো পাহাড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। নিচে বয়ে যাচ্ছে ভরাট নদী। নদীতে গানবোট নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছে একদল সৈনিক, পরনে প্রোটেকটিভ সুট, ট্রেন ব্রিজ থেকে খসে পড়ার পর লাশ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলবে।

মার্কিন সেনাবাহিনীর গ্রাউন্ড ট্রুপস ব্রিজের নাট-বল্টু এমন সতর্কতার সঙ্গে ঢিলে করে রেখেছে, ট্রেন ব্রিজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওটা ভেঙে পড়বে না। ট্র্যান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেসের ওজন ত্রিশ হাজার টনেরও বেশি, ওরা চায় গোটা ট্রেন অর্থাৎ পুরো ত্রিশ হাজার টন উঠে আসার পর ব্রিজ ভেঙে পড়ুক। ট্রেনের সামনের অংশ উঠলেই যদি ব্রিজ ভেঙে পড়ে, পিছনের বেশিরভাগ কার রক্ষা পেয়ে যেতে পারে। সে-কথা মনে রেখে হিসাব করে দুর্বল করা হয়েছে ব্রিজ। কাজ সেরে ব্রিজের ওপারে চলে গেছে তারা, হৃদয়হীন দর্শকের ভূমিকা নিয়ে তাকিয়ে আছে স্থির হয়ে থাকা ট্রেনটার দিকে।

কাপলার-এ আগুন তাক করে রেখেছে কার্লসন, আর নেলসন সাব-মেশিনগানের ব্যারেল দিয়ে ওটার ওপর ঘন ঘন বাড়ি মারছে। আগুনের বিরতিহীন শিখা টকটকে লাল করে রেখেছে কাপলারটাকে। এখন সন্দেশার হাতেও পিস্তল দেখা যাচ্ছে, হাসানের পাশে দাঁড়িয়ে কার্লসন আর নেলসনকে কাভার দিচ্ছে ওরা।

দরজা খুলে কানেকটিং ব্রিজে ঢুকল চেলসি, হাঁপাচ্ছে। 'ডোনা!' কেঁদে ফেলল সে। 'ডোনা সামনের খালি কমপার্টমেন্টে রয়ে গেছে!' ছুটে খোলা জানালার সামনে চলে এল, মাথা বের করে বাইরে তাকাল। ট্রেনের পিছন দিকে তাকাতেই ডব্লিউএইচও লেখা হেলিকপ্টারটা দেখতে পেল এক পলকের জন্যে, পরমুহূর্তে ট্রেনের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা। 'রানা! সম্ভবত রানা ফিরে এসেছেন। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের হেলিকপ্টার নিয়ে!'

'কোথায়?' মুহূর্তের জন্যে কাজ থামিয়ে জানতে চাইল নেলসন।

ব্রিজে ঢুকে ডোনার পাশে দাঁড়াল ভেনাস। 'কই, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!'

'ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে,' বলল চেলসি। 'হেলিকপ্টার নিয়ে রানা সম্ভবত ট্রেনের পিছনে ল্যান্ড করছে। আসুন!'

ব্রিজ থেকে ট্রেনের পিছন দিকে ছুটল চেলসি, তার পিছু নিয়ে ভেনাসও। ব্রিজের এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা, আরেক দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল তিনজন পুলিস। 'আমরা হেরে যাচ্ছি! সৈনিকরা দুটো কার দখল করে নিয়েছে! এখানে পৌঁছুতে আর হয়তো দশ মিনিট লাগবে ওদের।' ভেতরে ঢোকার পর দরজা বন্ধ করেনি, ট্রেনের সামনে থেকে এক পশলা বুলেট এসে ঢুকল। দু'জন পুলিস ঝাঁঝরা হয়ে গেল। তৃতীয় লোকটা এক লাফে সরে এসে বন্ধ করে দিল ইস্পাতের দরজা।

'চিন্তার কিছু নেই,' কাজ না থামিয়েই জবাব দিল কার্লসন, 'মি. রানা প্রতিষেধক নিয়ে ফিরে এসেছেন!'

নেলসন জানতে চাইল, 'আমাদের কতজন লোক মারা গেছে?'
'বাইশজন।'
'সৈনিকরা?'
'তেরোজন—সব মিলিয়ে পঁয়ত্রিশজন।'
'এখানে লুকিয়ে থেকে লাভ নেই, যাও যুদ্ধ করো,' নেলসন কঠিন সুরে বলল। হাসান আর সন্দেশার দিকে তাকাল। 'আমাদেরকে কাভার দেয়ারও দরকার নেই, যাও, তোমরাও সৈনিকদের ঠেকাও!'

প্রতিষেধক নিয়ে ফিরে এসেছে রানা, খবরটা দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়ল গোটা ট্রেনে। এমন একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হলো, তীরে এসে তরী ডোবে ডোবে। প্যাসেঞ্জাররা, প্রায় সবাই বিবস্ত্র, কিভাবে যেন জেনে ফেলেছে একজন ডাক্তারকে নিয়ে পিছনের এঞ্জিনরূমে উঠেছে রানা, সঙ্গে আছে প্রচুর পরিমাণে প্রতিষেধক—ব্যস, যে-যার কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে ট্রেনের পিছন দিকে ছুটল। দেখতে দেখতে প্রতিটি করিডর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। সবাই এঞ্জিনরূমের দিকে এগোতে চাইছে, ফলে অচল হয়ে আছে নিরেট ভিড়। শুধু যে প্যাসেঞ্জাররা, তা নয়, পিছনের এঞ্জিনের মাথায় পুলিস আর স্বেচ্ছাসেবক যারা ছিল তারা রানা আর ড. গনিকে হেলিকপ্টার থেকে নেমে ট্রেনে উঠতে দেখেছে, ওদের হাতে বড় আকৃতির প্লাস্টিকের কয়েকটা ক্যান দেখে বুঝে নিয়েছে ওগুলোয় এমথ্রীএক্স ভাইরাসের প্রতিষেধক আছে—নিজেদের গুরুদায়িত্বে কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে ছাদ থেকে ট্রেনের ভেতর নেমে এল তারা। 'মারা যাচ্ছি!' প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে তারাও আর্তনাদ করছে, 'প্রতিষেধক চাই!'

ময়দার বস্তার পিছনে প্রতিপক্ষরা নেই, দেখতে পেয়ে সামনের এঞ্জিনের খালি কারগুলোর ছাদ থেকে মার্কিন সৈনিকরা সাবধানে এগিয়ে আসছে। এই সুযোগে ট্রেনের সঙ্গে বিদ্যুৎ লাইনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেবে তারা। অচলাবস্থার অবসান এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। ট্রেন আবার গতি ফিরে পাবে।

পোস্টাল কমিউনিকেশন কার থেকে প্যাসেঞ্জারদের উদ্দেশে কথা বলছে রানা, লাউডস্পীকারের মাধ্যমে গোটা ট্রেনে ছড়িয়ে পড়ছে ওর কণ্ঠস্বর, পরিষ্কার ও স্পষ্ট। 'সবাই যে-যার কমপার্টমেন্টে ফিরে যান। দুই ফোঁটা ওষুধ জিভে ঠেকাতেই সুস্থ হয়ে গেছি আমি, সবার বেলাতেই তাই ঘটবে। কিন্তু যদি হুড়োহুড়ি করেন, ওষুধ খাওয়ানো সম্ভব হবে না। স্বেচ্ছাসেবক যারা সরাসরি যুদ্ধ করছেন না, তারা পোস্টাল কমিউনিকেশন কার-এ চলে আসুন, ওষুধ বিলি করার কাজে এখানে আপনাদের দরকার আমার।'

এখনও দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন।

কিন্তু রানার নির্দেশে কোন কাজ হলো না। প্যাসেঞ্জাররা নিজেদের মধ্যে মারামারি বাধিয়ে দিয়েছে। সবাই পোস্টাল কমিউনিকেশন কার-এ পৌঁছুবার জন্যে মরিয়া। ভিড়ের চাপে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছে অনেকে, বিশেষ করে মহিলা আর শিশুরা। অনেকেই পড়ে গেল, অসংখ্য পায়ের চাপে ভর্তা হয়ে গেল

শরীরগুলো।

দশ-বারোজন স্বেচ্ছাসেবক পেল রানা। ডাইনিং কার থেকে গ্লাস নিয়ে আসা হলো। প্লাস্টিকের ক্যান থেকে গ্লাসে ঢালা হলো তরল প্রতিষেধক। কার-এর দরজা বন্ধ, সেটা ভিড়ের চাপে যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকদের প্রত্যেককে একটা করে প্রতিষেধক ভরা গ্লাস দেয়া হলো, সঙ্গে কয়েকটা করে ড্রপার। ড. গনি বললেন, 'এক ফোঁটার বেশি ওষুধ খাওয়ানোর দরকার নেই। বেশি খাওয়াতে গেলেও কম পড়বে না, তবে সময় নষ্ট হবে।'

দরজা খুলে ফেলল রানা। প্রবল এক স্রোতের মত ভেতরে ঢুকে পড়ল ভিড়ের নিরেট দেয়াল। স্বেচ্ছাসেবকদের হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল গ্লাসগুলো। রানা, ড. গনি আর স্বেচ্ছাসেবকদের পিঠ দেয়ালে ঠেকল।

কোমর থেকে পিস্তল বের করে সিলিঙে গুলি করল রানা। 'কেউ এক চুল নড়বেন না! কাউকে নড়তে দেখলেই তাকে আমি গুলি করব। ঠিক আছে, যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানেই থাকুন, একে একে সবাইকে ওষুধ খাওয়ানো হবে।' এই পরিস্থিতিতে অন্য কোন উপায় নেই, বুঝে নিয়েছে ও।

আবার প্লাস্টিক ক্যান থেকে ওষুধ ভরা হলো গ্লাসে। স্বেচ্ছাসেবকরা ড্রপারের সাহায্যে হাঁ করে থাকা প্যাসেঞ্জারদের মুখে দুই-এক ফোঁটা করে ওষুধ ফেলছে।

'যারা ওষুধ খেয়েছেন,' পাঁচ মিনিট পর বলল রানা, 'তারা এবার অন্যদের খাওয়ান! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সবাইকেই খাওয়াতে হবে।'

ভিড় ঠেলে এগোনো সম্ভব নয়। আক্ষরিক অর্থেই ভিড়ের মাথায় পা দিয়ে, কখনওবা সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে হামাগুড়ি দিয়ে, পোস্টাল কমপার্টমেন্টের দিকে এগিয়ে আসছে চেলসি আর ভেনাস।

সবাই মিলে কাজ শুরু করায় পোস্টাল কমিউনিকেশন কার-এ যারা ঢুকেছিল তাদেরকে ওষুধ খাওয়াতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগল না। তারা সবাই এখন বাইরের করিডরের ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা প্যাসেঞ্জারদেরকে ওষুধ খাওয়াচ্ছে। দুই ফোঁটায় কাজ হবে না ভেবে কেউ কেউ একবার খাবার পর আরেকবার খাচ্ছে, তবে তাদের সংখ্যা বেশি নয়।

করিডরে বেরিয়ে এসেছে রানা ও ড. গনি, জমাট বাঁধা ভিড়ের মাথায় চেলসি আর ভেনাসকে দেখতে পেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রানা।

জনারণ্যের মাথা থেকেই চিৎকার শুরু করল চেলসি, 'রানা, সৈনিকরা ট্রেন দখল করে নিচ্ছে! আমরা পিছু হটছি! নেলসন এখনও কাপ্লার খুলতে পারেনি! কিছু একটা করুন!'

'তুমি গুলি করো, ভিড় কমাও,' রানাকে বললেন ড. গনি। 'সৈনিকদের আমি বোঝাব। আমরা যদি বাঁচি, ওরাও বাঁচবে।'

'আপনাকে ওরা গুলি করবে, ড. গনি,' বলল রানা। 'ওদের ওপর নির্দেশ আছে যে-কোন অবস্থাতে ব্রিজ থেকে নদীতে ফেলে দিতে হবে ট্রেন। ওরা কমান্ডো ইউনিটের সৈন্য, নির্দেশ অমান্য করতে জানে না।'

'আমি ওদেরকে নতুন জীবনদান করতে চাইছি,' হেসে উঠে বললেন ড. গনি। 'আর জীবনের চেয়ে প্রিয় আর কিছু আছে?'

'রানা,' এখনও চিৎকার করছে চেলসি। 'ডোনা! ডোনাকে আমরা খালি কমপার্টমেন্টে ফেলে রেখে এসেছি!'

পিস্তল বের করে আবার ফাঁকা গুলি করল রানা। 'সবাই একপাশে সরে যান, পথ ছাড়ুন!'

দ্রুত ওষুধ খাওয়ানোর কাজ শুরু হয়েছে, দেখে প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে স্বস্তি আর আস্থার ভাব খানিকটা হলেও ফিরে এসেছে। সরে গিয়ে পথ করে দিল তারা।

ড. গনি ছুটলেন, তাঁর পিছু নিয়ে রানাও। হঠাৎ পিছন থেকে ড. গনির কোট খামচে ধরল রানা। 'থামুন!'

বলার দরকার ছিল না, ড. গনি নিজেই দাঁড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন।
ট্রেন এখন আর স্থির নয়। চলতে শুরু করেছে।

সম্ভবত পুলিসদের একজনই চেঁচিয়ে উঠল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে! ছাদে আমাদের কোন লোক নেই, সৈনিকরা ইলেকট্রিক লাইন কেটে দিয়েছে–অচল হয়ে গেছে আমাদের এঞ্জিন!'

পকেট থেকে ছেঁড়া ম্যাপ বের করে রানার চোখের সামনে মেলে ধরল চেলসি। 'সিনিস্টার ক্রসিং আর দু'মাইল দূরেও নয়। ওহ্ গড! শেষ রক্ষা হলো না! ট্রেন নদীতে পড়তে যাচ্ছে!'

এক মুহূর্ত বিহ্বল হয়ে পড়ল রানা। চোখে এখন সানগ্লাস নেই, হঠাৎ চোখ দুটো যেন দপ করে জ্বলে উঠল। গলায় যত জোর আছে, চিৎকার করে বলল, 'যারা ওষুধ খেয়েছেন বা খাননি, সবাইকে বলছি! আমার কথা মন দিয়ে শুনুন! যারা ওষুধ খেয়েছেন বা খাননি আমার কথা শুনলে একজনও মারা পড়বেন না। সামনে ব্রিজ, ট্রেনটাকে ব্রিজ থেকে নদীতে ফেলে দেয়া হবে। ফলে একজনও বাঁচবেন না। বাঁচার একটাই উপায় এখন–সমস্ত জানালা-দরজা ভেঙে নিচে লাফিয়ে পড়ুন! নিচেও ওষুধ পাবেন! ভাঙুন, দরজা-জানালা ভাঙুন! এখুনি! এখুনি লাফ দিন!'

পিছনের এঞ্জিন অচল হয়ে পড়ায় ট্রেন আবার সচল হয়েছে। ধীরে ধীরে বাড়ছে স্পীড। সিনিস্টার ব্রিজ এখন আর সামনের এঞ্জিন থেকে এক মাইল দূরেও নয়। বৈদ্যুতিক লাইন কেটে দিয়ে সৈনিকরা নিজেদের পজিশনে ফিরে গেছে, পাহারায় রেখে গেছে মাত্র একজনকে।

ডায়াফ্র্যাম কানেকটিং ব্রিজের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন ড. গনি, পিছনে রানা, চেলসি, ভেনাস আর স্টুয়ার্ড টাওয়েল। এখানে আসার পথে প্রতিটি কমপার্টমেন্ট করিডরে ভিড় করা প্যাসেঞ্জারকে একই নির্দেশ দিয়ে এসেছে রানা, 'দরজা-জানালা ভেঙে লাফিয়ে পড়ুন নিচে!' স্বেচ্ছাসেবকদেরও বলে এসেছে, 'ওষুধ নিয়ে

নিচে নামো!'

রানার হাতে ইরিডিয়াম ফোনটা ধরিয়ে দিয়ে ব্রিজের অপরদিকের দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে গেলেন ড. গনি। ব্রিজের মেঝের কাটা অংশের কিনারায় দাঁড়িয়ে নিচে তাকাল রানা। নেলসন সাব-মেশিনগানের ব্যারেল দিয়ে কাপলারে আঘাত করে চলেছে এখনও। 'এভাবে ওটা ভাঙতে পারবেন না,' বলল ও। এঞ্জিনরূমে একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস আছে। কন্ট্যাক্টগুলো নাকল-এর নিচে।

মুখ তুলে এক মুহূর্ত রানার দিকে তাকিয়ে থাকল নেলসন, তারপর হাত বাড়িয়ে নাকল-এর নিচের দিকটার নাগাল পেতে চেষ্টা করল। ঝট করে টেনে নিল হাতটা, চামড়া পুড়ে গেছে। এখন কাপলার ঠাণ্ডা হবার অপেক্ষায় থাকতে হবে ওকে।

সেকেন্ডের কাঁটা দ্রুত ঘুরছে। ট্রেন ব্রিজে উঠতে আর বোধহয় এক মিনিটও লাগবে না।

ট্রেনের সামনে থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। খোলা দরজা পেরিয়ে সেদিকে ছুটল রানা। খালি কার-এর একটা মাত্র কমপার্টমেন্টে পজিশন নিয়ে এখনও যুদ্ধ করে যাচ্ছে পুলিস আর স্বেচ্ছাসেবকরা, বাকি দুটো কার সৈনিকরা দখল করে নিয়েছে।

প্রতিটি কমপার্টমেন্টের সামনে থামল রানা, চিৎকার করে বলল, 'ট্রেন নদীতে পড়ে যাবে। যুদ্ধ করার দরকার নেই, সবাই পিছন দিকে চলে যাও। ঢাল বেয়ে উঠছে ট্রেন, গতি এখনও কম, লাফিয়ে নিচে পড়ার এটাই শেষ সুযোগ। নিচে ওষুধ পাবে।'

হাসান আর সন্দেশা করিডরে বেরিয়ে এল। 'আপনি? আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল সন্দেশা।

চেলসি রানার পিছনে চলে এসেছে, 'রানা, ডোনা!'

'আমি ড. গনিকে ডেকে আনতে যাচ্ছি, সম্ভব হলে ডোনাকেও নিয়ে আসব...' কাউকে বাধা দেয়ার সুযোগ না দিয়ে করিডরের অপরপ্রান্তের দরজা খুলে খালি দ্বিতীয় কারের করিডরে ঢুকে পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে একবার শুধু চিৎকার করল, 'পালাও সবাই! ট্রেন থেকে লাফ দাও!'

করিডরে বেরিয়ে এসে রানা দেখল ওর পাঁচ গজ সামনে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ড. গনি। তাঁর সামনে দু'জন সৈনিক, হাতের অটোমেটিক, ড. গনির বুকের ওপর তাক করা।

ড. গনি ওদের সঙ্গে কথা বলছেন, 'সবই ভুল। আপনাদেরকে বোকা বানানো হয়েছে। এমথ্রীএক্স-এর প্রতিষেধক ওদের কাছে নেই, আছে আমার কাছে। এক ফোঁটা জিভে ঠেকালেই সবাই সুস্থ হয়ে যাবেন। আপনারা জানেন না, কিন্তু আমরা জানি—ট্রেনটা ব্রিজ থেকে ফেলে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে...'

'একই সঙ্গে কয়েকটা ঘটনা ঘটতে দেখছে রানা। করিডরে রয়েছে ও, এদিকের জানালায় আলকাতরা মাখানো হয়নি—ট্রেনের বাইরে নদী দেখতে পাচ্ছে ও, নদীতে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সশস্ত্র সৈনিকদের নিয়ে কয়েকটা গানবোট।

তারমানে ব্রিজে উঠে পড়েছে ট্রেন।

একজন সৈনিক কঠিন সুরে বলল, 'আপনি হু-র একজন বিজ্ঞানী বলে দাবি করছেন, সেজন্যেই গুলি না করে অনুরোধ করছি, ফিরে যান। আমাদের ওপর নির্দেশ আছে, ট্রেনটাকে কোয়ারানটিনে পৌঁছে দিতে হবে, তার আগে ট্রেন থেকে কাউকে নামতে দেয়া যাবে না। আর প্রতিষেধকের কথা যেটা বলছেন, সেটা মিথ্যে। মেগা ডেথ প্রিভেনশন কমিটির তরফ থেকে বলা হয়েছে, শুধু তাদের ল্যাবেই প্রতিষেধক তৈরি করা হয়েছে, অন্য কোথাও তা পাওয়া যাবে না। এরই মধ্যে কোয়ারানটিন সাইটে সেই প্রতিষেধক পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে...'

'এখনও সময় আছে, ট্রেন থামান, প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে দিন, আপনারাও নেমে পড়ুন—তারপর নিজেরাই চাক্ষুষ করুন আমার ওষুধ কি জাদু দেখায়...'

বদ্ধ জায়গার ভেতর অটোমেটিক রাইফেলের গর্জন কানের পর্দা ফাটিয়ে দেয়ার উপক্রম করল। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে ছিটকে পড়ে গেলেন ড. গনি। দুই সৈনিক আর রানার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি, পড়ে যেতেই রানাকে দেখতে পেল সৈনিকরা। রাইফেল তুলল তারা, এবার রানাকে মারবে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে রানা আর মেঝেতে পড়ে থাকা ড. গনির মাঝখানের একটা দরজা থেকে করিডরে বেরিয়ে এল সাত বছরের ডোনা—দু'হাতে চোখ রগড়াচ্ছে, কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তার মাথার ওপর দিয়ে গুলি করল রানা। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল সৈনিক দু'জন, দু'জনের বুকই ব্রাশ ফায়ারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

ছুটে এসে রানাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ডোনা। এক হাতের ভাঁজে আটকে নিয়ে তাকে বগলের কাছে তুলে নিল রানা, অপরহাতে সাব-মেশিনগান। ঝট করে জানালার দিকে তাকাল একবার। ট্রেনের সম্ভবত অর্ধেকটাই উঠে এসেছে ব্রিজে।

ঘুরল রানা। ছুটল।

করিডর ধরে ছুটছে, খোলা দরজা দিয়ে দেখে নিচ্ছে প্রতিটি কমপার্টমেন্ট। সব খালি। হঠাৎ ঝাঁকি খেলো ট্রেন, তারপর দুলতে শুরু করল। ব্রিজ ভাঙতে শুরু করেছে।

ডায়াফ্র্যাম কানেকটিং ব্রিজে পৌঁছে কাউকে দেখতে পেল না রানা, কাপলার খুলতে বা ভাঙতে ব্যর্থ হবার পর সময় থাকতে ট্রেনের পিছন দিকে চলে গেছে নেলসন তার সহকারীদের নিয়ে। কিংবা হয়তো ট্রেন থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে গেছে।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে রানা। জানালা-দরজা ভাঙার আওয়াজ ভেসে আসছে, তবে তা অনেক পিছন থেকে। একের পর এক করিডর পেরিয়ে আসছে রানা, কারও সঙ্গে দেখা হচ্ছে না।

সামনের এঞ্জিন সহ পাঁচটা কার অনেক আগেই ব্রিজে উঠে পড়েছে। মূল ট্রেনের আরও ছ'টা কার এখন ব্রিজে। এখনও এক করিডর থেকে আরেক করিডরে চলে আসছে রানা, কারও সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। জানালা দিয়ে ঘন ঘন বাইরে

তাকাচ্ছে। নদীই শুধু দেখা যাচ্ছে। এখন যদি ব্রিজ ভেঙে পড়ে–নিজের কথা ভাবছে না ও–ডোনাকে বাঁচানো যাবে না।

সঙ্গে ওষুধ নেই, থাকলে ডোনাকে খাওয়াতে পারত।

অকস্মাৎ প্রচণ্ড ধাতব গর্জন শোনা গেল। এলিভেটর নিচে নামার সময় যে অনুভূতি হয়, রানারও সেরকম হলো। ব্রিজ খসে পড়তে যাচ্ছে। ট্রেনের পিছন থেকে প্যাসেঞ্জারদের সম্মিলিত আর্তনাদ ভেসে এল। তারমানে এখনও সবাই ট্রেন থেকে নিচে নামতে পারেনি।

তবে ব্রিজ এখনও অটুট। ট্রেন ধীরগতিতে এগোচ্ছে।

আরও একটা কর্কশ ধাতব গর্জন। তারপরও এগোচ্ছে ট্রেন। গতি আরও মন্থর।

আরেক করিডরে চলে এল রানা। ফাঁকা এটাও। তবে করিডরের শেষ মাথায়, দরজার ভেতর দিকে, চেলসিকে দেখতে পেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সিনিস্টার ক্রসিঙ ভেঙে পড়তে শুরু করল। রানার জন্যে অপেক্ষা করছে চেলসি, তবে এ অপেক্ষার পরিণতি সম্ভবত মিলনাত্মক নয়, বিয়োগান্তকই হতে যাচ্ছে।

ছুটল রানা, ডোনাকে এমন ভঙ্গিতে ধরে আছে যেন ছুঁড়ে দেবে চেলসির দিকে।

চেলসির গলায় কান্না, তারই সঙ্গে অসহায় ক্রোধ, 'লাফ দিন!'

করিডরের মাঝখানে রয়েছে রানা। করিডর ওর পিছন দিকে কাত হয়ে পড়ছে। বিষণ্ন দৃষ্টিতে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল চেলসি আর রানা পরস্পরের দিকে। তারপর রানা বলল, 'ধরুন!' ডোনাকে ছুঁড়ে দিল ও।

দরজা গলে ভেতরে ঢুকল ডোনা, দু'হাত বাড়িয়ে তাকে লুফে নিল চেলসি।

সিনিস্টার ক্রসিঙে এখন সব মিলিয়ে আঠারোটা কার, ওজন ত্রিশ হাজার টন।

করিডরের মাঝখান থেকে লাফ দিতে যাবে রানা, বিরতিহীন বজ্রপাতের শব্দ তুলে দরজার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল করিডর–দরজার ওপারে চেলসি, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে, বুকে জড়িয়ে রেখেছে ডোনাকে। বিচ্ছিন্ন করিডর সহ অদৃশ্য হয়ে গেল রানা।

সিনিস্টার ক্রসিং ধসে পড়ল ট্র্যান্সকন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেসের আঠারোটা কার নিয়ে। ঝপ করে খসে পড়ল, তা নয়। ট্রেনের আঠারোটা কার প্রথমে কাত হয়ে গেল, প্রায় অলস একটা ভঙ্গিতে। ট্রেনের যতটুকু অংশ ব্রিজে উঠেছে, খসে পড়ার সময় বাকি অংশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সেটুকু। ঠিক যেখানে বিচ্ছিন্ন হলো, তার সামনের দিকটায় ছিল রানা। একেবারে শেষ মুহূর্তে চেলসিকে লক্ষ করে লাফ দিয়েছিল, কিন্তু সদ্য তৈরি ফাঁকটা পার হতে পারেনি।

পিছনের ইলেকট্রিক এঞ্জিন আর পাঁচটা কার পাহাড় চূড়ার কিনারায়, ব্রিজের ঠোঁটে স্থির হয়ে আছে, ট্রেনের বাকি অংশ অদৃশ্য হয়ে গেছে ব্রিজের সঙ্গে–এমনকি নদীতেও নেই কিছু, গভীর তলদেশে তলিয়ে গেছে ব্রিজের ভাঙা

টুকরো আর প্রতিটি কার। পতনের সময় বিকট ধাতব শব্দ হলেও, এই মুহূর্তে প্যাসেঞ্জারদের কান্না আর উল্লাস ছাড়া অন্য কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

নদীতে গানবোটগুলো স্থির হয়ে আছে সদ্য ভেঙে পড়া ব্রিজ থেকে নিরাপদ দূরত্বে। লাশ ভেসে ওঠার অপেক্ষায় আছে গানবোটের সৈনিকরা, দেখামাত্র ফ্লেইমথ্রোয়ার দিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে।

যুদ্ধ শেষ, হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে পুলিস আর স্বেচ্ছাসেবকদের একটা দল ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়া প্যাসেঞ্জারদের ওষুধ খাওয়াচ্ছে, পড়ার সময় হাত-পা মাথায় যারা আঘাত পেয়েছে তাদের চিকিৎসা করতে সাহায্য করছে ডাক্তারদের; আরেক দল রেল লাইনে, ব্রিজের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা কারগুলো থেকে বাকি প্যাসেঞ্জাদের নিচে নামতে সাহায্য করছে, তাদের সঙ্গে হাত লাগিয়েছে চেলসি, ভেনাস, নেলসন, সন্দেশা, হাসান, কার্লসন ও স্টুয়ার্ড টাওয়েল। ট্রেন থেকে নিচে নেমেই প্রথমে ডোনাকে ওষুধ খাইয়েছে চেলসি, তারপর নিজেও খেয়েছে। একা শুধু হাসান এক ধারে দাঁড়িয়ে আছে, পায়ের কাছে নিজের পি. সি.।

সূর্য পাটে বসেছে, রক্তলাল বিশাল এক থালার মত ওটা, আর একটু পরই সন্ধে নেমে আসবে।

হাতে অটোমেটিক রাইফেল, খানিকটা দূর থেকে ওদের ওপর লক্ষ্য রাখছে একজন সৈনিক, পরনে হেলমেট আর মাস্কসহ প্রোটেকটিভ সুট। ট্রেনের পিছনের এঞ্জিনের মাথায় ছিল সে, এইমাত্র নেমে এসেছে–ওয়াশ করা ব্রেন, মিলিটারি হাইকমান্ডের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার ট্রেনিং পেয়েছে, আপোস করতে জানে না।

হঠাৎ প্রথমে তাকে ডোনা দেখতে পেল। চেলসির হাত ধরে টান দিল সে। চেলসি ঘুরল, ঘুরতেই দেখতে পেল সশস্ত্র সৈনিককে। ভয়ে শুকিয়ে গেল মুখ, ভাঙা গলায় জানতে চাইল, 'কে আপনি?'

কোন জবাব নেই। এক পা সামনে বাড়ল সৈনিক।

'বলুন কে আপনি? নিজের পরিচয় দিন!' চেলসিও এক পা সামনে এগোল।

কোন জবাব নেই।

দুই হাত দু'দিকে মেলে ছুটল চেলসি। নেলসন আর টাওয়েল বাধা দেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সে।

সৈনিক গুলি করল। বুলেটটা চেলসির ক্যামেরা গুঁড়িয়ে দিল। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেল চেলসির চোখ। হাঁ করে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে। সমস্ত ঘটনার রেকর্ড ধ্বংস হয়ে গেছে। বোকার মত আবার সৈনিকের দিকে তাকাল ও। কোন কারণ ছিল না, যুক্তিসিদ্ধও নয়, তবু কেন যেন মনে হয়েছিল লোকটা রানা হতে পারে। জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুলটা করে বসেছে সে, এখন তার মাসুল দিতে হবে।

আবার রাইফেল তাক করল সৈনিক। পাথর হয়ে গেছে চেলসি, এক চুল নড়তে পারছে না, নিঃশ্বাস ফেলতেও যেন ভুলে গেছে।

গুলি হলো। দুটো গুলি, তবে একই সঙ্গে হওয়ায় একটাই আওয়াজ শুনতে পেল সবাই।

গুলি হবার ঠিক আগের মুহূর্তে পিছন থেকে চেলসিকে ধাক্কা দিয়েছে টাওয়েল। সৈনিকের বুলেট চেলসিকে লাগেনি, লেগেছে টাওয়েলকে। কেউ তার দিকে তাকাতে পারছে না, কারণ তার মাথার একটা পাশ উড়ে যাওয়ায় কুৎসিত আর বীভৎস দেখাচ্ছে ক্ষতটা।

দ্বিতীয় গুলিটা এসেছে চেলসি আর টাওয়েল যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই জায়গার পিছন থেকে–সরাসরি নয়, একটু ডান দিক থেকে। টাওয়েল আর সৈনিক একই সঙ্গে ছিটকে পড়েছে, সৈনিকের মুখোশ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়েছে অটোমেটিক পিস্তলের বুলেট। মগজ ছাতু হয়ে গেলে মানুষ বাঁচে না, সে-ও বেঁচে নেই।

ঘাড় ফিরিয়ে সবাই তাকাল। শান্ত, দৃঢ় পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে রানা। চেলসির কাছ থেকে সাত গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে রেখে ট্রাউজারের পকেট থেকে বের করল ইরিডিয়াম টেলিফোনটা।

চেলসি এই মুহূর্তে দমকা বাতাস, উড়ে এসে আছাড় খেলো রানার বুকে। রানার মুখে চওড়া হাসি।

'ইউ বাস্টার্ড!' সীমাহীন পরম আনন্দে চেলসি আত্মহারা, সম্বোধনটা ভব্যতাবর্জিত হলেও তাতে শুধু নিখাদ আদর আর ভালবাসাই প্রকাশ পেল। 'আমি জানতাম! আমরা সবাই জানতাম–এতগুলো মানুষকে তুমি কাঁদাতে পারো না!'

কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। প্রায় এক হাজার প্যাসেঞ্জার, ইতিমধ্যে প্রায় সবারই ওষুধ খাওয়া হয়ে গেছে, রানাকে দেখে যে হাসিটা তারা হাসছে সেটাকে কান্নাই বলতে হবে, কারণ সবারই চোখ থেকে অঝোর ধারায় পানি গড়াচ্ছে। অনেকেই ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে ফোঁপাতে শুরু করল।

'দুঃখ শুধু একটাই, যে ভদ্রলোকের কল্যাণে আমরা সবাই বেঁচে আছি, তাকে আমি বাঁচাতে পারিনি,' বলল রানা। 'ড. নাসিমুল গনি মারা গেছেন।'

সবাই চুপ করে থাকল, কেউ নড়ছে না, এ যেন পাগলাটে বিজ্ঞানী ড. নাসিমুল গনির সম্মানে নীরবতা পালন।

নিস্তব্ধতা ভাঙল রানাই। 'বিপদ কিন্তু এখনও কাটেনি,' বলল ও। 'নদী থেকে গানবোটের সৈনিকরা উঠে আসতে পারে। ন্যাটো আরও নতুন আমেরিকান সৈন্যও পাঠাতে পারে–আমাদেরকে মেরে ফেলার জন্যে...'

সবার মুখ শুকিয়ে গেল। কেউ নড়ছে না। একা শুধু হাসানকে এগিয়ে আসতে দেখল রানা। কাছে এসে ডিস্কটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। সেটা নিয়ে পকেটে রেখে দিল রানা।

'তবে চিন্তার কিছুই নেই,' সবাইকে আশ্বস্ত করল রানা, হাত তুলে ইরিডিয়াম ফোনটা দেখাল। 'এটা একটা স্যাটেলাইট ফোন। পৃথিবীর যে-কোন দেশের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারব। আপনারা সবাই আবার হাতে অস্ত্র তুলে নিন, হামলা হলে ঠেকাতে হবে। আর আমি জাতিসংঘ, ইন্টারপোল, চীন ও রুশ

সরকার, বিবিসি, সিএনএন, রয়টার–সম্ভাব্য সব জায়গায় ফোন করে কি ঘটেছে আর কি ঘটতে পারে জানিয়ে দিচ্ছি…'

এক-পা দু-পা করে এগিয়ে এসে রানার একটা হাত ধরল ডোনা। 'তাহলে আমার মামীকেও একটা ফোন করে দিন, বলুন আমার ন্যানি মিসেস আধুরা মারা যাওয়ায় আমি খুব দুঃখ পেয়েছি, তবে আমার জন্যে যেন চিন্তা না করে…'

'ঠিক আছে, ডোনা, তোমার মামীকেও ফোন করব।'

***

সিক্রেট এজেন্ট

প্রথম প্রকাশ:২০০২

এক

যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়ায় প্লেন ঘুরিয়ে নিয়েছে পাইলট। এই মুহূর্তে হাখা ও আকিয়াবের মাঝখানে রয়েছে ওরা। নিচে বিশাল বনভূমি ও দুর্গম পাহাড়। প্লেনে ওরা সব মিলিয়ে মাত্র তিনজন—পাইলট, কো-পাইলট ও একমাত্র প্যাসেঞ্জার ড. মুহিত হায়দার। রাতেই রেঙ্গুনে পৌঁছাতে হবে, তাই প্লেনটা চার্টার করেছেন ড. হায়দার। চার সীটের ছোট্ট প্লেন, তাঁর পাশের সীটটা খালি।

প্লেনের একমাত্র এঞ্জিন খক খক করছে, নিয়মিত ছন্দে বিঘ্ন ঘটছে ঘন ঘন। অ্যালুমিনিয়ামের শরীর মাঝে-মধ্যে কেঁপে উঠছে থরথর করে। কাছাকাছি কোন এয়ারপোর্ট নেই, একমাত্র ভরসা সিতওয়ে বা আকিয়াবের সামরিক ঘাঁটির এয়ারস্ট্রিপ। কিন্তু সেটা পঞ্চাশ মাইল দূরে এখনও, পৌঁছানো বোধহয় সম্ভব হবে না।

'গোলমালটা ধরা পড়ল?' চিৎকার করলেন ড. হায়দার, নাহলে পাইলট শুনতে পাবে না।

ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে লাল ওয়ার্নিং লাইট জ্বলছে। ব্যস্ত হাতে লিভার টানছে আর বোতাম টিপছে পাইলট। ফুয়েল গজের কাঁটা দ্রুত নিচে নামছে। এঞ্জিনের শব্দ শুনে মনে হলো আক্রোশে ফুঁসছে, পারলে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে নিজেকেই।

'ফুয়েল লাইনে লিক,' জবাব দিল কো-পাইলট, প্যাসেঞ্জারকে অন্ধকারে রাখতে রাজি নয় সে। 'গন্ধটা পাচ্ছেন না? গ্যাস!'

ঝাঁঝাল ধোঁয়ায় ভরে উঠল কেবিন। এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল, তারপর যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার চালু হলো, আগের চেয়েও বেড়ে গেল শুকনো কাশি। স্পীড কমে গেছে। নিচে খসে পড়ছে ওরা।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে পাশের খালি সীটের দিকে একবার তাকালেন ড. হায়দার। তাঁর তরুণ সহকারী রায়হানের থাকার কথা ছিল ওখানে। কিন্তু প্লেন টেক-অফ করার নির্দিষ্ট সময়ে এয়ারস্ট্রিপে আসেনি সে। একজন মেকানিককে জিজ্ঞেস করায় সে বলল, রায়হানকে বার্মীজ লুঙি পরা অবস্থায় একটা মদের দোকানে দেখেছে, টাল হয়ে আছে মদ খেয়ে।

কন্ট্রোলের সঙ্গে মরিয়া হয়ে যুদ্ধ শুরু করলেও প্লেনের অধোগতি থামাতে পারছে না পাইলট। এঞ্জিন বন্ধ করে ফ্ল্যাপ কাজে লাগাল সে, প্লেনের স্পীড যাতে লিক করা ফুয়েলে আগুন না ধরায়। 'কোন কাজ হচ্ছে না। প্লেন নামাতে হবে।'

'কোথায়?' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল কো-পাইলট।

নিচের গভীর জঙ্গল ও পাহাড়ে সাদা আলো ফেলেছে কানা ভাঙা চাঁদ, বড়

আকারের ফাঁকা বা সমতল জায়গা চোখে পড়ছে না কোথাও।

'প্যারাশুট?' প্যাসেঞ্জার ড. হায়দার জিজ্ঞেস করলেন।

পাইলটের মুখে গম্ভীর হাসি, মাথা নেড়ে বলল, 'নেই। অবশ্য আর সময়ও নেই।'

জমিন দ্রুত উঠে আসছে। নীলচে ও ভৌতিক শিখা ছড়িয়ে পড়ল এঞ্জিন কাউলিং-এর ওপর।

'আগুন ধরে গেছে!' চেঁচিয়ে উঠল কো-পাইলট।

পাইলট হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ল জানালার ওপর। 'আরে! থামো...থামো! কি যেন দেখতে পাচ্ছি...'

'কি?'

'ওই তো, সরাসরি সামনে–দেখে মনে হচ্ছে লেক!'

দীর্ঘ একটা উপত্যকার শেষ প্রান্তে ওটা। লেক না বলে বিশাল পুকুর বলাই ভাল, চাঁদের আলো পড়ায় কালো আয়নার মত লাগছে। তবে বেশিক্ষণ ওটা দেখা গেল না। জ্বলন্ত এঞ্জিনের আগুন আর ধোঁয়ায় দৃশ্যটা ঢাকা পড়ে গেল।

'প্লেনটা ওখানে ফেলার চেষ্টা করছি আমি,' বলল পাইলট, ভাবলেশহীন কণ্ঠস্বর। 'রেডিওতে আমাদের পজিশন জানাও।'

হাতের মাইক্রোফোন মুখের সামনে তুলে কো-পাইলট চিৎকার করে বলল, 'মেডে! মেডে!'

পুরো মেসেজটা প্রচার করার সময় পাওয়া গেল না। উপত্যকার বিশ গজ ওপর দিয়ে ছুটে এসে লেকের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্লেন। পড়েই টুপ করে ডুবে গেল ওটা। একে তো গভীর রাত, তার ওপর এলাকায় কোন জনবসতি নেই, এত বড় একটা দুর্ঘটনার কথা জানতে পারল না কেউ।

দুই

দশ বছর পরের ঘটনা।

বার্মার নাম বদলে এখন মায়ানমার। রাজধানী ইয়ানগন থেকে কয়েকশো মাইল দূরে আকিয়াব। মায়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি ছোট্ট একটা শহর পুতাপাই। পুতাপাই মিশনারি স্কুলের অধ্যক্ষ ও স্কুল সংলগ্ন চার্চের যাজক ফাদার বেঞ্জামিন উইন শেইন আশপাশের গ্রাম থেকে রোগী দেখে ফিরে আসছেন। ফাদার শেইন কেবল পিতা নন, একজন চিকিৎসকও বটেন। যে-সব রোগী তাঁর কাছে আসতে পারে না, তিনি নিজেই তাদেরকে দেখতে যান। আকাশে মেঘ নেই, চাঁদের আলোয় পথ চিনতে তাঁর কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

বেশ রাত হয়েছে, চৌরাস্তায় কোন লোকজন নেই। নামেই শহর, আসলে বড়সড় একটা গ্রাম, খেয়েদেয়ে সন্ধের পরই ঘুমিয়ে পড়ে মানুষ। ক্লান্ত পা

দুটোকে টেনে টেনে চার্চের দিকে হাঁটছেন ফাদার শেইন। হাত-মুখ ধুয়ে এক বাটি গরম সুপ খাবেন তিনি, তারপর তিনিও বিছানায় গা এলিয়ে দেবেন।

অকস্মাৎ একটা বাড়ির কার্নিসে বিস্ফোরিত হলো কয়েক জোড়া ডানা, ফাদারকে চমকে দিয়ে পেঁচানো সিঁড়ির মত আকৃতি তৈরি করে আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে কিছু প্রাণী। বাদুড়, ভাবলেন ফাদার।

কিন্তু না, বাদুড় নয়। পাখি। প্রতি মুহূর্তে সংখ্যায় বাড়ছে ওগুলো, মেঘের মত ঢেকে দিচ্ছে আকাশটাকে। পুতাপাই ছেড়ে পালাবার সময় আতংকে কর্কশ ডাক ছাড়ছে।

শহর জুড়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল কুকুরগুলো।

অন্ধকার জানালা হলদেটে আলোয় ভরে গেল শহরের লোকজন জেগে গেছে।

উঁচু টাওয়ারের মাথায় চার্চের পুরানো লোহার ঘণ্টাটা ঢং করে ভোঁতা একটা আওয়াজ করল। একটু পর আবার। চার্চ সংলগ্ন মিশনারি স্কুলের গেট খুলে গেল, স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। 'ফাদার শাইন! এত রাতে বেল বাজাচ্ছে কে?'

'স্যার, মি. গুডফেলো, বেল আপনাআপনি বাজছে!' হতভম্ব ফাদার বললেন। ঘণ্টা এখন থেমে থেমে নয়, বারবার একনাগাড়ে বাজছে।

'ভূমিকম্প!' হেডমাস্টার গুডফেলো চিৎকার করে উঠলেন। ছুটে এসে ফাদারের হাত ধরলেন তিনি, টেনে সরিয়ে আনলেন চার্চ ভবনের পাশ থেকে খোলা জায়গায়।

শহরের লোকজন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে যে যেদিকে পারে ছুটছে।

চৌরাস্তা কাত হলো, ওঠা-নামা শুরু করল অশান্ত সাগরের মত। ঝন ঝন শব্দে ভেঙে পড়ছে জানালার কাঁচ। ছাদের টালি আর ভাঙা পাঁচিলের আবর্জনা জমে উঠল রাস্তায় রাস্তায়। চার্চের ঘণ্টা ঢং-ঢং করে বেজেই চলেছে।

তারপর এক সময় আলোড়ন ও কাঁপুনি ধীরে ধীরে কমে এল। আফটারশক হিসেবে দু'একটা ঝাঁকুনি লাগল বটে, তবে তাতে তেমন কোন ক্ষতি হলো না। আটকে রাখা নিঃশ্বাস ছেড়ে ফাদার বেঞ্জামিন শেইন বললেন, 'সকল প্রশংসা ঈশ্বরের। তিনি আমাদের রক্ষা করেছেন।'

শহরের লোকজন ফিরে আসছে। এদিকে খ্রিস্টানদের সংখ্যা কম নয়, তারা ফাদারের সঙ্গে চার্চে গেল প্রার্থনায় যোগ দিতে। পুরোহিতের ডাকে বৌদ্ধরা চলে গেল প্যাগোডার দিকে। এলাকায় একটা মসজিদ থাকলেও, বেশ দূরে সেটা, সেদিক থেকে মোয়াজ্জিনের অস্পষ্ট গলা ভেসে এল--আযান দিচ্ছেন তিনি।

শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমির কারণে আকিয়াবের দূর-দূরান্তে আসা যাওয়া করা অত্যন্ত কঠিন। পুরো ছত্রিশ ঘণ্টা পর ফাদার বেঞ্জামিন শেইন জানতে পারলেন ভূমিকম্পটা আসলে সামান্য একটু নাড়া দিয়ে গেছে পুতাপাই শহরটাকে। মূল ধাক্কাটা লেগেছে বিশ মাইল দক্ষিণের খোলা একটা উপত্যকায়।

খামারবাড়ির মালিকরা রাখাল পাঠিয়ে ফাদার শেইনকে খবর দিল। ভূমিকম্প নাকি বিস্ময়কর একটা ঘটনা ঘটিয়ে গেছে। ফাদার যেন একবার এসে দেখে যান।

তিন

রাজধানী ইয়ানগন। দৈনিক মায়ানমার-এর অফিস বিল্ডিং। রাত দেড়টা।

কাইয়ো মোয়ি রীতিমত বিমূঢ়। 'ভূমিকম্পে ছোট একটা লেকের সমস্ত পানি বেরিয়ে গেছে। তলায় পাওয়া গেছে বিধ্বস্ত একটা প্লেন। দশ বছর আগে নিখোঁজ হয়েছিল এই প্লেন। স্ট্রেঞ্জ!'

'ওটা সাধারণ কোন প্লেন নয়,' পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর হলা উইন বললেন। ভদ্রলোক এত রোগা, দেখে মনে হয় অসুস্থ। চোখ দুটো সব সময় ক্লান্ত থাকায় আসল বয়স পঞ্চাশের চেয়ে দশ বছর বেশি দেখায়।

পত্রিকার মালিক ও প্রকাশক কাইয়ো মোয়ি দেবতুল্য চরিত্রের অধিকারী। তাঁর গুণের কথা লোকের মুখে মুখে ফেরে। পরিশ্রম, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও সততার সমষ্টিই যে সাফল্যের চাবিকাঠি, তিনি তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। 'কি কারণে ওটা সাধারণ প্লেন নয়?' নির্লিপ্ত স্বরে জানতে চাইলেন ভদ্রলোক। সবাই জানে রহস্য ও নাটকীয়তার ভক্ত তিনি; এই মুহূর্তেও ভাল করে তাকালে কৌতুকের ঝিলিক দেখা যাবে তাঁর চোখে।

'প্লেনটা পৃথিবী বিখ্যাত একজন বাঙালী আর্কিওলজিস্ট ড. মুহিত হায়দারকে নিয়ে নিখোঁজ হয়েছিল।'

'তো?'

খিন পায়োনি, হলা উইনের অ্যাসিস্ট্যান্ট, বলল, 'আমরা খোঁজ নিতে গিয়ে আশ্চর্য সব কথা শুনতে পেয়েছি। মায়ানমার আর্কিওলজিকাল সোসাইটি ব্রিটিশ আর্কিওলজিকাল সোসাইটির মাধ্যমে ড. হায়দারকে অনুরোধ করেন আমাদের ফালাম অঞ্চলটা খুঁড়ে-টুড়ে পরীক্ষা করে দেখার জন্য। আমরা সবাই জানি, বহুকাল থেকে বলা হচ্ছে ফালাম অঞ্চলে প্রাচীন মং ও বৌদ্ধ সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে। গুজব হলো, ড. হায়দার নাকি মাটি খুঁড়ে ওই দুই সভ্যতার নমুনা খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু তা আবার মাটি চাপা দেয়া হয়েছে।'

'সেকি! কেন?'

'মাটি খুঁড়ে যে শহরটা পাওয়া যায় সেখানে নাকি কোটি কোটি ডলারের আর্টিফ্যাক্ট ছিল,' বলল খিন পায়োনি। 'কিন্তু সে-সব আমাদের সরকারের হাতে তুলে দিতে ব্যর্থ হন ড. হায়দার। বলা হয়, সমস্ত আর্টিফ্যাক্ট তিনি মেরে দেয়ার প্ল্যান করেছিলেন। আবার এ-ও শোনা যায় যে রোহিঙ্গা গেরিলারা সব লুট করে নিয়ে গেছে। সে-সময় পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস আইএসআই রোহিঙ্গাদের

অস্ত্র ও ট্রেনিং দিয়ে সাহায্য করছিল। তবে এ-সবই বাতাসে ওড়া কথা। দশ বছর আগে ঠিক কি ঘটেছিল আজ আর তা নিশ্চিতভাবে জানার কোন উপায় নেই।'

'ইন্টারেস্টিং, তবে শুধু অ্যাকাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে,' বলে মুখের সামনে হাত এনে হাই তুললেন কাইয়ো মোয়ি। 'কারণ পরে তো জানা গেছে প্লেনটা সনাক্ত করতে ভুল হয়েছিল। ওটা দশ বছর আগের সেই প্লেন নয়। তিন বছর আগের একটা সার্ভে প্লেন।'

'আমরা তা মনে করি না,' বললেন হলা উইন।

'কিন্তু দু'দিন আগে আপনিই তো আমাকে এই কথা বলেছেন!'

কোল থেকে মোটা একটা ফোল্ডার তুলে ডেস্কের ওপর রাখলেন ম্যানেজিং এডিটর হলা উইন। 'দু'দিন আগে এটা আমি পাইনি।'

নিজের রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে উইনের পিছনে চলে এলেন মোয়ি, উইনের কাঁধের ওপর দিয়ে ফোল্ডারটা খুলতে দেখছেন। ভেতর থেকে বেরুল টাইপ করা স্টেটমেন্ট, জেরোক্স লগবুক এন্ট্রি, ফ্লাইট প্ল্যান, ম্যানিফেস্ট, বিধ্বস্ত প্লেনের ফটোগ্রাফ ইত্যাদি। 'মাল-মশলা তো কম নয়,' বললেন তিনি। 'এগুলোর অর্থ কি?'

'এগুলো প্রমাণ করে প্লেনটা ড. হায়দারেরই। আরও প্রমাণ করে, ব্যুরো অভ অ্যারোনটিক্স-এর ইন্সপেক্টর গাইয়ো সান ওটাকে জিয়োসার্ভে প্লেন বলে মিথ্যে সার্টিফিকেট দিয়েছেন।'

'ভাল করে না জেনে কাউকে মিথ্যুক বলা ঠিক নয়,' বললেন মোয়ি। 'তাঁর হয়তো ভুল হয়েছে।'

'সেক্ষেত্রে তিনি আমাদের ফোন ধরছেন না কেন?' জানতে চাইল খিন পায়োনি। 'সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, লোক মারফত প্রত্যাখ্যান করেছেন। সৎ একজন মানুষের আচরণ এরকম হতে পারে না।'

'নিজের ভুল সহজে কেউ স্বীকার করতে চায় না,' নরম সুরে বললেন প্রকাশক ভদ্রলোক। 'বিশেষ করে ব্যুরোক্র্যাটরা।'

'এরমধ্যে আরও জটিলতা আছে,' বললেন হলা উইন। 'কেউ একজন চাইছে এই ব্যাপারটা আমরা যেন ইনভেস্টিগেট না করি।'

'হোয়াট!' এতক্ষণে প্রকাশক মোয়ি যেন জেগে উঠলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন অবস্থাতেই আপস করতে রাজি নন তিনি। 'সব কথা খুলে বলুন আমাকে।'

'হতার মাইয়াতকে আমি ফলো আপ অ্যাসাইনমেন্ট বুঝিয়ে দেয়ার পর নিজের পরিচয় না দিয়ে এক লোক আমাকে টেলিফোন করেছে, আমার অফিস কামরায়,' বললেন উইন। 'হুমকি দিয়ে বলল, সংশ্লিষ্ট সবার ভালর জন্যেই এ-ব্যাপারে আমরা যেন কোন খোঁজ-খবর না করি।'

'ভাল লাগল! দারুণ উত্তেজনা বোধ করছি!' হাতের তালুতে ঘুসি মারলেন মোয়ি। 'কেউ হুমকি দিলে মনে করতে হবে তার পিছনে উপযুক্ত কারণ আছে। স্টোরিটা জমবে!'

'আমি জানতাম আপনি এ-কথা বলবেন।'

এগিয়ে এসে একটা জানালা খুললেন মোয়ি। 'চুরুটের বিষাক্ত ধোঁয়ায় আমার অফিসটাকে আপনারা গ্যাস-চেম্বার বানিয়ে ফেলেছেন।' খোলা জানালা দিয়ে আসা তাজা বাতাস বুক ভরে নিলেন। উঁকি দিয়ে বারোতলা নিচের রাস্তায় লোকজন বা যানবাহন কিছুই দেখতে পেলেন না। গ্রাউন্ড ফ্লোরে পত্রিকা ছাপার কাজ চলছে, তবে সেখানকার ব্যস্ততা ও শোরগোলের কোন প্রভাব এখানে পড়ছে না। 'আমাদের হ্তার মাইয়াত গেল কোথায়? এটা তো তারই স্টোরি, তাই না?'

'সে এখনও ইন্সপেক্টর গাইয়ো সানকে ধরার চেষ্টা করছে,' পায়োনি বলল।

'ধরার চেষ্টা মানে তার বাড়ির ওপর নজর রাখছে,' বললেন উইন। 'আমরা আসলে আপনার অনুমতির অপেক্ষায় আছি, মি. মোয়ি।'

'গো অ্যাহেড!'

'গ্রেট!'

অফিসের বাইরে, করিডর থেকে ভোঁতা একটা চিৎকার ভেসে এল।

'ও কিসের আওয়াজ?' ভুরু কোঁচকালেন মোয়ি।

তিনজনই ওঁরা কান পাতলেন। কিন্তু আওয়াজটা আর হলো না।

পায়োনি কাঁধ ঝাঁকাল। 'দারোয়ানরা ছাড়া আর কারা হবে! ছোকরাগুলো ফাজিল টাইপের।'

ডেস্কের ডকুমেন্টগুলো নেড়েচেড়ে দেখছেন মোয়ি। 'হ্তার মাইয়াত সত্যি খেটেছে।'

'এ-সব কিন্তু মায়াত সংগ্রহ করেনি,' বললেন উইন।

'মানে? তাহলে এ-সব আপনি কোত্থেকে পেলেন?'

'পিয়ন গোছের এক লোক দিয়ে গেছে। দিয়েই কেটে পড়েছে, কোন প্রশ্ন করার সুযোগ পাইনি।'

'ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না।' গম্ভীর হলেন মোয়ি। 'আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, কেউ ভুল তথ্য দিয়ে আমাদেরকে বোকা বানাবার প্ল্যান করেনি তো?'

'সূত্র অজ্ঞাত হলেও, তথ্যগুলো ভুয়া নয়,' বললেন উইন। 'চেক করে দেখা হয়েছে।'

চিবুকে হাত বোলাচ্ছেন মোয়ি। 'পরস্পরবিরোধী দুটো পক্ষ। এক পক্ষ চাইছে তদন্ত করে গোপন সব তথ্য যাচাই ও প্রকাশ করি আমরা। আরেক পক্ষ হুমকি দিয়ে বলছে সব গোপন থাকুক। ভাবছি, কি কারণে দুই পক্ষের কাছেই দশ বছর আগেকার একটা বিধ্বস্ত প্লেন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল।'

'ইনভেস্টিগেট করে সেটাই আমাদেরকে জানতে হবে,' বললেন উইন।

'কিন্তু তোমরা এরইমধ্যে অনেক বেশি জেনে ফেলেছ।'

তিনজনই ওরা অচেনা লোকটার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

লোকটা ছোটখাট, শরীরের তুলনায় মাথাটা প্রকাণ্ড। তার এক হাতে পিস্তল, অপর হাতে ব্রিফকেস।

পিছু নিয়ে তার একজন সঙ্গী ঢুকল চেম্বারে। দ্বিতীয় লোকটাকে কুৎসিতদর্শন একটা পাওয়ারহাউস বললেও চলে; ছয় ফুট ছয় ইঞ্চির কম নয়, গুটানো আস্তিনের নিচে লোমশ হাত দুটোর ফোলা পেশী অতি সাহসী মানুষের মনেও ভয় ধরিয়ে দেবে। সঙ্গে কোন অস্ত্র না থাকার কারণটাও পরিষ্কার—ওই হাতই তার অস্ত্র। চোখ দুটো এত ছোট, যেন সারাক্ষণ বুজে আছে।

ধাক্কাটা উইনই সবার আগে সামলে উঠলেন। ভয় নয়, রাগ হচ্ছে তাঁর। 'কারা তোমরা? এখানে কি চাও?'

'আয়-হায়, কি বলে!' ছোটখাট লোকটা হতাশ হবার ভঙ্গি করল। 'এ-ও বিশ্বাস করতে বলো যে আমাকে তোমরা চিনতে পারছ না? কেন, তোমাদের পেপারে তো বেশ কয়েকবারই আমার কথা লেখা হয়েছে!'

'হ্যাঁ, বেশ কয়েকবারই,' তার সঙ্গীর গলা থেকে যেন গুড়গুড় করে মেঘ ডাকল।

'মি. উইন, কে এই লোক?' তিক্তকণ্ঠে জানতে চাইলেন মোয়ি।

'জানি না, মি. মোয়ি। জানি না, জানতে চাইও না। তবে এখুনি ওকে চলে যেতে হবে, তা না হলে আমি পুলিস ডাকব।'

'শান্ত হন, উইন,' বললেন মোয়ি। 'ওদের যদি কিছু বলার থাকে তো শুনুন...'

সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে একপাশে সরে যাচ্ছে পায়োনি।

'নাহ্! নাহ্!' খর্বকায় লোকটা সহাস্যে মাথা নাড়ছে, যেন কোন নাটকে পাগলের অভিনয় করছে সে। 'তুমি পুলিস ডাকবে, এ আমি বিশ্বাস করি না। নাহ্!'

'দেখতে চাও?' বলে ডেস্কের ওপর রাখা টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন উইন।

খাটো লোকটা কোমরের কাছ থেকে একটাই গুলি করল। গুলির চেয়ে যেন বেশি শব্দ করল বিস্ফোরিত টেলিফোন সেটটা।

আতংকিত পায়োনির গলা থেকে দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে সে।

প্রকাশক মোয়ি মাথা উঁচু করে অটল দাঁড়িয়ে। তবে সামান্য একটু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাঁকে।

নিজের মুখে হাত বোলালেন উইন। ভাঙা টেলিফোনের টুকরো লেগে কয়েক জায়গার চামড়া কেটে গেছে। 'ঠিক আছে,' অসহায় একটা ভঙ্গি করে বললেন তিনি, 'তোমার ভাষা বুঝলাম। বলো কি চাও তুমি।'

'এই, তুমি এত ঠাণ্ডা কেন?' হিজড়াদের মত অশ্লীল একটা ভঙ্গি করে বলল খাটো শয়তান।

'ঠাণ্ডা কেন?' একই প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করল তার সঙ্গী। 'ওস্তাদ, তুমি বললে শালাকে আমি গরম কাবাব বানিয়ে দিই। বানাই?'

'তোমরা কি টাকা চাও?' পকেটে হাত ভরতে গেলেন মোয়ি।

'খবরদার!' গর্জে উঠল লোকটা। 'আমরা চোর-ডাকাত নই যে টাকা দিয়ে ভোলাতে পারবে।'

'তাহলে কি তোমরা?'

'আমি হিনান ফো।' বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে প্রকাণ্ড মাথাটা নোয়াল লোকটা। 'আর ও হলো আমার প্রিয় শিষ্য চো মাউং।'

সাড়ে ছ'ফুটের গলা থেকে আবার মেঘ ডাকার গুড়গুড় আওয়াজ বেরিয়ে এল—হাসছে সে।

'হিনান ফো!' পায়োনির আঁতকে ওঠার শব্দটা হাঁপানির মত শোনাল।

'বাহ্! একজন অন্তত এই অধমকে চেনে!'

'কে ও, পায়োনি?' আবার জানতে চাইলেন মোয়ি।

জবাব দিলেন উইন। 'গুণ্ডা! খুনী! রেপিস্ট! কিডন্যাপার! আরসনিস্ট!' একটু কাঁপছেন তিনি; রাগে নয়, ভয়েই।

'ইয়েস, আরসনিস্ট!' হাসছে হিনান ফো। 'আমি আগুনের কারবারী।'

'কিন্তু এখানে কি চায় ও?' পায়োনির বিকৃত কণ্ঠস্বর চেনা যাচ্ছে না।

'এসেছিলাম তো সূত্র জানতে, তথ্যগুলো কোত্থেকে তোমরা পেলে। কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে শুনলাম, তোমরা নিজেরাই জানো না।'

'নিজেরাই জানো না,' আবার মেঘ ডাকল।

ডেস্ক থেকে একটা ফটো তুলে পরীক্ষা করছে হিনান ফো। 'সব দেখছি সাজিয়ে রেখেছ—ভাল, ভাল।'

'এটাই তোমাদের বিষয়?' জিজ্ঞেস করলেন মোয়ি। 'পুরানো প্লেনটা?'

'হ্যাঁ।'

'তুমিই তাহলে ফোনে আমাকে হুমকি দিয়েছ?' কোমরে হাত রাখতে গিয়েও নামিয়ে নিলেন উইন।

'আমার নির্দেশ তোমার মেনে চলা উচিত ছিল,' চোখ রাঙিয়ে বলল ফো।

'তুমি চাও ওই প্লেনের খবর আমরা না ছাপি?' জিজ্ঞেস করলেন মোয়ি। 'ঠিক আছে, ছাপব না। সন্তুষ্ট? আর কোন দাবি আছে?'

'মি. মোয়ি!' তীক্ষ্ণস্বরে প্রতিবাদ করলেন উইন। 'কি বলছেন আপনি!'

তাঁর কথায় কান না দিয়ে প্রকাশক মোয়ি বললেন, 'সমস্ত তথ্য এই ডেস্কেই আছে। সব তুমি নিয়ে যাও। এ বিষয়ে আমাদের পত্রিকায় একটা হরফও লেখা হবে না। কথা দিলাম।'

'মি. মোয়ি! আপনার কি মাথা খারাপ হলো? একজন সন্ত্রাসীর কাছে আপনি এভাবে মাথা নত করবেন, এ আমি ভাবতেই পারছি না...'

'শাট আপ!' কড়া ধমক দিলেন মোয়ি। 'এটা লেকচার দেয়ার সময় নয়। আমার প্রথম দায়িত্ব সবার প্রাণ বাঁচানো।' ফোর দিকে তাকালেন তিনি। 'আমরা একটা চুক্তিতে আসব, ঠিক আছে?'

'ভেবে দেখতে হবে,' জবাব দিল ফো। 'তোমাদের কাছে এই ডকুমেন্টগুলোর আর কোন কপি নেই?'

'না, নেই। মি. উইন, আর কোন কপি আছে কিনা জানেন?'

মাথা নাড়লেন উইন। 'কার পাল্লায় পড়েছেন আপনার কোন ধারণা নেই, মি. মোয়ি।'

'আমার কথার জবাব দিন! আর কোন কপি আছে?'

'হ্যাঁ!' উইন বললেন। 'হ্যাঁ, আছে বৈকি! আরও দুটো করে কপি আছে! এবং আমার যদি কিছু ঘটে, সেগুলো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে যাবে।'

'আপনি নিজেই না বললেন, ও খুনী?' রাগে লাল হয়ে উঠল মোয়ির মুখ। 'তাহলে মিথ্যে কথা বলে ধোঁকা দিচ্ছেন কেন?'

'কে বলল আমি ধোঁকা দিচ্ছি?' উইন হঠাৎ শান্ত হয়ে গেছেন। 'দুই সেট কপি সত্যি আছে। পায়োনিও জানে।'

'আমার ধারণা তুমি জুয়া খেলছ,' বলল ফো। 'নিজের জীবনের ওপর বাজি রেখে যারা জুয়া খেলে আমি তাদেরকে পছন্দ করি—প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। মাউং, ওই শালার অ্যাসিস্ট্যান্টকে গান গাওয়াও।'

মাউং হাসতে হাসতে পায়োনির দিকে এগোল।

'না! পায়ে পড়ি! না!' এক কোণে আটকা পড়েছে পায়োনি। সবেগে হাত ঝাড়ছে সে, এভাবে যেন মাউংকে দূরে রাখতে পারবে। 'উনি মিথ্যেকথা বলছেন! সত্যি কোন কপি নেই!'

'কি করলে বুঝতে পারছ, পায়োনি?' হতাশায় ভেঙে পড়লেন উইন। 'তুমি আমাদেরকে খুন করলে।'

'না! না!' দু'হাতে মুখ ঢাকল পায়োনি।

'বারবার খুন-খারাবির কথা উঠছে কেন? উইন, তুমি একটা হারামির হাড়। তোমার বস্ কি বলল শুনলে না? এটা স্রেফ একটা চুক্তি—ব্যবসায়িক চুক্তি।'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমরা আপসে মিটিয়ে ফেলব,' বললেন মোয়ি, চোখেমুখে ব্যগ্র একটা ভাব ফুটে উঠেছে। 'সবাই জানে কাগজের লোক আর পুলিসকে তুমি মারো না। কি চাও বলো। কত টাকা? তোমার সব দাবি আমি মেনে নেব। তবে তার আগে ওদের দু'জনকে তুমি এখান থেকে চলে যেতে দাও। ভয় নেই, ওরা পুলিসকে খবর দেবে না। সোজা বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়বে। তারপর তুমি আর আমি বসে...'

'তুমি কথা তো বেশি বলছই, আবার আমাকে হাসাচ্ছও,' তিরস্কার করল ফো। 'মাউং, রশি।'

ব্রিফকেস খুলে কয়েক প্রস্থ রশি বের করল মাউং। তার প্রকাণ্ড হাতে সরু সুতোর মত লাগছে ওগুলো।

'রশি কেন?' মোয়ির গলায় সন্দেহ।

'রশি তোমাদের ভালর জন্যে,' বলল ফো। 'আমরা পালাবার সময় তোমরা যদি বাধা দাও, গুলি না করে পারব না। যাতে গুলি করতে না হয়, তাই তোমাদেরকে বাঁধছি।'

অকস্মাৎ দরজার দিকে ছুটলেন উইন। ধাক্কা লেগে একটা চেয়ার উল্টে

পড়ল। ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে এসে তাঁকে বাধা দিল মাউং। উইনের ঘাড়টা একহাতে ধরল সে, তারপর অনায়াস ভঙ্গিতে মেঝে থেকে শূন্যে তুলে ফেলল।

ফোর হাতের পিস্তল পায়োনি আর মোয়িকে কাভার দিচ্ছে। তবে এর কোন প্রয়োজন নেই, পায়োনি ও মোয়ি নিজেদের জায়গায় পাথুরে মূর্তি হয়ে জমে গেছেন।

উইনকে লম্বা করা হাতের শেষ প্রান্তে ধরে রেখেছে মাউং, উইনের অস্থির পা যাতে লাথি মারতে না পারে। ম্যানেজিং এডিটরের চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, সেই সঙ্গে মুখ থেকে জিভটাও। একশো পঁচাশি পাউন্ড উইনকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখতে মাউং-এর কোন অসুবিধেই হচ্ছে না। সে জিজ্ঞেস করল, 'একে নিয়ে কি করব আমি?'

'সবই তোমাকে বলে দিতে হবে?' সঙ্গীকে মৃদু তিরস্কার করল ফো।

'সব আমাকে বলে দিতে হবে?' বিড়বিড় করল মাউং, তারপর দেয়ালের গায়ে উইনের মাথার পিছনটা ধাম করে ঠুকে দিল।

'না!' চোখ বুজে চেঁচিয়ে উঠল পায়োনি।

উইনের খুলি আঘাত করায় দেয়ালের প্লাস্টারে চিড় ধরল। সংঘর্ষের শব্দ উইনের ঘাড় ভাঙার আওয়াজটাকে চাপা দিতে পারেনি।

'না! না-না! এ সত্যি নয়! আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি!' পায়োনি অনবরত প্রলাপ বকে যাচ্ছে।

'শ্-শ্-শ্!' তাকে চুপ করতে বলল ফো। 'তা না হলে মাউং তোমারও আওয়াজ কেড়ে নেবে।'

উইনের শরীরটা ছেড়ে দিল মাউং। দেয়ালে ঘষা খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল লাশ।

'তোমরা অসুস্থ!' মোয়ি হাঁপাচ্ছেন। 'এখন বুঝতে পারছি তোমরা আমাদের খুন করতেই এসেছ।'

'শান্ত হও।' হাসছে ফো। 'চিরকাল অন্য লোকের খবর ছেপে মজা লুটেছ; এখন দেখো নিজে খবর হতে কেমন লাগে। তাছাড়া, এটা একটা বিজনেস ডিল, তাই না? তোমাদের বাঁচাতে চাইছি, এতেই তো বোঝা যায় যে আমি খুন করতে চাই না। মাউং?'

'না, খুন করতে চাই না,' বলে রশি হাতে মোয়ি আর পায়োনির দিকে এগোল মাউং।

পায়োনিকে বাঁধল সে। পায়োনি ফোঁপাচ্ছে।

মোয়ি বললেন, 'ফো, এখনও আমরা একটা আপস মীমাংসায় আসতে পারি। ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। আমাকে আর পায়োনিকে তুমি ছেড়ে দাও। বিনিময়ে যত টাকা চাও দেব।'

তাঁর কথার জবাব না দিয়ে ফো বলল, 'মাউং, ওদের মুখে কাপড় গুঁজে দাও।'

'মুখে কাপড় গুঁজে দেব,' বলল মাউং। 'কেন?'

'কারণ আমার কান অত্যন্ত স্পর্শকাতর,' বলল ফো। 'ওদের কথা বড় বিরক্ত করছে।'

'আমাকে না হোক, পায়োনিকে অন্তত ছেড়ে দাও, শেষ আরেকবার কাতরস্বরে অনুনয় করলেন মোয়ি। 'আমি চিরকুমার, কোন দায়-দায়িত্ব নেই: কিন্তু পায়োনির ছেলেমেয়েরা এখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি। আমার কাছে মাস্টার কার্ড আছে—বলো কত টাকা চাও।'

'আমরা টাকার লোভী নই,' বলল ফো। 'মাউং, কাপড় গোঁজার আগে বানচোতটার মুখে একটা লাথি মারতে ভুলো না। শালা আমাকে ঘুষ দিয়ে দূষিত করতে চাইছে!'

পায়োনির মুখে রুমাল গোঁজার পর মোয়ির হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধল মাউং। পা দুটোও এক করে বাঁধল। পকেট হাতড়ে মানিব্যাগটা বের করে খুলল সে, লাথি মারার কথা ভুলে গেছে। 'শালা এক নম্বর মিথ্যুক। কোথায় টাকা? কোথায় মাস্টার কার্ড?'

মোয়ি তাড়াতাড়ি বললেন, 'চাবি নিয়ে ডেস্কের দেরাজ খোলো, মাস্টার কার্ড পাবে...'

'ওর কথায় কান দিয়ো না, মাউং,' বলল ফো। 'তুমি তোমার কাজ সারো। আমরা এখানে টাকার জন্যে আসিনি।'

'আমরা এখানে টাকার জন্যে আসিনি,' বিড়বিড় করল মাউং। বেশ খানিকটা রশি গোল পাকিয়ে মোয়ির মুখে জোর করে গুঁজে দিল সে। 'ওস্তাদ,' পালাবার সময় কেউ বাধা দিলে? এতবড় অফিস, কেউ নেই তো আশপাশে?'

'ছিল, মাউং। দু'দু'জন দারোয়ান ছিল,' মনে করিয়ে দেয়ার সুরে বলল ফো। 'তুমি তাদেরকে মেরে ফেলেছ।'

'আমি তাদেরকে মেরে ফেলেছি!' মনে পড়তে মাউং-এর চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

'এবার যাও, রস নিয়ে এসো।'

চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল মাউং। হাতির মত পা, অথচ হাঁটার সময় কোন শব্দ হয় না।

একটু পরই পাশের কামরা থেকে চারটে প্লাস্টিকের জাগ নিয়ে ফিরে এল মাউং। গ্যাসলিন, তেল আর পানি মিশিয়ে ভরা হয়েছে ওগুলোয়। শুধু গ্যাসলিনের চেয়ে এই মিশেল অনেক ভালভাবে জ্বলবে।

গ্যাসলিনের গন্ধ পেয়ে পায়োনি আর মোয়ি গোঙাতে শুরু করলেন।

'একটা রাখো ডেস্কের নিচে, একটা ফাইলিং কেবিনেটের পাশে,' বলল ফো। 'বাকি দুটো জাগ চারপাশে খালি করো।'

তৃতীয় জাগটা খুলে ডেস্কে ফুয়েল ঢালল মাউং।

'বেশি করে ঢালো। সমস্ত ডকুমেন্ট পোড়া চাই। সাবধান, তোমার গায়ে যেন আবার না লাগে।'

'আমার গায়ে যেন আবার না লাগে!' চতুর্থ জাগটা খুলে পায়োনি আর

মোয়িকে গোসল করাল মাউং, তারপর ডেস্ক ঘুরে পিছু হটে দরজার কাছে চলে এল। জাগটা খালি করার পর জিজ্ঞেস করল, 'অনুমতি দিচ্ছো তো, ওস্তাদ?'

'দিচ্ছি বৈকি।' সস্নেহে হাসল ফো, চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল।

দেশলাই জ্বালল মাউং। আবার চকচক করে উঠল তার চোখ দুটো।

পায়োনি মেঝেতে কাত হয়ে পড়ল, মেঝেতে ঘষটে ঘষটে দরজার দিকে এগোবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। মোয়ি সম্পূর্ণ শান্ত, বাঁচার কোন উপায় নেই দেখে তিনি তাঁর নিয়তিকে মেনে নিয়েছেন।

জ্বলন্ত কাঠিটা চেম্বারের মেঝেতে ছুঁড়ে দিল মাউং। কার্পেটে ড্রপ খেয়ে ঘরের মাঝখানে স্থির হলো সেটা। হুস করে একটা শব্দের সঙ্গে মিকশ্চারটা জ্বলে উঠল, আগুনের শিখায় ভরাট হয়ে গেল কামরা। ফোর পিছু নিয়ে এলিভেটরের দিকে ছুটল মাউং। করিডরে পড়ে থাকা দুটো লাশ টপকাতে হলো তাদের।

আগুনের শিখা জাগ দুটোর নাগাল পেয়ে গেল। নাপাম বোমার মত বিস্ফোরিত হলো ওগুলো, কেউ যেন নারকীয় অগ্নিঝড়ের লাগাম ছেড়ে দিয়েছে।

নিচে নেমে রাস্তা পেরুল ওরা। গভীর রাত, রাস্তায় লোকজন জমতে সময় লাগল। ততক্ষণে ওই এলাকা থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছে ওরা দু'জন।

'মুখে কিছু গোঁজা না থাকলে আমরা হয়তো এখান থেকেও ওদের চিৎকার শুনতে পেতাম,' মুখ ভার করে বলল মাউং।

'দুঃখ কোরো না,' তার কাঁধ চাপড়ে সান্ত্বনা দিল ফো। 'সামনে আরও সুযোগ আসছে।'

চার

লন্ডন।

অনেকদিন পর আজ আবার ফুপিকে জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ফেলল ঋণী হায়দার। তার একটা প্রতিজ্ঞা নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের গুণে আজ সফল হয়েছে, বাবার মতই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে আর্কিওলজিতে মাস্টার্স পাস করেছে সে। রেজাল্ট পেয়ে দেরি করেনি, বাস ধরে সোজা ফিরে এসেছে ফ্ল্যাটে। তবে তার এই কান্না যতটা না আনন্দের, তারচেয়ে বেশি বেদনার।

একেবারে ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে বাবাকেই একমাত্র আপনজন হিসেবে পেয়েছিল ঋণী। বয়স ও বুদ্ধি বাড়ার পর উপলব্ধি করেছিল, তার বাবার মত আদর্শ মানুষ দুনিয়ায় আর বোধহয় দ্বিতীয়টি নেই। কিন্তু তারপরই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত খবর এল আর্কিওলজিকাল এক্সপিডিশন থেকে মুহিত হায়দার সম্ভবত আর কোনদিন ফিরবেন না, কারণ বার্মায় প্লেন সহ নিখোঁজ হয়েছেন তিনি। শুধু কি নিখোঁজ হলেন? না, সেই সঙ্গে তাঁর নামের সঙ্গে লেপ্টে দেয়া হলো দুরপনেয় একটা কলঙ্ক—ড. মুহিত হায়দার প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার মূল্যের

প্রাচীন বার্মিজ আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া গেছে বলে ঘোষণা দিয়েও তা বার্মা সরকারের হাতে তুলে দিতে ব্যর্থ হন; ফলে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে সারা বিশ্বে গুজব ছড়িয়ে দেয়া হলো, ওগুলো কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন তিনি। বলা হলো, তিনি নিখোঁজ হননি, গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে আছেন কোথাও।

সেটা আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগের ঘটনা, ঋণীর বয়স তখন সবে সতেরো। সেদিনও বাবার নিখোঁজ সংব্যাদ পেয়ে ঠিক এভাবেই ফুপিকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল সে। ফুপা সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। ঋণীকে বোঝালেন, বাবার প্রতি দায়িত্ব পালন করার একটাই উপায়–বাবার মত তাকেও আর্কিওলজিতে মাস্টার্স করতে হবে, সদস্য হতে হবে ব্রিটিশ আর্কিওলজিকাল সোসাইটির, তারপর বার্মায় এক্সপিডিশনের যাবার অনুমতি সংগ্রহ করে তদন্ত চালিয়ে দেখতে হবে তার বাবা সত্যি নিখোঁজ হয়েছেন, নাকি তাঁকে খুন বা গুম করা হয়েছে। পুলিস বা আর কাউকে দিয়ে এ কাজ হবার নয়, ঋণীকেই প্রমাণ করতে হবে তার বাবা অসৎ মানুষ ছিলেন না, তাঁর নামে যা রটানো হয়েছে তার সবই মিথ্যে।

আজ ঋণীর রেজাল্ট। নাসরিন জানত। তাই কিচেনে ব্যস্ত ছিল ভাইঝির প্রিয় একটা রেসিপি তৈরির কাজে। দরজা খোলাই ছিল, ঋণী কখন ফিরেছে টেরও পায়নি সে; টের পেল পিছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধরায়, কাঁধে মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে ওঠায়।

ঋণীকে নিয়ে বেডরুমে চলে এল নাসরিন। ভাল ছাত্রী, পরীক্ষাও খারাপ হয়নি, তবু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'রেজাল্ট ভাল হয়নি?'

একই প্রশ্ন কয়েকবার করতে হলো। অবশেষে ঋণী জবাব দিল, 'সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছি আমি। সেজন্যে কাঁদছি না, কাঁদছি বাবার জন্যে। তোমাকে বলিনি, তবে গত কয়েক দিন ধরে আবার ওরা বাবার কথা লিখছে।'

'ভাইয়ার কথা লিখছে? ভাইয়ার কি কথা লিখছে?' নাসরিন আকাশ থেকে পড়ল। 'আমাকে বলিসনি কেন?'

কথা না বলে ব্যাগ থেকে ব্রিটিশ আর্কিওলজিকাল সোসাইটির সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনটা বের করে ফুপির হাতে ধরিয়ে দিল ঋণী। একই প্রসঙ্গে একাধিক খবর ছাপা হয়েছে পত্রিকায়, এক এক করে সবগুলো পড়ল নাসরিন। ড. মুহিত হায়দারকে নিয়ে হারিয়ে যাওয়া প্লেনটা দশ বছর পর মায়ানমারের আকিয়াব অঞ্চলে পাওয়া গেছে, তারপর সে খবর মিথ্যে বলে দাবি করা হয়েছে, এ বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ আরও খবর ছাপার প্রস্তুতি নেয়ার সময় দৈনিক মায়ানমার-এর প্রকাশক ও সম্পাদক খুন হয়ে গেছেন। 'ঋণী! এ তো ভয়ংকর ব্যাপার! এত কিছু ঘটে গেছে অথচ তুই সব চেপে রেখেছিস কেন?'

ঋণী সে-কথার জবাব না দিয়ে ছলছল চোখে চাইল ফুপির দিকে, 'তোমার কথামত আর্কিওলজি নিয়ে পড়লাম, কিন্তু কি লাভ হলো বলতে পারো?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে নাসরিন বলল, 'ভেবেছিস এত সহজে তোকে আমি হার মানতে দেব? একটা কথা কখনও ভুলবি না, ঋণী–সত্য কোনদিন চাপা থাকে না। মায়ানমারে আজ সামরিক জান্তা ক্ষমতায়, জানি ওদের কাছ থেকে কোন সাহায্য

তুই পাবি না। তাছাড়া, ভাইয়ার নিখোঁজ সংক্রান্ত ব্যাপারটা নিয়ে এখনও যেহেতু খুন-খারাবি চলছে, আমিও তোকে ওখানে পাঠাতে পারব না। তবে সময় কি ফুরিয়ে যাচ্ছে? একদিন ঠিকই সুযোগ আসবে, মায়ানমারে গিয়ে তুই…'

'তুমি সব তথ্য জানো না তাই এ-কথা বলছ,' নাসরিনকে বাধা দিয়ে বলল ঋণী। 'আমি আর্কিওলজি সোসাইটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে কয়েকবার আলাপ করেছি। প্রথম বাধা হলো, কাউকে সরাসরি সদস্য করার নিয়ম নেই ওদের। কোনও এক্সপিডিশনে একজন প্রফেসরের অধীনে অন্তত এক বছর কাজ না করলে সদস্যপদের জন্যে আবেদনই করা যায় না। এরকম বাধা একটা নয়, বহু। তারপর, সদস্য হলেই আমি মায়ানমারে যেতে পারব না। মায়ানমার সরকার যদি আমন্ত্রণ জানায়, সেটা রক্ষা করার দায়িত্ব দেয়া হবে নামকরা কোন প্রফেসরকে, তিনি তাঁর সহকারী হিসেবে আমাকে নিতেও পারেন আবার না-ও নিতে পারেন…'

'ঠিক আছে, বুঝলাম, ব্যাপারটা সোজা নয়…'

'ফুপি,' চোখ মুছে নড়েচড়ে বলল ঋণী, গলায় জোর এনে কথা বলছে। 'আমি পাস করেছি, এখন ভাল একটা চাকরিও পাব।'

'তাই?' খুশি হলেন নাসরিন।

ফুপিকে আবার জড়িয়ে ধরল ঋণী। 'বেঁচে থাকলে মা আমার জন্যে যতটা করত, তুমি তারচেয়েও বেশি করেছ।'

জবাবে কিছু বলা হলো না নাসরিনের, কারণ ঠিক এই সময় নক হলো দরজায়।

এলোমেলো বসন ঠিকঠাক করে বসার ঘরে চলে এল ওরা। দরজার কবাট খুলল ঋণী।

দোরগোড়ায় যেন সাক্ষাৎ দেবদূত দাঁড়িয়ে আছে। ঋণীর শরীর কি এক আবেশে অবশ হয়ে এল। হাঁ করে প্রায় নির্লজ্জের মত তাকিয়ে থাকল সে, আগন্তুক তাকে যেন সম্মোহিত করে ফেলেছে। মন থেকে কে যেন সকৌতুকে বলল, 'দেখ লো, দেখ! প্রাণ ভরে দেখ!'

'এখানে কি ড. মুহিত হায়দারের মেয়ে ঋণী হায়দার থাকেন?' মার্জিত কণ্ঠে জানতে চাইল আগন্তুক।

'জ্বী, আমিই,' দ্রুত নিজেকে সামলে নিল ঋণী। 'আপনি?'

'আমি ব্রিটিশ আর্কিওলজিকাল সোসাইটির একজন সদস্য,' বলল আগন্তুক। 'আপনার সঙ্গে ড. হায়দার সম্পর্কে একটু আলাপ করতে চাই।'

পথ দেখিয়ে ভেতরে এনে তাকে বসাল ঋণী। নাসরিনকে দেখিয়ে বলল, 'আমার ফুপি। তো কি আলাপ করতে চান বলুন।'

'বিশেষ একটা কাজে আমাকে মায়ানমার যেতে হবে,' বলল আগন্তুক। 'তাই ভাবছি সময় ও সুযোগ পেলে ড. হায়দারের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখব। আপনার কাছে এসেছি যদি কোন তথ্য বা সূত্র পাই…'

'তদন্ত করে দেখবেন…আপনি কি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে আসছেন, নাকি ইন্টারপোল থেকে?' ঋণী নয়, প্রশ্ন করল নাসরিন।

'দুঃখিত, প্রথমেই নিজের পরিচয় দেয়া উচিত ছিল আমার। আমি মাসুদ রানা। রানা এজেন্সি নামে আমার একটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন ফার্ম আছে। সাধারণত ক্লায়েন্টরাই কেস নিয়ে আমাদের কাছে যায়, তবে আপনার ভাই ড. হায়দারের বেলায় উল্টোটা ঘটছে। ওনার কেসটা ইন্টারেস্টিং মনে হওয়ায় আমিই চলে এলাম...'

'আমার বাবা চোর কিনা এটা জানাই আপনার উদ্দেশ্য, তাই না?' হঠাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইল ঋণী। 'দেখতে এসেছেন আর্টিফ্যাক্ট বেচা টাকায় কেমন বিলাসবহুল জীবন যাপন করছি আমরা?'

প্রশ্নটা শুনে বিব্রত বোধ করল রানা। ঋণী যে অভিযোগ করছে তা আংশিক হলেও সত্যি। এরই নাম অকুপেশনাল হ্যাযার্ড। জীবিত হোক বা মৃত, কোন মানুষের উপকার করতে হলে প্রথমেই জানতে হবে তার সম্পর্কে উচ্চারিত অভিযোগের পিছনে আসলে কোনও ভিত্তি আছে কিনা। ব্যাপারটা অবশ্য এরইমধ্যে রানার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। যে এলাকায় এই ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাটের যে সাদামাঠা আসবাব, এ-সব দেখে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই এই পরিবারের প্রধান দশ বছর আগে দুই বিলিয়ন ডলার হাতে পেয়েছিলেন।

'আমাকে ভুল বুঝবেন না, প্লীজ,' বলল ও। 'কেসটা আমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে এত বছর পর অদ্ভুত সব ডেভেলপমেন্ট ঘটতে দেখে। তাছাড়া, ড. হায়দার আমারই মত একজন বাঙালী।'

'দেখুন, মি. রানা,' বলল ঋণী, 'আমরা শুধু একটা ব্যাপারে আগ্রহী। আমরা চাই বাবার নামে যে মিথ্যে অপবাদ রটানো হয়েছে তার অবসান হোক। কিন্তু কাজটা আমরা...আমি নিজেই করতে চাই। তাছাড়া, প্রাইভেট একটা ডিটেকটিভ ফার্মকে ভাড়া করব, সে সামর্থ্যও আমাদের নেই।'

'নিজে করতে চান মানে? আপনি কি মায়ানমারে যাবার কথা ভাবছেন?'

'ভাবব না? মায়ানমারে গিয়ে তদন্ত করব বলেই তো আর্কিওলজি নিয়ে মাস্টার্স পাস করলাম।'

'আপনার স্পিরিট দেখে সত্যি ভাল লাগছে,' প্রশংসার সুরে বলল রানা। 'কিন্তু সৎ পরামর্শ চাইলে বলব, বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন মেয়ের জন্যে মায়ানমার স্রেফ একটা নরক। প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পারেন, ওখানে গেলে প্রাণ নিয়ে আপনি ফিরে আসতে পারবেন না।'

নাসরিন বলল, 'ওখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আসলে আমাদের কোন ধারণা ছিল না। আপনার কথা শুনে বুঝতে পারছি ঋণীকে ওখানে পাঠানো উচিত হবে না।'

'তার তো কোন প্রয়োজনও নেই,' বলল রানা। 'ঋণী, আপনি যা চান, আমিও তাই চাই–ড. হায়দারের নিখোঁজ রহস্য তদন্ত করে দেখা। রানা এজেন্সি নিজের গরজেই করবে কাজটা, কাজেই আপনাদেরকে কোন ফী দিতে হবে না।'

'গরজটা কিসের বলুন তো?'

রানা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'এ প্রশ্নের জবাব কি আপনাকে পেতেই হবে?'

'হবে না? অচেনা এক ভদ্রলোক যেচে পড়ে এসে বলছেন তিনি আমার বাবার নিখোঁজ রহস্য তদন্ত করার জন্যে মায়ানমারের মত নরকে যেতে চান। আমি জানতে চাইব না, কি তাঁর স্বার্থ?'

'এই টেলিগ্রামটা পড়ে দেখুন, তাহলেই গরজটা আঁচ করতে পারবেন,' বলে পকেট থেকে বহু বছরের পুরানো একটা টেলিগ্রাম শীট বের করে ঋণীর দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা।

দশ বছরের পুরানো টেলিগ্রাম, অনুবাদ করলে অর্থ দাঁড়ায়–

"প্রাচীন মং ও বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কারের এই অভিযান গুরুতর হুমকির সম্মুখীন। ফালাম থেকে একদিকে বিপুল আর্টিফ্যাক্ট উদ্ধারের সম্ভাবনা যেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, যার আনুমানিক মূল্য দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কম হবে না বলে ধারণা করছি; অন্যদিকে স্থানীয় সরকারী প্রশাসনের কর্মকর্তারা পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস আইএসআই-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সব মেরে দেয়ার জন্যে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। শুনতে পাচ্ছি, ওরা নাকি ফালাম বাঁধটাও উড়িয়ে দেবে। আশংকা করছি তৃতীয় একটা পক্ষ ওদের সঙ্গে হাত মেলাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিস্তারিত জানাব। এই একই টেলিগ্রাম আমি বাংলাদেশ সরকার, ইন্টারপোল ও ব্রিটিশ আর্কি সোসাইটির ঠিকানায় পাঠালাম। ড. মুহিত হায়দার।"

'ফুপি, বাবার পাঠানো টেলিগ্রাম!' ঝট করে রানার দিকে ফিরল ঋণী। 'এ আপনি কোত্থেকে পেলেন? কেউ তো আমাদেরকে বলেনি যে বাবা নিখোঁজ হবার আগে তিন জায়গায় এরকম টেলিগ্রাম করেছিলেন!'

'বাংলাদেশ সরকার ও ইন্টারপোল এই টেলিগ্রাম পায়নি,' বলল রানা। 'ধারণা করছি টেলিগ্রাম দুটো বিলি করার আগেই আইএসআই-এর এজেন্টরা পোস্ট অফিস থেকে সরিয়ে ফেলে।'

'কিন্তু এটা?'

'এটা যেভাবেই হোক ব্রিটিশ আর্কিওলজিকাল সোসাইটির ঠিকানায় ঠিকমতই পৌঁছেছিল,' বলল রানা। 'কিন্তু যে এটা রিসিভ করে সে সম্ভবত গাফিলতি করে কর্মকর্তাদের হাতে দেয়নি, কিংবা কর্মকর্তারা ড. হায়দারের বক্তব্য গুরুত্বের সঙ্গে নেননি। তা না নেয়ার পিছনে একটা সম্ভাব্য যুক্তিও আছে–বার্মার ওই আকিয়াব অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, সোসাইটির অভিজ্ঞ কর্মকর্তারা তা বিশ্বাস করতেন না। তবে ভাগ্য ভাল যে টেলিগ্রামটা ফেলে দেয়া হয়নি। আর্কাইভে খোঁজ করতে গিয়ে ড. হায়দারের পুরানো ফাইলটা আমি পেয়ে যাই, তাতেই ছিল এটা।'

'কিন্তু বাবার এই টেলিগ্রাম খুঁজে পাওয়ার সঙ্গে আপনার গরজের সম্পর্কটা কিন্তু পরিষ্কার হলো না।'

'ড. হায়দারের টেলিগ্রামের অংশবিশেষ স্মরণ করুন,' বলল রানা। 'বাংলাদেশ সরকার ও তৃতীয় পক্ষ।'

টেলিগ্রামটা আরেকবার চোখের সামনে তুলল ঋণী।

'তৃতীয় পক্ষ···বাংলাদেশ সরকার। তো?'

'মূল্যবান আর্টিফ্যাক্ট নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও পাকিস্তানী এজেন্টরা ষড়যন্ত্র করছিল, তাদের সঙ্গে তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ বাংলাদেশের কিছু কর্মকর্তাও হাত মেলায়,' বলল রানা, তবে এ-সব ওর নিজের কথা নয়; ঢাকায় ওকে ব্রিফ করার সময় বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান যা বলেছেন, শুধু সেই কথাগুলোই পুনরাবৃত্তি করছে ও। 'মায়ানমারে বাংলাদেশের কর্মকর্তা বলতে নিশ্চয়ই দূতাবাসের অফিসারদের বোঝানো হয়েছে। সবাই জানে, দূতাবাসের নিজস্ব ইন্টেলিজেন্স অফিসার থাকে, সাধারণত তাদেরকে লিগাল অ্যাডভাইজার বলা হয়। লুট করা আর্টিফ্যাক্টের ভাগ দেয়ার বিনিময়ে আইএসআই যদি বাংলাদেশ দূতাবাসে নিজেদের চর ঢুকিয়ে থাকে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

'না হয় আশ্চর্য হলাম না,' বলল ঋণী। 'কিন্তু এটা তো বাংলাদেশ সরকারের মাথাব্যথা, সেজন্যে আপনাকে কেন ঝুঁকি নিয়ে মায়ানমারে যেতে হবে?'

'আপনি দেখছি পুলিসেরও বাড়া!' হেসে ফেলল রানা। 'চেষ্টা করলে আপনি দক্ষ ইন্টারোগেটর হতে পারবেন। শুনুন, আপনি এমন একটা প্রশ্ন করেছেন, অন্য কেউ হলে উত্তর দিতাম না। আশা করি কথাটা এই ঘরের বাইরে যাবে না। ঠিক আছে?'

'যাবে না,' ঋণী ও নাসরিন একযোগে কথা দিল।

'আমার অনেক পরিচয়, তার মধ্যে একটা–আমি বাংলাদেশ সরকারের একজন ক্লিনার। কোথাও দূষিত পদার্থ বা আবর্জনা জমলে আমাকে তা পরিষ্কার করতে হয়।'

'তাই বলুন!' ঋণীর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'এতক্ষণে বুঝলাম!' কি বুঝল তা অবশ্য ঋণীই জানে, রানা আর এ-প্রসঙ্গে কথা বাড়াতে চাইছে না। 'তবে আপনার কাজটা অত্যন্ত জটিল। দশ বছর আগে ঠিক কি ঘটেছিল আজ কি আর তা জানা যাবে! আমাদের ধারণা, বাবা হয়তো আজও বেঁচে আছেন...'

রানা জানে, সে সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবু ঋণীর মনটা ভেঙে দিতে ইচ্ছে করল না। 'থাকতেও পারেন। যদি বেঁচে থাকেন, আমি নিজে তাঁকে ফিরিয়ে আনব।'

'মি. রানা...দূর ছাই! মাসুদ ভাই, আপনি আমাকেও কি মায়ানমারে নিয়ে যেতে পারেন না?'

'সম্ভব হলে নিয়ে যেতাম,' বলল রানা। 'কিন্তু নিজেরই যেখানে প্রাণ নিয়ে ফেরার সম্ভাবনা কম, সেখানে আপনাকে কিভাবে নিয়ে যাই বলুন।'

'আপনার জন্যে আমরা দোয়া করব,' বলল ঋণী।

চা খাবার জন্যে আরও আধঘণ্টা ওখানে থাকতে হলো রানাকে। গল্প করার এক ফাঁকে ড. মুহিত হায়দারের একটা ছবি দেখতে চাইল ও।

বিদায় নিয়ে ফিরে আসছে, কানে বাজতে থাকল শ্রদ্ধা, আস্থা ও আবদার মেশানো ঋণীর মিষ্টি কণ্ঠস্বর, 'আপনার অপেক্ষায় আমরা দিন গুনব, ভাইয়া।'

একহপ্তা পর মায়ানমার এয়ার লাইন্সের একটা জেট থেকে ইয়ানগন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামল রানা।

ক্ষমতায় যে সামরিক সরকার, টার্মিনাল বিল্ডিঙে পা দিতেই টের পাওয়া গেল। লাঠিসর্বস্ব পুলিসের পাশাপাশি ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র সৈনিকরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। কাঁধে বা কোমরে নয়, প্রত্যেকে তার মেশিন-পিস্তল হাতে রেখেছে।

কাস্টমস লাইনটা ধীরগতিতে এগোচ্ছে। রানার সামনে, তিনজনের পর, খাটো কিন্তু সুন্দরী এক মেয়ে দরদর করে ঘামছে। তার পরনের বহুরঙা লুঙ্গি ও ব্লাউজ। দামী সিল্ক। সম্ভবত এই প্রথমবার চোরাচালানে নেমেছে তরুণী, নার্ভাস বোধ করার সেটাই কারণ। তার সঙ্গে কি আছে কে জানে। সোনা হবারই বেশি সম্ভাবনা। কিংবা ডলার। ড্রাগ্স্ মায়ানমার থেকে বেরোয় শুধু, ঢোকে না।

কাস্টমস অফিসার দু'জন সৈনিককে ইঙ্গিত করল। লাইন থেকে বের করে পিছনের একটা কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো তরুণীকে। ওখানে মহিলা মিলিটারি-পুলিস কাপড় খুলে সার্চ করবে তাকে।

লাইনে দাঁড়ানো লোকজন ফিসফাস করছে।

এক সময় রানার পালা এল। হাতে পাসপোর্ট নিয়ে ওর চেহারা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল অফিসার। পাসপোর্টটা ইস্যু করা হয়েছে ভারতীয় নাগরিক সুব্রত বড়ুয়ার নামে। অফিসার প্রশ্ন করল, 'মায়ানমারে কেন এসেছেন, মি. বড়ুয়া?'

'ব্যবসার কাজে।'

'কতদিন থাকবেন?'

'দুই কি তিন হপ্তা।'

'অলিখিত তিনটি নিয়ম যদি মেনে চলেন,' বলল অফিসার, 'তাহলে মারাত্মক কোন বিপদে আপনাকে পড়তে হবে না। এক, পুলিস সহ সরকারী কোন কর্মচারীকে ঘুষ দেবেন না। ধরা পড়লে আপনার জেল হয়ে যাবে। দুই, স্থানীয় বা বিদেশী, কারও সঙ্গেই সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে কোন আলোচনা করবেন না। এর শাস্তি ভয়াবহ, এমনকি ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনেও দাঁড় করানো হতে পারে। তিন, আন্ডারগ্রাউন্ডের কারও সঙ্গে লাগতে যাবেন না।'

'ধন্যবাদ।' রানা জানে, বার্মার আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে প্রতি মাসে মোটা টাকা ভেট পায় জেনারেলরা, ফলে তাদের সাত খুন মাফ।

ওভারনাইট ব্যাগ আর সুটকেস নিয়ে একটা টেলিফোন বুদে ঢুকল রানা। রোলেক্সে দুপুর একটা। অ্যান্টিক শপের নম্বরটা মুখস্থ করা, তিনবার রিঙ হতে রিসিভার তুলল কেউ একজন। 'অ্যান্টিক শপ ঐতিহ্য।'

বার্মিজ ভাষায় দ্রুত কথা বলল রানা। 'আমি সুকমল, আমেরিকা থেকে আসছি। আপনাদের কালেকশন দেখার জন্যে আজ বিকেল চারটের দিকে একবার আসতে চাই।'

'এক মিনিট, প্লীজ। কি যেন নাম বললেন?'

'সুকমল।'

'মি. সুকমল, স্যার?' এবার লাইনে একটা মেয়ে। 'স্যার, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, চারটের সময় আপনাকে আমরা অভ্যর্থনা জানাতে পারব না। আপনি এক ঘণ্টা পর পাঁচটায় আসতে পারেন না, প্লীজ?'

'নো প্রবলেম,' বলল রানা। 'পাঁচটাতেই তাহলে আসছি।'

'ভেরি গুড, স্যার। আপনার সঙ্গে ব্যবসা করার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকলাম আমরা।'

এরপর রিজার্ভেশন সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে হোটেল ইন্টারকনে ফোন করল রানা। শহরে আসার দীর্ঘ পথে এত বেশি স্পীড তুলল ট্যাক্সি; সীটের কিনারায় বসে থাকতে বাধ্য হলো ও। হাইওয়ের ড্রাইভাররা যেন আত্মহত্যা করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

শপিং ডিস্ট্রিক্ট জেনারেল সান হুয়া-য় ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে কেনাকাটা শুরু করল রানা। বিভিন্ন দোকান থেকে উইগ, নিজের মাপের চেয়ে কয়েক সাইজ বড় স্পোর্টস জ্যাকেট, ঢোলা ট্রাউজার আর একজোড়া দামী লোফার্স পছন্দ করল।

হোটেল ইন্টারকন উ থান্ট স্কয়ারের কাছাকাছি। বিল্ডিঙের পিছনদিকে তিনতলায় রানার স্যুইট। দরজা বন্ধ করে আন্ডারওয়্যার ছাড়া খুলে ফেলল সব, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে পরল উইগটা। কাঁচি দিয়ে খানিকটা কাটছাঁট করার পর মানিয়ে গেল মাথা ও চেহারার সঙ্গে। এরপর চশমা। লেন্সে পাওয়ার নেই, রিম বানানো হয়েছে তার দিয়ে। সুকমলকে বুড়োটে ও ক্লান্ত দেখালে ভাল হয়, রাস্তায় বেরিয়ে কি ভঙ্গি নেবে আয়নার সামনে তারও রিহার্সেল হয়ে গেল। সামনের দিকে ঝুঁকে থাকলে কয়েক ইঞ্চি খাটো দেখায়। চেহারায় খানিকটা নিস্তেজ ও অন্যমনস্ক ভাব ব্যক্তির গুরুত্ব কমিয়ে ফেলে। কসমেটিক্স নয়, নিখুঁত ছদ্মবেশের রহস্য হলো মুখের অভিব্যক্তি।

অস্ত্র ছাড়া নিজেকে অর্ধনগ্ন লাগছে। অভাবটা পূরণ করার জন্যে রওনা হলো রানা।

বেশ কয়েক বছর পর ইয়ানগনে এসেছে, বাইরে বেরিয়ে খেয়াল করল অনেক রাস্তারই আগের নাম বদলে নতুন নাম রাখা হয়েছে। নতুনগুলো প্রায় সবই জেনারেলদের নামে নামকরণ করেছে সামরিক সরকার। রানার মনে পড়ল, গত বছর অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তাদের বার্ষিক রিপোর্টে অভিযোগ করেছিল, যার নামে রাস্তার বা এলাকার নামকরণ করা হয়েছে সে বা তার পরিবার ওই রাস্তা বা এলাকার সমস্ত বৈধ-অবৈধ ব্যবসা থেকে চাঁদা পায়।

জেনারেল খই খই কুয়া অভিজাত এলাকা, বড়বড় হোটেল-রেস্তোরাঁ আর শপিং মল-এর ছড়াছড়ি। একটা হ্যান্ডিক্রাফট্স্-এর দোকানকে পাশ কাটিয়ে এল রানা, সবুজ, নীল ও সাদা হরফে সাইনবোর্ড লেখা হয়েছে: 'ঐতিহ্য—অ্যান্টিক্স অ্যান্ড হ্যান্ডিক্রাফট্স্ ফ্রম বাংলাদেশ।'

রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিক থেকে দোকানটার চারপাশে তাকাল রানা। ঐতিহ্যের ওপর কেউ নজর রাখছে বলে মনে হলো না। তবে তার মানে এই নয় যে সত্যি কেউ নজর রাখছে না। ভারতীয়, নেপালি আর ভুটানি দোকানগুলোর সামনে লোকজনের বেশ ভিড় দেখা যাচ্ছে।

চারটের সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। সাড়ে তিনটে বাজে। ওকে পাঁচটায় যেতে বলাটা আসলে একটা সঙ্কেত।

ঐতিহ্য রানা এজেন্সির ইয়ানগন শাখা। সামরিক সরকার কাজ করার লাইসেন্স না দেয়ায় কৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

একটা রেস্তোরাঁয় বসে চা আর চুরুট খেয়ে সময়টা কাটাল রানা। সবাই যেখানে চুরুট খাচ্ছে, একজন না খেলে দৃষ্টি কাড়া হয়। ঠিক চারটের সময় পৌঁছাল ঐতিহ্যের দরজায়।

কাঁচের ভেতর দিয়ে বার্মীজ লুঙ্গি পরা খাটো এক তরুণ ওর দিকে তাকাল। কথা হলো ইন্টারকমে। 'বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি।'

'আমি সুকমল। পাঁচটায় আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

'কিন্তু এখন তো মাত্র চারটে বাজে।'

'ঘড়ি সব সময় ঠিক কথা বলে না।'

দরজার তালা খুলে গেল। 'প্লীজ, মি. সুকমল, ভেতরে আসুন।'

'ধন্যবাদ।'

দোকানটা সরু ও লম্বা। ছোট বড় বিভিন্ন আকারের কাঁচ মোড়া শোকেসে উপমহাদেশের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা আর্টিফ্যাক্ট সাজিয়ে রাখা হয়েছে। একদিকের দেয়াল জুড়ে শেলফ, তাতে হিন্দু দেবদেবিদের মূর্তি, বুদ্ধমূর্তি, দুর্লভ পেইন্টিং, ভাস্কর্য, ইত্যাদি রাখা হয়েছে। আরেকদিকে বাংলাদেশী হস্তশিল্প, জামদানি ও মসলিন থেকে শুরু করে বরের টোপর পর্যন্ত অনেককিছুই আছে।

'স্যার, আমি মনির হাসান,' তরুণ বলল। 'আসুন, আপনার জন্যে ম্যাডাম বৃষ্টি অপেক্ষা করছেন।'

তার পিছু নিয়ে পিছনদিকে, ডিসপ্লে এরিয়ায় চলে এল রানা। এখানে প্রকাণ্ড একটা অ্যান্টিক ডেস্কের পিছনে সুট পরা এক লোক বসে আছে, বয়স হবে ছাব্বিশ কি সাতাশ। তরুণ বলল, 'মি. সুকমল, ইনি আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার শহীদুল হক।'

তাড়াহুড়ো করে চেয়ার ছাড়ল শহীদ, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মুখ, ডেস্ক ঘুরে রানার দিকে প্রায় ছুটে এল, ডান হাতটা সামনে বাড়ানো। 'রাখো তোমার হাবিজাবি ট্রেডক্রাফট!' তরুণকে তিরস্কার করল সে। 'ওহ্, মাসুদ ভাই! আপনার সঙ্গে কতদিন পর দেখা! কল্পনাও করিনি ইয়ানগনে আপনাকে দেখতে পাব...'

হাতটা রানা মেলাল ঠিকই, তবে ঠাণ্ডা ও নির্লিপ্ত স্বরে বলল, 'আপনি আমাকে অন্য কেউ বলে ভুল করছেন। আমি সুকমল বড়ুয়া।'

'হে-হে, এখানে সবাই আমরা আপনার শিষ্য, মাসুদ ভাই! একান্তেও যদি অভিনয় করতে হয় তাহলে শ্রদ্ধা জানাব...'

'আমার শিষ্যরা সবাই জানে কোন অবস্থাতেই কাভার ভাঙা চলবে না,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'বুঝেছি, আপনি ঠাট্টা করছেন!' শহীদ এখনও হাসছে। 'নাকি ভাবছেন দোকানে মাইক্রোফোন লুকানো আছে? রোজ একবার করে সার্চ করি আমরা,

মাসুদ ভাই–নেই।'

'একজন লিপরিডার বিনকিউলার নিয়ে এদিকে তাকিয়ে থাকলে তুমি এইমাত্র আমার কাভার ফাঁস করে দিয়েছ।' রানা রাস্তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে।

শহীদের মুখের হাসি ধীরে ধীরে ম্লান হলো। তবে বোকার মত আরেকটা মন্তব্য করে বসল, 'আমি কিন্তু মাসুদ ভাই বাংলায় কথা বলছিলাম।'

'তারমানে তুমি ধরে নিচ্ছ বাংলা জানে এমন প্রতিপক্ষ আমাদের নেই?'

'মি. সুকমল, স্যার,' মনে করিয়ে দেয়ার সুরে, সবিনয়ে বলল মনির হাসান, 'ম্যাডাম বৃষ্টি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

শহীদ কি বলে শোনার জন্যে অপেক্ষা না করে হাসানের পিছু নিয়ে ডেস্কটাকে পাশ কাটাল রানা। বোতামে চাপ দিল হাসান, ডেস্কের পিছনের দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে আরেকটা দরজা। সেদিকে পা বাড়াতে সেটাও খুলে গেল। চৌকো, জানালাবিহীন একটা কামরায় ঢুকল রানা। চারদিকে ফাইলিং কেবিনেট, কমবিনেশন লক, সফিসটিকেটেড ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট দেখা যাচ্ছে।

ফারহানা আহমেদ বৃষ্টি রানা এজেন্সির ইয়ানগন শাখার প্রধান। মিষ্টি চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, একহারা গড়ন। জুডো-কারাতে জানে, পিস্তলে দক্ষ, বেশ কয়েকটি ভাষায় ভাল দখল আছে। বিভিন্ন দেশে চাকরি করার অভিজ্ঞতা আছে, যে-কোন পরিবেশে সহজেই মানিয়ে নিতে পারে নিজেকে। আজ তার পোশাক বার্মীজ লুঙ্গি ও আঁটসাঁট ব্লাউজ।

রানাকে দেখে বৃষ্টি ব্যস্ত হলো না, শুধু হ্যান্ডশেক করার জন্যে একবার দাঁড়াল, রানা একটা চেয়ার টেনে বসার পর বলল, 'ছদ্মবেশটা মন্দ হয়নি, তবে জ্যাকেটটা বড় বেশি ঢোলা।'

মনে মনে খুশি হলো রানা। বৃষ্টি সরাসরি কাজের কথা পেড়েছে। 'অস্ত্র রাখার জন্যে একটু বেশি জায়গা দরকার আমার।'

ডেস্কের দেরাজ খুলে ভেতর থেকে একটা ডিপ্লোম্যাটিক পাউচ বের করল বৃষ্টি। 'আপনার আগেই পৌঁছেছে এটা।'

'দূতাবাসের লোকেরা বিরক্ত হয়নি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এ-ধরনের কাজ করতে ওরা সাধারণত রাজি হয় না।'

'রাষ্ট্রদূত মোস্তফা সাহেব টের পেলে খেপে যেতেন,' বলল বৃষ্টি। 'কাজটা তাঁকে গোপন করে করতে হয়েছে। আপনি তো জানেন, অবৈধ কোন কাজ তিনি একদমই সমর্থন করেন না।'

'হ্যাঁ, শুনেছি। খেয়াল রেখো তিনি যেন জানতে না পারেন এখানে আমি কিজন্যে এসেছি।' রানা হাসছে। পাউচ থেকে বের করে বৃষ্টির ডেস্কে শোল্ডার হোলস্টার সহ একটা নাইনএমএম ল্যুগার রাখল, পাশে রাখল স্ট্র্যাপসহ একটা ছুরি আর বাদাম আকৃতির খুদে কয়েকটা বোমা। জ্যাকেট খুলে শার্টের আস্তিন গুটাল, বগলের তলায় স্ট্র্যাপ আটকে খাপসহ ছুরিটা লুকিয়ে রাখল সেখানে। জ্যাকেট পরার পর ল্যুগারটা চেক করল।

'ল্যুগারটা পেয়ে আপনার চেহারাই বদলে গেল, মাসুদ ভাই!' বৃষ্টি হাসছে।

'এটাকে আমার অর্ধাঙ্গিনী বললেও কম বলা হয়।' শোল্ডার হোলস্টারটা পরল রানা। লোডেড একটা ক্লিপ ঢোকাল ল্যুগারে। 'এখন আমি কাজে হাত দেয়ার জন্যে তৈরি।'

'এই দু'জনকে ফেলতে হবে আপনার।' ডেস্কে একজোড়া ফটোগ্রাফ রাখল বৃষ্টি। 'তা না হলে এরাই আপনাকে ফেলে দেবে।'

একটা ফটো তুলে খুঁটিয়ে দেখল রানা। 'চেহারাটা যেন কমিক বুকের কোন চরিত্র। ফ্যানাটিক নাকি?'

'বলুন ম্যানিয়াক। ওর নাম হিনান ফো।'

'এই লোকটাই আগুন নিয়ে খেলে?'

'হ্যাঁ। প্যাথলজিকাল স্যাডিস্ট, মাসুদ ভাই। আগুন তার নেশা। তবে পিস্তলেও ভয়ানক।'

'আর এই জায়ান্টটা?'

'চো মাউং। মানসিক প্রতিবন্ধী। ধর্ষণ করে মেরে ফেলে। ভায়োলেন্সই পেশা। অস্ত্র বলতে খালি হাত। ফো তার একমাত্র গুরু। জেলখানায় দেখা। রোহিঙ্গা গেরিলাদের সঙ্গে তখনই ওদের যোগাযোগ হয়।'

'এরা রাজনীতি করে বলে বিশ্বাস হয় না।'

'শুধু টাকা আর পরস্পরের প্রতি দুর্বল ওরা,' বলল বৃষ্টি। 'কিছু অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল আন্ডারগ্রাউন্ডে দাপট দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, ফো আর মাউং তাদের হয়ে কিছু কিছু কাজ করে বলে শোনা যায়। তবে টাকা দিলে সবার কাজই করবে ওরা।'

'এখানেই সুব্রত বড়ুয়া প্রসঙ্গ এসে পড়ে,' বলল রানা।

'ঠিক। সম্পত্তির মালিক হতে কেমন লাগে আপনার?'

'সম্পত্তিটা আগে দেখতে হবে।'

'ভাঙাচোরা, পরিত্যক্ত একটা ওয়্যারহাউস। পাইয়োপন এলাকায়।'

'ভাল। পুড়ে ছাই হয়ে গেলে কারও কোন ক্ষতি নেই। ওটা আজই আমি দেখতে চাই, বৃষ্টি।'

'কিভাবে ওখানে যেতে হবে মনির জানে। সুব্রতর নামে সে-ই ওটা কিনেছে।'

'গুড। মনির নিয়ম মেনে কাজ করে। আমার যদি কখনও ব্যাকআপ দরকার হয়, শহীদকে পাঠিয়ো না।'

'কোন কারণ আছে, মাসুদ ভাই?' গলার স্বরই বলে দিল কারণটা বৃষ্টি জানে।

'ওর অ্যাটিচ্যুড আমার পছন্দ নয়।'

'হিসাব আর অঙ্কে শহীদ রীতিমত একটা প্রতিভা,' বলল বৃষ্টি। 'কিন্তু সিক্রেট অপারেশনে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না।'

'তুমি যদি সুপারিশ করো, ওকে আমি ঢাকায় পাঠিয়ে ডেস্কে বসিয়ে দিতে পারি।'

'লোকবলের এই অভাবের সময়? পরে, মাসুদ ভাই।'

'ওকে নিয়ে তুমি কাজ করবে, তুমি যা চাও তাই হবে।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল। 'এবার তোমার খবর বলো।'

হেসে উঠল বৃষ্টি। 'পরিণত, বয়সেও মেলে, এমন বাঙালী ছেলে মায়ানমারে আমি কোথায় পাব? কাজেই আপনি দেশে ফেরত না পাঠানো পর্যন্ত প্রেম বা বিয়ে কিছুই আমার কপালে নেই।'

'মন খারাপ কোরো না। আজ তুমি আমাকে ডিনারের প্রস্তাব দিলে আমি হ্যাঁ বলব।'

'আপনার সঙ্গে বেরুতে পারা তো ভাগ্যের ব্যাপার,' বলল বৃষ্টি। 'কিন্তু পায়ে কুড়ুলটা আমি নিজেই মেরেছি। আজ সন্ধ্যায় আপনি বুকড্।'

'ভাগ্যবতী ভদ্রমহিলাটি কে?'

'মিনা রুজ। মহিলা, তবে সে ভদ্র নয়। রুজ হলো আপনার আর হিনান ফোর মাঝখানে পাইপলাইন। ওই লাইন সম্ভবত আরও দূরে, রহস্যমানব পর্যন্ত পৌঁছেছে।'

'রহস্যমানব?'

'লোকটা মায়ানমারে মার্ক্সিস্ট মার্ডার নেটওঅর্ক চালায়। আজ পর্যন্ত কেউ তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেনি।'

'রাতটা মনে হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং হবে,' মন্তব্য করল রানা।

পাঁচ

পাইয়োপন প্রাচীন বন্দরনগরী। শুধু ওয়্যারহাউসটা নয়, পলি জমে নাব্যতা হারানোর ফলে গোটা বন্দরটাই পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়েছে, বিশ মাইল দূরে নতুন আরেকটা বন্দর গড়ে ওঠার পর। দীর্ঘ যাত্রা, প্রচলিত দরের চেয়ে তিনগুণ বেশি পয়সা দিয়ে ক্যাব ড্রাইভারকে যেতে রাজি করল রানা।

সূর্য ডুবতে কয়েক ঘণ্টা বাকি থাকতেই বিল্ডিংটার সামনে থামল ক্যাব। অতিরিক্ত আরও কিছু বকশিশ দিয়ে ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলল রানা।

'তবে বেশি দেরি করবেন না, স্যার,' বলল ড্রাইভার। 'এদিকে দিনের বেলাই ছিনতাই হয়, রাতে স্রেফ খুন হয়ে যাব।'

লম্বা ও হ্যাঙ্গারসদৃশ ওয়্যারহাউস জেটির মুখে পড়ে আছে, সরু পাশটা রাস্তার দিকে। চেইন লিঙ্ক দিয়ে তৈরি করা বেড়া, মাথার দিকটায় কাঁটাতার। বাঁ দিকে ওটার প্রতিবেশী বিধ্বস্ত একটা ডক, ডান দিকে পনেরো বছর আগে লালবাতি জ্বালা একটা ক্যানারি।

মেইন গেটে চেইনের সঙ্গে তালা ঝুলছে। বৃষ্টির দেয়া চাবি বের করে খুলল রানা। টকটকে লাল চোখ, গায়ে-গতরে পালোয়ান, গার্ডরুম থেকে থপ-থপ

পায়ের আওয়াজ তুলে ছুটে এল একজন। 'করেন কি! কে আপনি?'

'মালিক। সম্পত্তি দেখতে এসেছি। কেন, সুব্রত বড়ুয়া সম্পর্কে তোমাকে জানানো হয়নি?'

'ও, আচ্ছা, আপনিই তাহলে! ক্ষমা চাই, মহাশয়, হাজার বার ক্ষমা চাই। তবে পরিচয়-পত্রটা একবার দেখতে হবে আমাকে।'

লোকটার নাম কাইয়ু, একটা সিকিউরিটি ফার্মে চাকরি করে। একদল লইয়ার সম্পত্তিটা ক্রয় ও হস্তান্তরের দায়িত্ব নেয়, তারাই সিকিউরিটি ফার্মের সার্ভিস ভাড়া করেছে।

একবার চোখ বুলিয়েই পাসপোর্টটা ফিরিয়ে দিল কাইয়ু। 'আপনি ঘুরেফিরে দেখুন, আমি গেটে তালা দিয়ে আসি,' বলল সে।

'তার আগে ড্রাইভারকে ভেতরে আসতে বলো।' রানা ভয় পাচ্ছে ওকে রেখেই না পালিয়ে যায় লোকটা। 'ক্যাবটা তোমার গাড়ির পাশে এনে রাখুক।'

ক্যাব ভেতরে ঢোকার পর গেট বন্ধ করল কাইয়ু, হাতে কী রিড নিয়ে চারদিকটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে রানাকে। কোন কোম্পানির নাম বা লোগো, কিছুই চোখে পড়ল না। গেটের পাশে ছোট্ট টিনের পাতে শুধু রাস্তার নাম আর হোল্ডিং নম্বর ৫০৩ লেখা আছে। ভাঙাচোরা ও পরিত্যক্ত বললে কিছুই বলা হয় না, ওয়্যারহাউস থেকে রীতিমত দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। বিশাল উঠান আর জেটির বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে পঞ্চাশ গ্যালন ড্রামে, ভেতরে শিল্পবর্জ্য। ঝাঁঝাল রাসায়নিক দুর্গন্ধের উৎস ওই ড্রামগুলোই। দু'পেয়ে প্রাণী দেখে কিচ্-কিচ্ শুরু করল কয়েকশো ইঁদুর, ড্রামগুলোর ফাঁকে গর্ত খুঁড়ে আস্তানা গেড়েছে।

মেইন বিল্ডিঙের তালা খুলল কাইয়ু। ইলেকট্রিক লাইন অনেক আগেই বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, মাকড়সার জাল ভেদ করে নোংরা স্কাইলাইট থেকে নেমে আসা দিনের আলোয় উজ্জ্বলতা নেই, ফাঁকা জায়গার শুধু মাঝখানটা আলোকিত। বাকিটা চোখে তুলে ধরল কাইয়ুর টর্চ।

ওয়্যারহাউসের ভেতরেও প্রচুর টক্সিক ওয়েস্ট ক্যানিস্টার স্তূপ হয়ে আছে। গন্ধটা তীব্র ও অস্বাস্থ্যকর। নাকে রুমাল চেপেও তেমন লাভ হচ্ছে না।

পরবর্তী আধঘণ্টা ঘুরেফিরে দেখল রানা, পুরো লেআউট গেঁথে নিল স্মৃতিতে–বেরুবার ক'টা পথ, লুকানোর জায়গা, পালাবার রাস্তা। সবশেষে কাইয়ুকে বলল, 'এখন এখানে এমন কিছু নেই যে তোমাকে পাহারা দিতে হবে। তোমার ফার্মকে জানিয়ে দিয়ো আমার কোন গার্ড দরকার নেই আর।'

ম্লান মুখে কাইয়ু বলল, 'জ্বী।' চাবিটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে। 'আমি তাহলে এখনই ফিরে যেতে চাই।'

ইয়ানগনে ফিরে আসতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল।

ইরাবতী নদী আর আন্দামান সাগরের মোহনার খুব কাছেই ঝিক আং ঝিক নাইটক্লাবটা। রাজধানী থেকে বেশ দূরে, এলাকার নাম এত বড় আর কর্কশ যে

উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যেতে পারে, তাই ক্যাব ড্রাইভারকে রানা সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করল, 'উন চেনো?'

হেসে মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার। আধঘণ্টার মধ্যে জায়গামত পৌঁছেও দিল। ক্লাবে ঢুকে রানা দেখল শেষ শো-তে নাচছে মিনা রুজ।

যদ্দেশে যদাচার, একা একটা টেবিল নিয়ে বসলে খাও আর না খাও ব্র্যান্ডির অর্ডার দিতে হবে তোমাকে। বকশিশ দিয়ে মঞ্চের কাছেই বসল রানা। মেয়ে যথেষ্ট লম্বা না হলে ক্যাবারেই জমাতে পারে না, তবে পরিষ্কার বোঝা গেল রুজ ব্যতিক্রম। হাউস ব্যান্ডে ডিসকো বাজছে, তার উদ্দাম গতির সঙ্গে তাল বজায় রেখে রীতিমত জাদু দেখাচ্ছে মেয়েটা, দর্শকদের উল্লাস বর্ণনার অতীত। হলরূমের তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রী বাড়িয়ে দিয়ে নাচ শেষ করল সে, উত্তেজিত দর্শকরা স্টেজে উঠে পড়ার আগেই গুরু নিতম্বে ঢেউ তুলে উইং হয়ে পালিয়ে গেল। টেবিল ছেড়ে রানাও চলে এল মঞ্চের পিছন দিকে।

ওকে যে থামাল সে দু'পেয়ে, এবং উচ্চতায় সাড়ে চার ফুটী, তা না হলে গার্ডের বদলে বুলডগ বলে চালিয়ে দেয়া যেত। অবশ্য ঘেউ ঘেউ না করে কোমরে ঝোলানো হোলস্টারে হাত রেখে চোখ গরম করে তাকাল শুধু। রানার আঙুলে বিশ ডলারের নোট দেখে খালি হাতটা চিল হয়ে ছোঁ দিল। বুলডগ হতে ব্যর্থ গার্ড রানার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। তাকে পাশ কাটিয়ে পারফরমারদের ভিড়ে মিশে গেল রানা, তারপর অর্ধনগ্ন একজন নর্তকীর পথ আটকে জানতে চাইল রুজকে কোথায় পাওয়া যাবে।

'আমাকে তোমার পছন্দ নয়?' অভিমানে ঠোঁট ফোলাল সে।

'কিন্তু আমার যে আগে থেকেই ডেট আছে!'

'রুজের ড্রেসিংরূম হলওয়ের শেষ মাথায়, বাঁ দিকের দরজা।' রানা রওনা হতে পিছন থেকে চিৎকার করে আবার বলল, 'রুজের দর কিন্তু চড়া!'

তা আর বলতে, ভাবল রানা। রুজের সার্ভিস পেতে রানা এজেন্সিকে ভাল কিয়াত খরচ করতে হচ্ছে।

ড্রেসিংরূমের দরজায় নক করল রানা।

'যেই হও, ভাগো। এখন দেখা হবে না, জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার।'

'আমিই তোমার সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট—সুব্রত।'

'দরজা খোলা আছে।'

ড্রেসিংরূমে পাউডার, পারফিউম, লোশন আর ক্রীমের গন্ধ। গায়ে সাদা রোব জড়িয়ে আয়নার সামনে বসে মেকআপ তুলছে রুজ। আয়নায় রানার চেহারা দেখে চোখে আগ্রহ ফুটল, টুলের ওপর নিতম্ব ঘষে ঘুরে বসল তাড়াতাড়ি। 'আপনিই তাহলে সুব্রত বাবু। আমি ভেবেছিলাম মাঝবয়সী কোন কুঁজো লোক হবে। টাকা এনেছেন তো?'

জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে রুজের বাড়ানো হাতে ধরিয়ে দিল রানা।

এনভেলাপ খুলে একতাড়া কিয়াত গুনল রুজ। ভুরু কুঁচকে মুখ তুলল। 'ছেলেটার সঙ্গে যত কিয়াতে রফা হয়েছিল, এখানে তার অর্ধেক দেখছি কেন?'

'ছেলেটা' আসলে মনির হাসানের কাভার আইডেনটিটি। জ্যাকেটের পকেট থেকে আরেকটা এনভেলাপ বের করে রুজকে দেখাল রানা। 'বাকিটা এখানে। নান তুং-এর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর পাবে।'

'জানব কিভাবে আপনি ঠকাবেন না?'

'আমিই বা বুঝব কিভাবে নান তুং আমাকে হিনান ফোর হদিশ বলতে পারবে?'

রুজের চোখ প্রথমে বড়, তারপর সরু হলো। টুল থেকে নেমে নিঃশব্দ পায়ে দরজার কাছে এল, কবাট খুলে উঁকি দিয়ে দেখল বাইরেটা। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি, ঘুরে চলে এল রানার সামনে। ইতিমধ্যে রানাও দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। 'আগুন নিয়ে খেলবেন না, প্লীজ। চারদিকে তার চর আছে। ওই নাম কারও মুখে শুনলে খেপে যায় তারা,' শুকিয়ে যাওয়ায় ফ্যাঁসফেঁসে শোনাল তার গলা। পাশ কাটিয়ে টুলের দিকে ফেরার সময় খেয়াল করল না, আলোড়িত নিতম্বের ঢেউ রানার উরুতে আঘাত করল মৃদু।

রানা বলল, 'আমি আগুন নিয়ে খেলতে ভয় পাই না।'

'খুব বাজে একটা কৌতুক করলেন,' টুলে বসে বলল রুজ, এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। 'এমনকি পিস্তলবাজ পুলিসরা পর্যন্ত তাকে ভয় পায়। এ-ও শোনা যায় যে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলরাও তাকে কাজে লাগায়।'

'আমিও একজন ব্যবসায়ী হিসেবে তাকে কাজে লাগাতেই চাই,' বলল রানা। 'কিন্তু সেজন্যে তাকে আমার ভয় পেতে হবে কেন?'

'আপনি হয় অত্যন্ত বোকা, নয়তো অসম্ভব সাহসী,' বলল রুজ। 'বোকা হলে নির্ঘাত খুন হয়ে যাবেন, সেক্ষেত্রে বাকি কিয়াত আমি আর পাব না। আপনি বরং এখনই পুরো পাওনা মিটিয়ে দিন।'

'বাকিটা কাজ শেষ হলে,' বলল রানা। 'রাজি না থাকলে বলো, আমি অন্য কাউকে ধরি।'

'ঠিক আছে, ওটার আশা আমি নাহয় ছেড়েই দিলাম,' বলল রুজ। 'তবে যতটা পারা যায় পুষিয়ে নিতে হবে আমাকে। আপনি আমাকে আজ ডিনার খাওয়াচ্ছেন।'

'তা না হয় খাওয়াব, কিন্তু নান তুঙের সঙ্গে দেখা করার কি হবে?'

'রাত তো সবে শুরু। সে তার আড্ডা ছেড়ে কোথাও যাবে না।' টুল ছেড়ে নামল রুজ, টয়লেটের দরজা খুলে ঘাড় ফেরাল। 'এদিকে তাকাবেন না, শাওয়ারে আমি দরজা খুলেই দাঁড়াই।'

গোসল করার পর আবার মেকআপ করল রুজ, তারপর রানাকে নিজের হাতটা ধরতে দিয়ে বেরিয়ে এল নাইটক্লাব থেকে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে জেনারেল পাকুয়া অ্যাভিনিউ-এ চলে এল ওরা। ওং ফং রেস্তোরাঁয় ঢুকে মেন্যু দেখল রুজ, অর্ডার দিল সবচেয়ে দামী ফিলিট বীফস্টেইক-এর। সঙ্গে রেড ওয়াইন।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে টেবিল ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রুজ।

'কোন রকম চালাকি কোরো না,' সাবধান করে দিল রানা। 'তোমার যদি পিছনের দরজা দিয়ে পালাবার ইচ্ছা থাকে, শুধু মনে রাখতে বলব আমি জানি তোমাকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

কথা না বলে চলে গেল রুজ, একটু বোধহয় রেগেই গেছে।

কয়েক মিনিট পর তাকে ফিরে আসতে দেখে স্বস্তিবোধ করল রানা। একা নয়, সঙ্গী হিসেবে সর্দি নিয়ে এসেছে সে। ঘন ঘন নাক টানছে, হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা লেগেছে। নাকের ফুটোয় সাদা একটু দাগও দেখা গেল।

'তুমি ড্রাগ অ্যাডিক্ট,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

'মানে?' হকচকিয়ে গেল রুজ।

'অভ্যাসটা দেখা যাচ্ছে,' বলে নিজের নাক ছুঁলো রানা।

ন্যাপকিন ঘষে নাক মুছল রুজ।

'এবার বলো, আগুন নিয়ে কে খেলছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমাকে নিয়ে আপনার মাথা ঘামাতে হবে না।'

'কে বলল তোমাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি? আমি নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবছি। ড্রাগ নিয়ে তুমি ধরা পড়লে আমিও ফেঁসে যাব।'

ডেজার্ট এ কফি খাবার সময় অস্থির দেখাল রুজকে। কফিতে মাত্র একবার চুমুক দিল, বলল, 'চলুন, অন্য কোথাও যাই। এখানে আমার ভাল লাগছে না।'

বিল মিটিয়ে দিল রানা, রুজকে নিয়ে দরজার দিকে এগোল।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল এক লোক।

রানার বাহু ধরা রুজের হাত লোহা হয়ে গেল, শার্টের আস্তিন ভেদ করে মাংসে নখ ঢুকে যাচ্ছে।

আগন্তুক লোকটা মধ্যম আকৃতির, গাঢ় চকলেট রঙের সুট পরে আছে। চওড়া গোঁফ আর মোটা ফ্রেমের চশমায় মুখের বেশিরভাগই ঢাকা। রানার অভিজ্ঞ চোখে হিপ হোলস্টার ধরা পড়ল।

রুজকে দেখে অকৃত্রিম আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখমুখ। 'মিনা, ডার্লিং! তোমাকে দেখে কি ভালই না লাগছে!'

'আমারও ভাল লাগছে, মি. ইয়ে আউং,' মুখে যাই বলুক, গলাটা রুজের শুকনো কাঠ।

মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল ইয়ে আউং, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে চুমো খেলো রুজের হাতের উল্টোপিঠে। 'ভাগ্যবান ভদ্রলোককে মনে হচ্ছে বিদেশী, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে না, ডার্লিং?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' রুজের মুখে স্বাভাবিক রঙ ফিরে আসছে। 'সুব্রত, ইনি মেজর ইয়ে আউং, বিখ্যাত ডিটেকটিভ।'

'বিখ্যাত? তুমি কৌতুক করছ, মিনা।' মেজরের মুখে পেকে ফেটে যাওয়া কাঁঠালের হাসি।

'মি. আউং, ইনি সুব্রত,' বলল রুজ। 'ট্যুরিস্ট, ভারত থেকে আসছেন।'

রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল মেজর আউং। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. সুব্রত। তা উদ্দেশ্যটা কি শুধুই বেড়ানো, স্যার?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না। ঘুরেফিরে দেখতে চাই বিনিয়োগের ভাল কোন সুযোগ আছে কিনা।'

'আমি আপনার সাফল্য কামনা করি। মায়ানমারে সুযোগের কোন অভাব নেই।'

'ধন্যবাদ, মেজর,' বলল রানা। 'তাহলে বিদায়, কেমন? আমরা একটু ব্যস্ত আছি।'

'আমি নিশ্চিত, আবার আমাদের দেখা হবে, মি. সুব্রত। এখন কিন্তু শুধু আউং বললেই হবে। সবাই তাই বলে আর কি।'

'আপনিও আমার নাম ধরবেন।'

'দু'জনকেই শুভেচ্ছা,' বলে রেস্তোরাঁর ভেতর দিকে চলে গেল মেজর আউং।

রুজকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল রানা। 'শীত করছে, রুজ? তুমি কাঁপছ।'

'এ কাকতালীয় না হয়ে যায় না। হ্যাঁ, অবশ্যই। তা না হলে শয়তানের বাচ্চাটা আজ রাতেই এদিকে আসবে কেন! অবশ্যই কোইন্সিডেন্স!' রুজ নার্ভাস, রানার কাঁধ প্রায় খামচে ধরল।

'শয়তান আছে, এরকম ধারণা কিন্তু সায়েন্টিফিক নয়,' বলল রানা। 'তার আবার বাচ্চা হয় কি করে?' নিজের কৌতুকে হাসছে, উদ্দেশ্য রুজকে খানিকটা অভয় দান।

'ঠাট্টা নয়, সুব্রত। ডিবি-র অতি কুখ্যাত অফিসার আউং। অত্যন্ত বিপজ্জনক।'

'বিপজ্জনক, ধরো, হিনান ফোর চেয়েও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ওদের কথা কেউ শুনছে কিনা দেখার জন্যে ঝট্ করে পিছনটা একবার দেখে নিল রুজ। 'একজন যদি টার‍্যানটিউলা হয় তো আরেকজন কাঁকড়া বিছে।'

'তাই?' ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল রানা। 'কে কোনটা?'

'দু'জনেই বিষ, সুব্রত। আমার এই কথা সব সময় মনে রাখবেন।'

একটা ট্যাক্সি নিল ওরা। ড্রাইভারকে রাস্তার নাম বলল রুজ—জেনারেল উন উন সান অ্যাভিনিউ।

'গন্তব্যে প্রায় পৌঁছে গেছি,' দশ মিনিট পর রানার কাঁধে মাথা রেখে বলল রুজ। 'আপনি আমাকে বাকি টাকাটা দিয়ে দিলেই তো পারেন।'

'প্রথমে নান তুং, তারপর টাকা।'

রানার কাছ থেকে সরে সীটের আরেক প্রান্তে চলে গেল রুজ।

চারদিক অন্ধকার। ট্যাক্সির স্পীড কমে এল। নোংরা একটা রোডে ঢুকল ওরা। অন্ধকারের ভেতর সাতরঙা নিওনসাইন দেখা গেল, ওই রঙধনুর পাশেই গাড়ি থামাল ড্রাইভার। রাস্তার দু'পাশে দামী গাড়ির বহর। বেঁটে, ইউনিফর্ম পরা শোফাররা পাহারা দিচ্ছে, তাদের প্রায় সবাইকে সশস্ত্র বলে মনে হলো। ফুটপাথে ছোট ছোট ভিড়। ক্লাবটার নাম কালো বিড়াল।

ওরা ট্যাক্সি থেকে নামতেই রুজকে দেখে শিস দিল কয়েক তরুণ, কালো বিড়ালের খোলা মুখের পাশে জটলা পাকাচ্ছে। দরজায় একজন বডিবিল্ডার পাহারায় আছে, তরুণদের ভেতরে ঢুকতে বাধা দিলেও তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা গ্রাহ্য করছে না। রুজকে লক্ষ্য করে অশ্লীল মন্তব্য ছুঁড়ে দিল তারা। একজন জ্বলন্ত সিগারেট ছুঁড়ল, রানার পায়ের কাছে বিস্ফোরিত হলো আগুনের ফুলকি। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল রুজ, রানার বাহু ধরে আছে।

ক্লাবের ভেতর নরক গুলজার। বিশাল একটা হলঘর। আলো কম, ধোঁয়া বেশি। বডিবিল্ডার রুজকে চেনে, হাত ধরে ভেতরে ঠেলে দিল।

'এ তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এলে?'

রানার কানে ফিসফিস করল রুজ। 'দেখে যাই মনে হোক, এখানেই আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যোগাযোগ হয় এলিটদের। নীতিবাগীশ সমাজতন্ত্রী সাতখুনের আসামীর সঙ্গে কাঁধ ঘষে, দেখে বোঝার উপায় নেই কে কোনজন। তাছাড়া, কালো বিড়ালকে আপনি বাজারও বলতে পারেন।'

'কি বিক্রি হয় এখানে?'

'বলুন কি বিক্রি হয় না। যা চান তাই পাবেন–ছেলে, মেয়ে, বারুদ, ড্রাগ, পেশী, সোনা।'

'ধরো, দালানে আগুন ধরাবার জন্যে আমার একজন লোক দরকার।'

'না!' জোরে মাথা নাড়ায় রুজের কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়ল একরাশ কালো চুল। 'এ-সব আমি শুনতে পর্যন্ত চাই না!'

'আপাতত অবশ্য একটা টেবিল পেলেই আমি সন্তুষ্ট,' বলল রানা।

'নান তুংকে দেখতে পাচ্ছি,' বলল রুজ। 'ওর টেবিলেই বসব আমরা।'

চারপাশে এত লোক, রুজ কার দিকে আঙুল তুলল বোঝা গেল না। উপচে পড়া টেবিলগুলোকে পাশ কাটাবার সময় রুজের হাত ধরে থাকল রানা। একবার দাঁড়িয়ে ওর কানে ঠোঁট ছোঁয়াল সে, বলল, 'তুংকে বোলো না মেজর আউং-এর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে।'

সামনে ইংরেজি ইউ হরফের আকৃতি নিয়েছে জায়গাটা। হরফের দুই বাহু ঢালু হয়ে নেমে গেছে নিচে, যেখানে ডান্স ফ্লোর। একটা বাহুর দেয়াল ঘেঁষে ফেলা টেবিলটা তুঙের। টেবিলটা চৌকো একটা বুদের ভেতর, বুদের ছাদে ফুলের টব। টেবিলে বেশ কয়েকজন বসে আছে।

রুজ ফিসফিস করল। 'টাকা?'

'এখনি নয়,' বলল রানা। 'আগে পরিচয় করিয়ে দাও, কথা বলে দেখি।'

'তুং মাঝখানে বসে আছে।'

'আমার আন্দাজ মিলে গেল,' বলল রানা। বোঝা গেল সহজেই। হিনান ফোর এজেন্ট বা কন্ট্রাক্টর নান তুং পাঁচজনের মধ্যে একা ডিনার জ্যাকেট পরে আছে। ব্যাকব্রাশ করা চুল তেল চকচকে। চ্যাপ্টা মুখ বার্মীজদের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু নান তুঙের চেহারা সরু ও তীক্ষ্ণ। সঙ্গীদের সঙ্গে গভীর কোন আলোচনায় মগ্ন বলে মনে হলো তাকে, তা সত্ত্বেও তার সতর্ক দৃষ্টি অনেক দূর থেকেই আসতে

দেখল রানাকে।

তুঙের ডান ও বাম দিকে একটা করে মেয়ে। ডান দিকের মেয়েটার গায়ের রঙ প্রায় হলুদ, মাথার দু'পাশে বড় আকারের দুটো খোঁপা। বামদিকের মেয়েটা ফর্সা, পরনে থাই পোশাক, হেভি মেকআপ, তুং তার নগ্ন কাঁধে একটা হাত রেখেছে।

সীটের দুই প্রান্তে বসেছে দু'জন পুরুষ। একজনের মুখ তোবড়ানো, মাথায় ছোট টাক, ভাঙা নাকটাকে ঘিরে রেখেছে ঘন ভুরু আর গোঁফ।

রুজ বলল, 'ওর নাম মাইয়ো মিন, তুঙের লেফটেন্যান্ট। আরেক মাথায় সেং জা।'

সেং জার বয়স পঁচিশের বেশি হবে না, সগর্বে মাথাটা উঁচু করে আছে, নিজের প্রকাণ্ড কাঠামো সম্পর্কে সচেতন। রুজকে আসতে দেখে জ্যোতি ফুটল চেহারায়।

রুজ বলল, 'মেয়েগুলোর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, তবে নাম জানি। থাই ড্রেস পরা মেয়েটা নিনি। জোড়া খোঁপার নাম হ্লাদ।

নান তুং সিধে হয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে রুজের হাত ধরল। 'তোমরা আসতে পারায় আমরা খুশি।'

টেবিলে দুটো চেয়ার দিয়ে গেল ওয়েটার। বসল ওরা।

রুজের উদ্দেশে একটা চুমো ছুঁড়ে দিল সেং জা। 'হাই, ডার্লিং!'

তুং বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই সুব্রত?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। হ্যান্ডশেক করল ওরা। তুঙের হাত লোহা, তবে চাপ বাড়াতে গিয়ে যেই টের পেল রানার হাত ইস্পাত, অমনি ঢিল দিল সে। হাসিমুখে সবাইকে অপেক্ষা করতে বলে বুদ থেকে বেরিয়ে এল, এতক্ষণে রানার হাত ছেড়ে বলল, 'এখানে এত গোলমালের মধ্যে আলাপ করা সম্ভব নয়, ওপরে চলুন।'

'চলুন।'

রানাকে নিয়ে একটা খিলানের দিকে এগোল তুং। এখানেও একজন বডিবিল্ডার পাহারা দিচ্ছে। 'ইনি আমার বন্ধু, সিঁড়িতে এক মিনিট কথা বলেই নেমে আসব।'

বডিবিল্ডার মাথা ঝাঁকাতে দুই প্রস্থ সিঁড়ি টপকে ল্যান্ডিঙে থামল ওরা। রানা ও তুং একযোগে পকেট থেকে চুরুট বের করল। তুঙের চুরুট মোটা, কালচে রঙের; রানার চুরুট বাদামী ও সরু। 'হাভানা সিগার?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল তুং, রানার বাড়ানো হাত থেকে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করল। 'মায়ানমারে বাইরের চুরুট আমদানি করা নিষিদ্ধ। তবে হাভানার স্বাদ—আহা!'

প্রথমে নিজের, তারপর তুঙের সিগারে আগুন ধরাল রানা। লাইটার সঙ্গে সঙ্গে না নিভিয়ে বলল, 'আগুনের অনেক গুণ, কি বলেন?'

'হুম্-ম্।'

'আগুন সব ধরনের সমস্যার সমাধান এনে দেয়।'

'একদম সত্যি কথা।' নাক দিয়ে সুগন্ধী ধোঁয়া ছাড়ল তুং। 'আর রুজের কাছ

থেকে যতটুকু শুনেছি, আপনি একটা সমস্যায় পড়েই আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন।'

'সমস্যা একটা হলেও, তাতেই পুরো একটা ওয়্যারহাউস ভরাট হয়ে আছে।'

'সব কথা খুলে বলুন।'

'একটা ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টর গ্রুপের প্রতিনিধি আমি,' শুরু করল রানা। 'অর্থনৈতিক মন্দা চলছে এরকম দেশে পানির দরে সম্পত্তি কিনি আমরা, ওই সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি ঘটাই, স্রেফ আবর্জনাকে সম্পদে পরিণত করি, তারপর ভাল লাভে বেচে দিই।'

'ইন্টারেস্টিং তো!' তুং মনোযোগী হয়ে উঠল।

'এবার এক মার্কিন ধনকুবেরের কথা বলি। তিনি তাঁর বিপুল টাকা জনহিতকর কাজে ব্যয় করবেন। ভদ্রলোক একটা ফাউন্ডেশন গড়ে তুলেছেন, সেটার কাজ হলো একটা ওশোনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউটকে ফান্ড যোগানো। গোপন সূত্রে আমি জানতে পারি ওই ইন্সটিটিউট মায়ানমারে, আন্দামান সাগরের কাছাকাছি, রিসার্চ সেন্টার খোলার জন্যে একটা সম্পত্তি খুঁজছে। ওদের প্ল্যান হলো আন্দামান ও বঙ্গোপসাগরে প্রতি বছর যে সামুদ্রিক ঝড় হয় তার ওপর গবেষণা করা। কাজেই সাগরের কিনারায় তাদের একটা সেন্ট্রাল লোকেশন দরকার।'

'সেরকম একটা লোকেশন আপনি পেয়েছেন।'

'ঠিক। হায়,' আক্ষেপে নিজের কপাল চাপড়াল রানা, 'শুধু কি পেয়েছি? না দেখে কিনেও ফেলেছি। ভাল মন্দ যাচাই না করে কিছু কেনার বান্দা নই আমি, কিন্তু এই ব্যবসাটায় তাড়াহুড়ো না করে উপায় ছিল না। ম্যাপ দেখে সাইটটাকে আমার আদর্শ মনে হয়েছিল। আর দাম? পানির চেয়েও সস্তা। একটাই মাত্র সমস্যা, কিন্তু সে সমস্যার কথা মালিক আমাকে জানায়নি, হাতে টাকা পাবার পর বাতাসে মিলিয়ে গেছে।'

'সমস্যাটা কি?'

'বর্জ্য। টক্সিক ওয়েস্ট। ওয়্যারহাউস আর জেটিতে কয়েকশো ব্যারেল ইন্ডাসট্রিয়াল পলিউট্যান্ট ফেলে রাখা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, মুসিবতই বটে!' তুং সহানুভূতি দেখাল।

'বিল্ডিংটা আমার ভেঙে ফেলার প্ল্যান আছে, কিন্তু ওই শালার ব্যারেলগুলো নিয়ে কি করব?'

'কেন, সাগরে ফেলে দিলেই তো হয়,' বুদ্ধি দিল তুং। 'কিংবা ট্রাকে তুলে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে পারেন।'

'পরিত্যক্ত বন্দরের ওদিকটায় সাগরে ড্রেযিং চলছে,' বলল রানা। 'তাছাড়া, কাজটা ছোট নয়, সরাতে গেলে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি হয়ে যাবে—আমার লাভ বলে কিছুই থাকবে না।'

'আচ্ছা।'

'কিন্তু যদি সম্পত্তিটায় আগুন লাগে, আমি ভারমুক্ত হতে পারি।'

'হ্যাঁ, দুর্ঘটনা তো ঘটেই।'

'বিশেষ করে যদি সামান্য আয়োজন করা হয়। কাজটা বড়, পেশাদারি দক্ষতার প্রয়োজন আছে। আমি জড়িত, বাতাসে এরকম গুজবও থাকা চলবে না। ইন্সটিটিউটে পরিবেশবাদী পাগলরা আছে, তারা জানতে পারলে এই সম্পত্তি কিনতেই চাইবে না।'

'আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'আমার কথা আপনি কার কাছে শুনলেন?'

'আমি পুরানো পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করি,' বলল রানা। 'আমি টাকা ছড়াই, কারণ টাকা কথা বলে। আমার স্থানীয় কন্ট্যাক্টকে বলি, এ কাজে সেরা পেশাদার লোক দরকার আমার। তারা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিল।'

'তাদের পরামর্শ ঠিকই আছে,' বলল তুং। 'আপনি জায়গামতই পৌঁছেছেন। তবে একটা কথা। আমি কিন্তু শুধুই কনট্রাক্টর। সংবাদদাতাও বলতে পারেন। কাজের লোকদের আমি চিনি, কে কাজ করাবে এই খবরটা শুধু তাদেরকে পৌঁছে দিই। মূল কাজ তারাই করে, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না।'

'বুঝতে পারছি। তবে আমারও একটা কথা আছে। কাজের লোকটাকে অবশ্যই প্রফেশনাল হতে হবে। আমার সম্পত্তিটা বিরাট। এ স্রেফ একটা বাড়ি পোড়ানো নয়। কয়েক হপ্তা আগে ইয়ানগনের একটা নিউজপেপার বিল্ডিঙে আগুন লেগেছিল, ঘটনাটা আপনি জানেন?'

তুং একটু বেশি স্বাভাবিক থাকল। 'হ্যাঁ, এরকম একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে বটে।'

'ঠিক ওই মানের কাজ দরকার আমার,' বলল রানা। 'যে ফ্লোরে খবরের কাগজের অফিস, শুধু সেই ফ্লোরটাই পোড়ানো হয়েছে। দক্ষ প্রফেশনালের কাজ। তবে আমার কাজের ধরনটা অবশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। আমি চাই ওয়্যারহাউসটা মাটির সঙ্গে মিশে যাক। মার্কিন ডলারে পেমেন্ট করব। মজুরিও কম দেব না।'

'মানসম্পন্ন কাজ সস্তায় পাওয়াও যায় না।'

'ঠিক কথা।'

'আমার ধারণা, সবার জন্যে সন্তোষজনক একটা চুক্তিতে আসা সম্ভব।'

'চুক্তির প্রথম শর্ত সময়,' বলল রানা। 'হয় কাজটা দ্রুত করাতে হবে, তা না হলে করাবার দরকারই নেই।'

'আমার সহকারীরা সম্পত্তিটা না দেখা পর্যন্ত সম্ভাব্য খরচ সম্পর্কে আমি কোন ধারণা দিতে পারছি না। কত কঠিন তার ওপর নির্ভর করবে কত লাগবে।'

'তারা কি কাল দেখতে যেতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না পারার তো কোন কারণ দেখি না। ঠিক আছে, এই ধরুন পাঁচটার দিকে আবার আমাদের দেখা হবে।'

'ভেরি গুড।' তুংকে পাইয়োপন-এর ঠিকানা বলল রানা। 'লিখে নেবেন না?'

মাথায় টোকা মারল তুং। 'এখানে লেখা হয়ে গেছে।' রানাকে নিজের নাম

লেখা একটা কার্ড দিল সে। 'টেলিফোন নম্বরটা ইয়ানগনের,' বলল সে। 'অ্যানসারিং সার্ভিসের মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। শেডিউল নিয়ে ঝামেলা দেখা দিলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগের উপায় কি?'

'আমি রাজধানীতেই থাকছি, ইন্টারকনে।'

'ওদের সুইমিংপুলটা দারুণ। আমিও মাঝেমধ্যে ওখানে থাকি।'

'আপাতত তাহলে এই পর্যন্তই আলোচনা,' বলল রানা।

'শেষ একটা কথা, সুব্রত বাবু। আমাদের এই আয়োজন এমন নয় যে শর্ত ইত্যাদি কাগজে লেখা যাবে। তবে কথা পাকা হবার পর ওটাকে লিগাল ডকুমেন্ট হিসেবেই গণ্য করব আমরা। আগেই আলোচনা ভেঙে দিতে পারেন আপনি, কিন্তু পাকা কথার পর পিছু হটতে পারবেন না।'

'বুঝেছি।'.

'আর, পেমেন্ট হবে নগদ ডলারে।' ঠোঁট সরু করে হাসল তুং। 'আপনি হয়তো লোক ভাল, কিন্তু আপনার চেক ভাল কিনা বুঝব কিভাবে।'

'নো প্রবলেম।'

'চলুন, মেয়েরা আমাদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।'

'চলুন।'

ছয়

মেইনফ্লোরে ফিরে এসে ওরা দেখল লোকজনের ভিড় আর হৈ-চৈ আগের চেয়েও বেড়ে গেছে।

হলঘরের আরেক দিকে কাউকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল নান তুং। 'অনেকদিন পর পুরানো কিছু বন্ধুকে দেখতে পাচ্ছি। ওদের একটু খবর নিয়ে আসি। আপনি আমাদের টেবিলে বসুন, দু'মিনিট পরেই আসছি আমি।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। নতুন যে গ্রুপটার সঙ্গে মিলিত হলো তুং তারা সবাই মাঝবয়েসী, পোশাক-পরিচ্ছদে ধোপদুরস্ত, প্রত্যেকে সঙ্গে করে স্ত্রী বা সঙ্গিনীকে নিয়ে এসেছে। পরিচয় যাই হোক, ওদেরকে রানার কোন হুমকি বলে মনে হলো না। নিজেদের টেবিলে তুংকে তারা সাদরেই গ্রহণ করল।

ভিড় ঠেলে ধীরে ধীরে এগোতে হলো রানাকে। টেবিলে ফিরে এসে দেখল মাইয়ো মিন, তুঙের লেফটেন্যান্ট, ক্লাবের এক চাকুরে মেয়েকে নিজের উরুর ওপর বসতে দিয়েছে। বয়স হবে বিশ কি বাইশ, ভরাট স্বাস্থ্য, খাটো ব্লাউজে অবাধ্য স্তন যুগলের আবাসিক চাহিদা মাত্র আংশিক মিটেছে; মেয়েটার গলায় ঝুলছে একটা ক্যামেরা। রানাকে দেখেই লাফ দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াল, খিলখিল হাসির ফাঁকে বেরিয়ে এল কথাগুলো, 'কালো বিড়ালে আপনার এই স্মরণীয় মুহূর্ত ধরে রাখুন! বিনিময়ে যা খুশি তাই দেবেন, কোন জবরদস্তি নেই।'

‘দুঃখিত,’ হাসিমুখেই বলল রানা, ‘আমার সঙ্গিনীর এতে অনুমতি আছে বলে মনে হয় না।’

‘না, নেই,’ কি উত্তর দিতে হবে তার ইঙ্গিত রানার কথাতেই পেয়ে গেছে রুজ। ‘আমার ক্যামেরা ফেস ভাল নয়, কাজেই আমি ছবি তুলব না। আর আমাকে ছাড়া আমার সঙ্গী ছবি তুললে সেটাকে আমি আমার অপমান বলে মনে করব।’

মাথার খোঁপা ঠিকঠাক করছিল হ্লাদ, লাফ দিয়ে সীট ছেড়ে মাইয়ো মিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, ‘বলো সব খরচ তোমার, ও আমাদের ছবি তুলুক।’

থাই ড্রেস্ পরা নিনি আরও এক কাঠি সরেস, মাইয়ো মিনের ঘাড় ধরে প্রায় ঝুলে পড়ল। ‘বলো, বলো না গো! কতদিন ছবি তুলি না—প্লীজ, বলো!’

উৎসাহিত হয়ে চোখে ক্যামেরা তুলল ফটোগ্রাফার মেয়েটা। কিন্তু মাইয়ো মিন হাত তুলে নাড়ল। ‘খবরদার! কোন ছবি নয়!’

মনে মনে হাসল রানা। মিনের ছবি তুলতে না চাওয়ার কারণটা পরিষ্কার। শেষবার যে ছবি তার তোলা হয়েছিল, সেটার গায়ে নিশ্চয়ই পুলিস ফাইলের নম্বর লেখা ছিল।

মিন তিন মেয়েকে নিরুৎসাহিত করতে ব্যস্ত, এই সুযোগে গায়ে পড়া ভাব নিয়ে রুজকে বিরক্ত করছে বডিবিল্ডার সেং জা। ‘আমি তোমার সাংঘাতিক ভক্ত, তোমার একটু দয়া-দাক্ষিণ্য আমার জীবনটাকে সার্থক করে তুলতে পারে।’ কথাগুলো মিষ্টি হলেও, মুখের ওপর দুর্গন্ধময় নিঃশ্বাস কতক্ষণ সহ্য করা যায়। ইতিমধ্যে সাবধান করেছে রুজ, তবু সরে বসতে রাজি নয় জা। এবার সে রুজের কাঁধে একটা হাত তুলে দিল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজেকে মুক্ত করল রুজ। আবার একই কাজ করল জা, নিজের দিকে টানছে রুজকে, তার নরম মাংসে ডেবে যাচ্ছে মোটা আঙুল।

ব্যথায় উফ করে উঠল রুজ, চোখ মুখ কুঁচকে আছে। ভারী গলায় হেসে উঠল জা, ব্যথা দিয়ে মজা পাচ্ছে সে; দেখতে পায়নি রানা ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে। তবে রানা কিছু করার আগে রুজই ব্যবস্থা নিল।

হঠাৎ হাসতে দেখা গেল রুজকে। ওই হাসিমুখেই সিগারেটের জ্বলন্ত ডগাটা জার লোমশ হাতে চেপে ধরল।

ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল জা, ঝট করে টেনে নিল হাতটা। ‘ডাইনী! বেশ্যা!’

একটা গ্লাসের সবটুকু শ্যাম্পেন জার মুখে ছুঁড়ে মারল রুজ।

রাগে অন্ধ, রুজকে চড় মারার জন্যে হাত তুলল জা।

খপ করে সেই হাত ধরেই বুড়ো আঙুলটা উল্টোদিকে ঠেলে দিল রানা, যতদূর যায়। আর্তনাদ বেরিয়ে এল জার গলা থেকে, সীট ছাড়ার সময় যন্ত্রণাদায়ক চাপ কমাবার জন্যে সরে আসছে রানার দিকে। ‘ছাড়, শালা! ছাড়, বেজন্মা!’

‘ভদ্র হও,’ রানার গলা নরম ও শান্ত।

চোখের মণি পাক খাচ্ছে, আরও খুলে যাচ্ছে মুখ, জার গলা থেকে ঘড়ঘড়

শব্দ বেরুচ্ছে। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার আওয়াজটা গলায় আটকে যেতে হাতটা ছেড়ে দিল রানা।

সবার দৃষ্টি যখন জার ওপর, টেবিলের দিকে লম্বা হয়ে যা খুঁজছিল তুলে নিল রানার হাত। রুজকে ও বলল, 'আমরা এখন ফিরব।'

চেয়ার ছেড়ে রানার পিছনে চলে আসছে রুজ, ফিসফিস করে বলল, 'সাবধান! ও তোমাকে ছাড়বে না!'

মাইয়ো মিন সীটে হেলান দিয়ে সবই দেখছে, কিন্তু কিছু করছে না। তবে মনে হলো এই প্রথম রানার প্রতি তার আগ্রহ জন্মেছে।

'তোকে আমি খুন করব!' লাফ দিয়ে সীট ছাড়ল জা। টেবিলটা উল্টে পড়তে যাচ্ছিল, গ্লাস আর বোতল ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

ভয়ে ফুঁপিয়ে উঠল নিনি, কিন্তু হ্লাদ মুখে হাত চাপা দিয়ে কেঁপে কেঁপে হাসছে।

সেং জার বৃষস্কন্ধ ফুলে ফুলে উঠল। লাল মুখে শিরাগুলো উঁচু হয়ে আছে। দু'হাত বাড়িয়ে রানাকে ধরতে এল সে।

জা পুরোপুরি উন্মুক্ত। রানা একটা রাইট জ্যাব মারল, থেঁতলে ফেটে গেল জার চিবুক। দ্বিতীয় আঘাতটা লাগল চোয়ালে, শব্দটার ধাতব অনুরণন কাছাকাছি যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদেরকে বিস্মিত করল। বুদের পিছনের দেয়ালে ছিটকে পড়ল জা, ছাদ থেকে খসে পাশের টেবিলে বসা অতিথিদের ওপর পড়ল ফুলের একটা টব। চোখ উল্টে গেছে জার, শুধু সাদা দেখাচ্ছে। দেয়াল থেকে হড়কে টেবিলের তলায় চলে গেল শরীরটা।

একটা ফ্ল্যাশবালব জ্বলে উঠল। ফটোগ্রাফার মেয়েটা রেকর্ড করল দৃশ্যটা।

কপালে তোলা ভুরু নিচু করল মাইয়ো মিন। 'আপনার ওই দ্বিতীয় ঘুসির কোন তুলনা হয় না, সুব্রত বাবু।'

'ও কিছু না।' ব্রোঞ্জের ভারী অ্যাশট্রেটা টেবিল থেকে ওকে কেউ তুলতে দেখেনি, রাখতেও দেখল না। ওটা তুবড়ে গেছে।

এতক্ষণে ছুটে এল নান তুং। 'কি ঘটছে এখানে?'

'সেং জা বেশি মদ খেয়ে ফেলেছে।' কালো বো টাই ঠিকঠাক করল রানা। 'সুস্থ হবার জন্যে টেবিলের তলায় ঘুমাচ্ছে।'

'অবিশ্বাস্য, ওস্তাদ!' তুংকে বলল মিন। 'রুজের বিদেশী বন্ধু মাত্র দুই ঘুসিতে জাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে!'

দুটো ভুরুই কপালে তুলল তুং। 'হুম।'

'আপনার সন্ধেটা মাটি করলাম না তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'প্রশ্নই ওঠে না,' বলল তুং। 'যে লোক নিজেকে রক্ষা করতে জানে তাকে আমি পছন্দ করি।'

'এবার আমাদের যেতে হয়। সবাইকে শুভরাত্রি।' তুংকে পাশ কাটাবার সময় আবার মুখ খুলল রানা, 'কাল আবার দেখা হচ্ছে, পারলে আমার একটা উপকার করবেন।'

'বলুন।'

'জাকে বাড়িতে রেখে বেরুবেন। মানে, ততক্ষণে যদি তার ঘুম ভাঙে আর কি।'

'চিন্তা করবেন না। মদ্যপ ভাঁড়টাকে আমি সিধে করে ছাড়ব।'

স্বল্পমেয়াদি লড়াইটা দেখার জন্যে ছোটখাট ভিড় জমে উঠেছিল, সেই ভিড় দু'ফাঁক হয়ে রানা আর রুজকে পথ করে দিল।

টেব্লিলের তলা থেকে মাথা বের করে মিন বলল, 'ওস্তাদ, জার জ্ঞান ফেরাতে পারছি না।'

'ওখানেই পড়ে থাক,' বলল তুং, ক্লাব ফটোগ্রাফারের খোঁজে আরেক দিকে চলে যাচ্ছে।

'আপনাকে অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে,' রানাকে বলল রুজ। 'আপনাকে খুন না করে জা বিশ্রাম নেবে না।'

'বিশ্রামেই আছে সে।' হেসে উঠল রানা।

ওর হাসি ধীরে ধীরে নিভে গেল বার থেকে এক লোককে এগিয়ে আসতে দেখে।

'আবার আমাদের দেখা হলো, সুব্রত বাবু!'

'হ্যালো, মেজর আউং,' বলল রানা। 'আপনাকে হুইস্কি অফার করতাম, কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমরা চলে যাচ্ছি।'

'না, না, আমি যেন আপনাদের দেরি করিয়ে না দিই। ভাল কথা, সুব্রতবাবু, বগলের তলায় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরছেন, সঙ্গে পারমিট আছে?'

'আপনার চোখ বটে, মেজর।'

'আমার চাকরিই তো এ-সব লক্ষ করা,' বিনয়ী সাজল মেজর আউং।

পুলিসের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়া রানার ইচ্ছে নয়। বলল, 'বিদেশীদের স্মল আর্মস রাখার পারমিট দেয়া হয়, শুনেই এটা যোগাড় করে ফেলেছি, পারমিটের জন্যে আবেদন জানাবার কথা মনে ছিল না। কি রকম খরচ পড়বে বলুন তো।'

'আপনার ধারণা ঘুষ খাওয়ার জন্যে ঘুর ঘুর করছি আমি?'

'চিন্তাটা মাথায় আসেনি বললে মিথ্যেকথা বলা হবে।'

মেজর আউং হেসে উঠল। 'আরে, না! আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। নিজেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা তো থাকতেই হবে। বিশেষ করে আমাদের দেশে আইনশৃংখলার যে করুণ দশা! না, সুব্রত বাবু, ব্যাপারটাকে আমি সিরিয়াসলি নিচ্ছি না।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আপনার আন্তরিকতা আমি ভুলব না।'

'তবে পারমিটটা সংগ্রহ করুন। সব অফিসার আমার মত উদার নয়।'

'আমার মনে থাকবে।'

'আপনাদেরকে আর দেরি করিয়ে দেব না।' পথ ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়াল ইয়ে আউং। 'শুভরাত্রি, ডার্লিং!' রুজকে বলল।

'শুভরাত্রি,' বিড়বিড় করল রুজ। 'এবার নিয়ে দু'বার হলো।'

'আবার আমাদের দেখা হবে, সুব্রত,' বলে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল ভিবি অফিসার।

'লোকটার হঠাৎ করে উদয় হবার একটা বিচ্ছিরি প্রবণতা আছে। একটু চিন্তিত রানাও।

'এখানে ওর আসাটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়,' বলল রুজ। 'কারণ জানি না, তবে বুঝতে পারছি আপনার ওপর ওর চোখ পড়েছে।'

'তবে অস্ত্রটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে পারত, করেনি।' দরজা খুলে ধরল রানা, তারপর রুজের পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল ক্লাব থেকে।

'ঘুষ খায়নি, তার কারণ অল্পে সন্তুষ্ট নয়,' বলল রুজ। 'বড় দাঁও মারার তালে আছে।'

'আচ্ছা!'

একটা ট্যাক্সি নিয়ে উন-এ ফিরে এল ওরা, রুজের ফ্ল্যাটটাও এখানে। দ্বিতীয় এনভেলাপটা রুজের হাতে গুঁজে দিল রানা। তাড়াতাড়ি সেটা নিজের হাতব্যাগে ভরে ফেলল রুজ। ভেতরে পাথর বসানো হাতলসহ একটা পিস্তল দেখল রানা।

'টাকাটা গুনলে না যে?'

'পরে গুনব।'

সাগর থেকে মেঘের মত উড়ে আসছে কুয়াশা, গভীর রাতের নির্জন রাস্তা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, ঝাপসা করে তুলছে স্ট্রীটলাইটগুলোকে। ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে থামল ট্যাক্সি। 'সময় দিয়েছ, সন্ধেটাও ভাল কাটল, সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

রুজ বিস্মিত। 'আপনি ফ্ল্যাটে আসছেন না?'

'আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, রুজ।'

'গল্পও শোনেননি, বার্মীজ মেয়েরা কি রকম অতিথিপরায়ণ হয়?' রুজকে অভিমানী মনে হলো। 'একবার যার সঙ্গে পরিচয় হয়, আমরা চেষ্টা করি সারাজীবন সে যেন আমাদেরকে ভুলতে না পারে। আপ্যায়ন বা সেবা করার একটা সুযোগ কি আমি পেতে পারি না?'

হাসি চেপে রানা বলল, 'তোমার কথা শুনে আমার ভয় লাগছে কেন?'

হেসে উঠে রুজ বলল, 'অভয় দিচ্ছি, ভয়ের কোন কারণই নেই। শুধু এক কাপ কফি খাইয়ে ছেড়ে দেব।'

অগত্যা চারতলায় উঠতে হলো রানাকে।

সাত

ইয়ানগন কালচারাল সেন্টারে বামপন্থী কবি প্রফেসর মায়াতকা থুয়ে কবিতা পাঠ করছে। হলের আসন সংখ্যা আড়াইশো, ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে মাত্র পঁচিশজন দর্শক-শ্রোতা। তাদের মধ্যে পাঁচজন পেশাদার ভিক্ষুক, পরিষ্কার ও ঠাণ্ডা জায়গায়

ভাল ঘুম হবার আশায় এসেছে।

থুয়ে মাঝবয়েসী, মুখে কাঁচাপাকা অল্প দাড়ি। ভরাট কণ্ঠে আবৃত্তি করছে স্বরচিত কবিতা, তাতে সর্বহারা শ্রেণীকে উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে এই বলে যে না চাইলে জন্মদাত্রী মা-ও তার শিশুকে দুধ খেতে দেয় না, কাজেই সর্বহারাকে তার নিজের অধিকার চাইতে তো হবেই, প্রয়োজনে জোর করে কেড়ে নিতে হবে। এক সময় মনে হলো শোষিত শ্রেণীর প্রতি দরদে তার চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে, তবে তা স্রেফ দৃষ্টিভ্রম। আসলে কনট্যাক্ট লেন্সটা ঠিকমত অ্যাডজাস্ট না করায় চোখ দুটো চুলকাচ্ছে।

একক কবিতা পাঠের আসর শেষ হতে দেখা গেল দর্শক-শ্রোতাদের সংখ্যা কমে অর্ধেক হয়ে গেছে। তবে ভিক্ষুকরা সবাই শেষ পর্যন্ত থাকল। কালচারাল সেন্টারের কর্মচারীরা লাঠি নিয়ে তাড়া না করলে তারা বোধহয় সারাজীবনই থেকে যেত।

পডিয়াম থেকে নেমে এল মায়াতকা-থুয়ে, এই সময় এক ভক্ত ও ছাত্রী রুদ্ধশ্বাসে ছুটে এসে আলিঙ্গন করল তাকে। 'দারুণ! অপূর্ব!'

কবি গর্বিত ও আনন্দিত। কিন্তু মেয়েটির ফিসফিসানি সব নষ্ট করে দিল। 'কি বললে?' জিজ্ঞেস করল প্রফেসর থুয়ে।

'আরশাদ আপনার সঙ্গে হরে রাম হরে কৃষ্ণয় দেখা করবে।'

একশো পঞ্চাশ নম্বর উথান্ট অ্যাভিনিউয়ের হরে রাম হরে কৃষ্ণ নিরামিষ রেস্তোরাঁটা মাথা কামানো কৃষ্ণভক্তরা চালায়। ভার্সিটির ছাত্র-শিক্ষকদের প্রিয় আড্ডা হলেও বিকেলের দিকে পৌঁছে থুয়ে তেমন লোকজন দেখল না। একটা কেবিনে একা বসে আছে আরশাদ সুফিয়ান। মধ্যবয়সী লোক, চৌকো মুখ, কলপ লাগানো কালো চুল; গ্রে রঙের সুট পরেছে। কর্নেল আরশাদ সুফিয়ান পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স আইএসআই-এর একজন কর্মকর্তা। ইয়ানগনের পাকিস্তানী দূতাবাসে কমার্স সেক্রেটারির পদে দায়িত্ব পালন করে সে। তবে তার আসল কাজ রোহিঙ্গা বিদ্রোহী গ্রুপগুলোকে অস্ত্র সংগ্রহে সাহায্য করা, তাদেরকে বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতায় উৎসাহ দান, ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক দলের ক্যাডারদের ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

থুয়ে কেবিনে ঢুকে বসতেই কাজের কথা পাড়ল সুফিয়ান। 'তোমার কুরিয়ার আজ সকালে যে ছবিগুলো দিয়ে এল, সনাক্ত করার জন্যে ওগুলো আমাকে ইসলামাবাদে পাঠাতে হয়নি।' টেবিলে একজোড়া ফটো রাখল সে।

প্রথম ফটোটা কালো বিড়ালের ফটোগ্রাফারের কাছ থেকে নান তুং-এর কেনা। বুদ সহ তুঙের পার্টির দৃশ্য ধরা পড়েছে তাতে। দ্বিতীয় ফটোতেও একই দৃশ্য, প্রথমটাই এনলার্জ করা। ডিটেইলস দেখা যাচ্ছে। এটায় সুদর্শন এক তরুণকে দেখা যাচ্ছে, অত্যন্ত ভাল স্বাস্থ্য, পরনে ডিনার জ্যাকেট। 'এই সাবজেক্টকে তুমি চেনো?' জানতে চাইল সুফিয়ান।

'এই লোক সুব্রত বড়ুয়া বলে নিজের পরিচয় দিচ্ছে,' বলল থুয়ে। 'বলছে ভারতীয়, ব্যবসার কাজে মায়ানমারে এসেছে। সত্যি কথা বলতে কি, চরিত্রটি

আমার কাছে রহস্যময়। সেজন্যেই ছবিগুলো তোমার কাছে পাঠিয়েছি।'

'হ্যাঁ, রহস্যময় চরিত্রই বটে, ঠিক তোমার মত।' সুফিয়ান হাসছে না। 'ওর নাম মাসুদ রানা। তুমি এর তাৎপর্য বোঝো, মিস্ট্রি ম্যান?'

'না।'

'বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর মহা ধুরন্ধর এজেন্ট। বিলিভ ইট অর নট, শালার কৈ মাছের জান। কতবার যে ওকে আমরা টার্গেট করেছি তার হিসাব নেই, কিন্তু প্রতিবার ফাঁদ গলে বহাল তবিয়তে বেরিয়ে গেছে। আমাদের হিট লিস্টে এখনও ওর নাম এক নম্বরে।'

থুয়ে একটা চুরুট ধরাল। 'চিন্তার কিছু নেই। ইয়ানগনেই ওকে শোয়ানো হবে।'

'আমরা বহু বছর ধরে চেষ্টা করছি,' বলল সুফিয়ান। 'অথচ আজও ব্যাটা মরেনি। যারা ওকে মারার দায়িত্ব নিয়েছিল আজ তাদের কেউ বেঁচে নেই।'

'বললাম তো, ইয়ানগনেই ওকে পোড়ানো হবে।' থুয়ে হাসছে।

'তোমার প্ল্যানটা আমাকে ব্যাখ্যা করো।'

'হিনান ফোকে ডাকছি আমি,' বলল থুয়ে। 'সে তার ডান হাত চো মাউংকে নিয়ে কাজ সারবে।'

'হিনানকে আমি বিশ্বাস করি না। লোকটার মাথায় গণ্ডগোল আছে। তাছাড়া, নীতির কোন বালাই নেই তার।'

'হিনানকে আমরা স্রেফ হাতিয়ার হিসেবে দেখব, সুফিয়ান। হাতিয়ারের কোন নীতি থাকে? নোংরা, অপ্রীতিকর, বিপজ্জনক কাজগুলো ওকে দিয়ে করিয়ে নিজেদের হাত পরিষ্কার রাখব আমরা, ব্যস।'

'আমি কিন্তু তোমাকে কোন ব্যাক-আপ দিয়ে সাহায্য করতে পারব না,' বলল সুফিয়ান। 'আমার নেটওঅর্ক পরিচয় ফাঁস হবার ঝুঁকি নেবে না।'

'আমি কি বলেছি ব্যাক-আপ দরকার হবে?'

'বেশ। আর সব খবর বলো। দৈনিক মায়ানমারে তথ্যগুলো কে পাঠিয়েছিল, জানা গেছে?'

'না। তদন্ত করে আমার লোকজন কিছুই পায়নি। আমি আমার ব্যর্থতা মেনে নিচ্ছি। তুমি নিজে চেষ্টা করে দেখো–যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সুফিয়ান। 'আগামী মাসে তোমার ক্যাডারদের জন্যে চীনা রাইফেলের একটা চালান আসছে। চালানের অর্ধেকটা ব্ল্যাকমার্কেটে বিক্রি করলে তোমার হাতে ভাল একটা ফান্ড চলে আসবে।'

'ধন্যবাদ।'

'তোমার হাতের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আর দেখা হচ্ছে না,' বলে কেবিন থেকে একাই বেরিয়ে গেল আরশাদ সুফিয়ান।

নান তুং তার সহকারীদের নিয়ে বিকেল পাঁচটার সময় আসবে। রানা পৌঁছাল চার ঘণ্টা আগে।

সামুদ্রিক কুয়াশায় সাদাটে হয়ে আছে আকাশ। রেন্ট-আ-কার কোম্পানির গাড়িটা ব্যারেল দিয়ে তৈরি পাঁচিলের আড়ালে থামাল রানা, রাস্তা থেকে এদিকে তাকালে কেউ যাতে দেখতে না পায়।

গাড়িটা 'ঐতিহ্য'র লোকেরা ভাড়া করেছে। তবে রানার সিদ্ধান্ত, ওদের অর্থাৎ রানা এজেন্সির সক্রিয় সাহায্য নেবে না ও। শাখা প্রধান হিসেবে বৃষ্টি এত বেশি মূল্যবান যে তাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলা যায় না, গুলি চালানোয় শহীদের হাত ভাল নয়, আর নিষ্ঠাবান ও যোগ্য বলে মনে হলেও মনিরের কোয়ালিটি সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। রানার হাতে অনেক কাজ, ইয়ানগন শাখার নিরাপত্তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হলে পিছিয়ে পড়তে হবে ওকে।

অ্যাকশনের জন্যে তৈরি রানা। গাঢ় রঙের জ্যাকেটের নিচে বুলেট প্রুফ ভেস্ট পরেছে। জ্যাকেটের পকেটগুলো ভারী হয়ে আছে অ্যামুনিশনের স্পেয়ার ক্লিপে।

হাতে ল্যুগার, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছে চারপাশ। গলি-ঘুপচি কিছুই বাদ দিল না। নিশ্চিত হওয়া জরুরী, ওর জন্যে আগে থেকে এখানে কেউ অপেক্ষা করছে না।

বিষাক্ত ঝাঁঝ থেকে বাঁচার জন্যে নাকে-মুখে রুমাল বাঁধল রানা, তারপর টুকিটাকি কাজের জিনিস কি পাওয়া যায় দেখার জন্যে গোটা ওয়্যারহাউস চষে ফেলল। তেল-কালি মাখা কয়েক প্রস্থ ক্যানভাস পাওয়া গেল, ওগুলো দিয়ে ঢাকলে গাড়ির অস্তিত্ব গোপন রাখা যাবে। তবে তারচেয়েও অনেক মূল্যবান জিনিস পাওয়া গেল অন্ধকার এক কোণে—একটা ফর্কলিফট।

বাকিট সীটে উঠে বসল রানা, একটুকরো ন্যাকড়া দিয়ে কন্ট্রোল পরিষ্কার করল, তারপর দেখল স্টার্ট নেয় কিনা। সাড়া দিলেও প্রতিবাদে মুখর হলো এঞ্জিন, খক-খক করে কাশল, কিন্তু সচল হতে পারল না। বনেট তুলে এঞ্জিনের গায়ে পেনলাইট তাক করল রানা। প্রতিটি পার্টসে ধুলোর পুরু আস্তর জমে আছে।

ব্যাটারি নিঃশেষ হয়নি, ভালই পাওয়ার সাপ্লাই পাওয়া যাবে। ফুয়েল গজ বলছে গ্যাস ট্যাংক এখনও অর্ধেক ভরা। ছুরির ধারাল ডগা দিয়ে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে মরচে সাফ করল রানা। কারবুরেটারটাও পরিষ্কার করতে হলো। যা যা করার সব করে আবার দেখল রানা স্টার্ট নেয় কিনা। বিকট ব্যাকফায়ার ভেহিকেলটাকে বার কয়েক ঝাঁকি দিল। সগর্জনে জ্যান্ত হলো এঞ্জিন। এগজস্ট থেকে বিস্ফোরিত হলো নীল ও ধূসর ধোঁয়া।

ঠোঁটে হাসি, গিয়ার দিল রানা; ব্যারেলের স্তূপগুলোকে পাশ কাটিয়ে ফর্কলিফট চালাল। মেটাল স্লাইডিং ডোরটা বিরাট, ওটার কাছে থামল ও। খানিকটা জোর খাটাতে মরচে ধরা চেইন ও পুলি সিস্টেম ঘড়ঘড় করে দরজাটাকে ওপরে তুলে দিল। ফর্কলিফট বের করে এনে জেটির শেষপ্রান্তে থামাল, মুখ থেকে রুমাল খুলে তাজা বাতাসে ভরে নিল বুকটা। ওয়্যারহাউসে গ্যাস আর কেমিকেলের ঝাঁঝ এত বেশি, আর কিছুক্ষণ থাকতে হলে নির্ঘাত অসুস্থ হয়ে পড়ত।

মাথার ঝিম ধরা ভাবটা কেটে যেতে আবার ভেতরে ঢুকল রানা, ক্যানভাসের শীটগুলো লিফটে তুলে লুকানো গাড়ির কাছে চলে এল। ওগুলো দিয়ে গাড়িটা

ঢাকার পর খানিক পিছু হটে এসে তাকাল। কেউ বলে না দিলে কারও বোঝার সাধ্য নেই যে ক্যানভাসের নিচে একটা গাড়ি আছে।

ফর্কলিফটটা বারবার স্টার্ট দিল ও বন্ধ করল রানা; কাজের সময় যাতে চাওয়ামাত্র জ্যান্ত হয়। তারপর ওটাকে চালিয়ে আনল গার্ডরুমের পিছনে। গার্ডরুমটা তালা মারা মেইন গেটের এক পাশে।

আর কোন কাজ নেই, এখন শুধু অপেক্ষার পালা।

ভাগ্য যদি এতটুকু সাহায্য করে, আগুন ধরাবার লাভজনক একটা টোপ গোপন আস্তানা থেকে "সুব্রত"-র সঙ্গে দেখা করার জন্যে বের করে আনবে হিনান ফোকে। কোন কারণে যদি সে না আসে, তারপরও রানার হাতে নান তুং থাকবে। আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব নেই, ও জানে দেহরক্ষীদের অচল করে দিয়ে তুঙের কাছ থেকে হিনান ফোর ঠিকানা আদায় করা ওর জন্যে কোন সমস্যা নয়।

গার্ডরুমটা ভালই আড়াল দিচ্ছে, এটার পিছন থেকে রাস্তার ওপর চোখ রাখছে রানা। আকারে চারটে ফোন বুদের সমান, মাথার ওপর ছাদটা ঢালু। যে পাশটা জেটির দিকে সেটা খোলা, কব্জা সহ দরজার কবাট অনেক দিন আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাইরে চোখ রাখার জন্যে বাকি তিন দিকে রয়েছে সরু জানালা।

গার্ডরুমের ভেতরে একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার; একটা চেয়ার নিয়ে এমন এক পজিশনে বসেছে রানা, সরু ফাটল আকৃতির তিন জানালার ওপর নজর রাখতে পারছে।

ওরা এল দু'ঘণ্টা আগে, ঠিক বিকেল তিনটের সময়।

হালকা নীল একটা ভ্যান। রাস্তা ধরে অলস ভঙ্গিতে আসছে। মাথা নামিয়ে নিল রানা, সরু ফাটলের কিনারা দিয়ে তাকিয়ে থাকল।

থামল না, শামুকের মত মন্থরগতিতে সাইটটাকে পাশ কাটাল ভ্যান, বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কয়েক মিনিট পর বাঁকে দু'জন লোক দেখা গেল। হাসিখুশি, অসতর্ক, দুই বন্ধু যেন বেড়াতে বেরিয়েছে। পাঁচশো তিন নম্বর ওয়্যারহাউসের সামনে এসে সহজ ভঙ্গিতে দাঁড়াল তারা।

একজন রোগা-পাতলা তরুণ। তার সঙ্গীর বয়স একটু বেশি, গায়ে হলুদ শার্ট।

ট্রাউজারের পকেট থেকে চাবির রিঙ বের করল তরুণ, রিঙে কয়েকটা মাস্টার কী ছাড়াও মোটা সুচ আকৃতির ধাতব কাঠি ও ওয়াশার রয়েছে। তালার ওপর কাজ করার সময় শিস দিচ্ছে সে। তার সামনে দাঁড়িয়ে চুরুট ধরাল হলুদ শার্ট, দৈবাৎ রাস্তায় কেউ উদয় হলে তরুণকে যাতে দেখতে না পায়।

শিস থামল। ক্লিক শব্দ করে খুলে গেল তালা।

মাথা নিচু করে গার্ডরুম থেকে বেরিয়ে এসে ফর্কলিফটের পিছনে আড়াল নিল রানা।

সাইটে ঢুকে গেট বন্ধ করে দিল তরুণ, দেখে যাতে মনে হয় কেউ ওটায় হাত দেয়নি।

নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে হলুদ শার্ট, গেটের দিকে পিছন ফিরে। রাস্তার ওপর চোখ, চুরুট ফুঁকছে।

সন্তর্পণে গার্ডরুমের দিকে হেঁটে এল তরুণ। সাবধানী, প্রচুর সময় নিচ্ছে। উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখল। গার্ডরুম খালি দেখে ঠোঁট মুড়ে হাসল। সুইচবোর্ডের বোতামে চাপ দিল সে, জায়গা মত ফিরে গেল আট ইঞ্চি লম্বা ফলা। ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি মাত্র কয়েক ফুট দূরে লুকিয়ে রয়েছে রানা।

এখুনি তাকে কাবু করতে পারে রানা, তবে সেটা সময়ের আগে হয়ে যায়। মেহমানরা সবাই এখনও এসে পৌঁছায়নি। ও জানে, একটু পরই চলে আসবে তারা।

সাবধানী তরুণ সতর্ক পায়ে জেটি ধরে এগোল। একটা ফাঁকে তাকাল সে, গাড়িটা যেখানে লুকানো রয়েছে, কিন্তু ক্যানভাসের স্তূপ সরিয়ে দেখার কথা ভাবল না। ওয়্যারহাউসে একবার ঢুকলই শুধু, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল। টক্সিক ঝাঁঝ সহ্য করতে পারেনি, কুঁজো হয়ে কাশল কিছুক্ষণ।

গেটে ফিরে এসে সঙ্গীকে রিপোর্ট করল তরুণ। 'অল ক্লিয়ার!' এখনও দু'একটা কাশি দিচ্ছে, চোখ থেকে পানিও মুছল।

'ঘটনাটা কি?' হলুদ শার্ট হাসছে।

'উহ্!' নাকমুখ কুঁচকে বিকৃত করে ফেলল তরুণ। 'দুর্গন্ধে ওখানে টেকা দায়!'

'ও, আমি ভাবলাম বেচারা বাংলাদেশীর জন্যে কাঁদছ তুমি।'

'কাঁদতে হবে তাকেই।' বুক ভরে শ্বাস নিল তরুণ।

'ওই ওরা আসছে।'

বাঁক ঘুরে ফিরে আসতে দেখা গেল ভ্যানটাকে। হাত তুলে সঙ্কেত দিল হলুদ শার্ট—অল ক্লিয়ার।

গেটটা পুরোপুরি খুলে দিল ওরা। ভেতরে ঢুকল ভ্যান। মাইয়ো মিন চালাচ্ছে, পাশের প্যাসেঞ্জার সীটে বসে আছে নান তুং।

উঠানে পৌঁছে ব্যাক গিয়ার দিল মিন, পিছু হটে গার্ডরুমের সামনে খানিকটা আড়াআড়িভাবে ভ্যান থামাল। ব্যারেলের উঁচু একটা স্তূপ রাস্তা থেকে আড়াল করে রেখেছে ওটাকে। গেটের দিকে মুখ, প্রয়োজনে তাড়াতাড়ি কেটে পড়া যাবে।

এঞ্জিন বন্ধ হলো। ক্যাব থেকে নামল মিন আর তুং। মেঘলা দিনের নিস্তেজ আলোতেও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তুংকে।

ভ্যানের গায়ে দুটো চাপড় মারল মিন। পিছনের দরজা খুলে দু'জন লোক নামল।

লোক দু'জনকে নীচ, শক্ত আর হিংস্র মনে হলো। একজনের হাতে অটোমেটিক রাইফেল, সঙ্গে ব্যানানা ক্লিপ। অপর লোকটার হাতে এম-আই মেশিন পিস্তল।

'গেট,' নির্দেশ দিল তুং।

তরুণ ও হলুদ শার্ট গেট বন্ধ করল। গেটের দুই ভাগ যেখানে মিলিত হবে তার বাইরে হাত বের করে দিয়ে তালা লাগাল তরুণ।

'শালা জানতেই পারবে না এখানে তার চেয়ে আগে পৌঁছেছি আমরা,' কর্কশ হেসে বলল হলুদ শার্ট।

মেশিন গানার জিজ্ঞেস করল, 'কি করব এখন আমরা?'

তার দিকে ফিরল মিন। 'অপেক্ষা।'

তুং একটা চুরুট ধরাল। 'বুদ্ধিমান হলে পাঁচটার খানিক আগেই পৌঁছাবে রানা।'

'বুদ্ধিমান হলে সে আসবেই না, ওস্তাদ!'

'রানার ধারণা সে আমাদেরকে বোকা বানিয়েছে। এই ভুলের জন্যে কঠিন মূল্য দিতে হবে তাকে।' হাতঘড়ি দেখল তুং। 'তোমরা সবাই চারটের সময় পজিশন নেবে। রানা ভেতরে পা রাখার পর আর সময় নিয়ো না।'

দাঁতে দাঁত চেপে রানা ভাবল, তুং ওর পরিচয় জানল কিভাবে!

রাইফেলম্যান বলল, 'একজন লোকের জন্যে আয়োজনটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না? এত ফায়ার পাওয়ারের সত্যিই কি দরকার ছিল?'

'আমারও তো সেই কথা!' মিনের গলায় অসন্তোষ। হাতের .৪৫ ক্যালিবারের রিভলভারটা আঙুলে ঘোরাচ্ছে। 'এটা যখন আছে, তার জন্যে আমি একাই তো যথেষ্ট।'

'এতে কারও হাত নেই,' বলল তুং। 'বস্ এভাবেই চেয়েছেন।'

'বস্ শুধু শুধু অপব্যয় করছেন।'

'তাতে তোমার কি, মিন? টাকাটা তো তারই।'

'ঠিকই তো,' কৌতুক করে বলল রাইফেলম্যান। 'আমরা দু'পয়সা কামাচ্ছি দেখে তোমার চোখ টাটাচ্ছে বুঝি?'

একটা ব্যারেলে লাথি মারল হলুদ শার্ট। 'এগুলোয় গু-গোবর কি আছে বলো তো? এমন দুর্গন্ধ নরকেও থাকে না।'

তরুণ দু'একটা কাশি দিল। 'আশা করি বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।'

'আচ্ছা,' হঠাৎ কি কারণে যেন উত্তেজিত দেখাল মিনকে, 'আমরা শালাকে জ্যান্ত ধরলে ক্ষতি কি? সেক্ষেত্রে মারার আগে কিছুক্ষণ মজা করা যেত।'

'ওসব চলবে না। গুলি করে তাড়াতাড়ি ঝামেলা চোকাবে।' একটু কঠিন হলো তুঙের চোখ। 'মনে রেখো, লোকটা সহজ নয়। দেখলে না কাল রাতে সেং জার কি অবস্থা করল?'

'আমি না থাকায় বঞ্চিত হয়েছি।' ঠোঁট মুড়ে হাসল মেশিন গানার।

'এই কাজটায় জা থাকলে ভাল হত,' বলল হলুদ শার্ট। 'অপমানের বদলা নেয়ার সুযোগ পেত বেচারা।'

'মায়াকান্না কেঁদো না তো। তোমাদের চেয়ে ভাগ্যবান সে। নাচুনে বেশ্যাটার ব্যবস্থা করতে পাঠানো হয়েছে তাকে।' তুঙের ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি।

বাকি সবাই হেসে উঠল।

তথ্য গোটা পরিস্থিতি বদলে দিল। রানার প্ল্যান ছিল, বিচ্ছিন্ন হয়ে যে যার পজিশনে চলে যাবার পর এক এক করে ওদেরকে কাবু করবে। জেরা করার জন্যে তুংকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল ও।

কিন্তু প্ল্যানটা এখন না বদলে উপায় নেই।

আজ সকালেই রুজকে ফোন করে সাবধান করে দিয়েছে রানা, দিন কয়েকের জন্যে অবশ্যই ওর গা ঢাকা দেয়া উচিত। কিন্তু কথাটা সে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে। হেসে উঠে বলেছে, আত্মরক্ষা করার কৌশল জানা আছে তার।

সেং জা তার ব্যবস্থা করতে গেছে, এ-কথা শোনার পর রানা চুপ করে থাকতে পারে না। সময়ের আগে অ্যাকশন শুরু করায় এখন যদি তুং মারাও যায়, ওর কিছু করার নেই।

ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা মিনি বোমা বের করল রানা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হামলা চালাবার এটাই আদর্শ সময়, অ্যামবুশাররা সবাই যখন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে।

বোমার লাল আর্মিং বাটনে চাপ দিল রানা। খুদে গ্রেনেডে আর্মিং ও ডিটোনেশন-এর মাঝখানে পাঁচ সেকেন্ড ডিলে আছে। রানা নিঃশ্বাসের সঙ্গে গুনছে, 'ওয়ান ওয়ান থাউজেন্ড, টু ওয়ান থাউজেন্ড, থ্রী ওয়ান থাউজেন্ড...'

ফর্কলিফটের পিছন থেকে কাত হয়ে খানিকটা বেরুল রানা, জেটির ওপর দিয়ে ভ্যানের দিকে গড়িয়ে দিল গ্রেনেডটা।

শরীরটা আড়ালে টেনে নিচ্ছে রানা, কে যেন বলে উঠল, 'এই! কি ওটা?'

আরেকজন অকস্মাৎ চিৎকার জুড়ে দিল।

ছোট্ট কিন্তু শক্তিশালী গ্রেনেডের বিস্ফোরণ থামিয়ে দিল লোকটাকে।

লাফ দিয়ে ফর্কলিফটে উঠে স্টার্ট দিল রানা। রক্ত হিম করা এক মুহূর্ত বিরতির পর সগর্জনে সাড়া দিল এঞ্জিন।

সাগর থেকে ছুটে আসা বাতাসে ধোঁয়ার পাঁচিল ভেঙে গেছে, উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে রক্তাক্ত দৃশ্যটা।

নিজের তাজা রক্তের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে হলুদ শার্ট, পাশেই তার সঙ্গীর থেঁতলানো ও ভাঙাচোরা শরীর।

রাইফেলম্যান অস্ত্র ফেলে দু'হাত দিয়ে চোখ চেপে ধরেছে। অন্ধ। অন্ধের মতই হোঁচট খাচ্ছে আর ব্যথায় চিৎকার করছে। দেখে মনে হলো তার ওপর কেউ করাত চালিয়েছে।

লাফ দিয়ে ব্যারেলের পিছনে সরে যাওয়ায় ভাল আড়াল পেয়ে গেছে মেশিনগানার। প্রায় এক ডজন ফুটো দিয়ে বিষাক্ত তরল পদার্থ বেরিয়ে আসছে ব্যারেল থেকে, তবে সে পুরোপুরি অক্ষত।

লোকটার হাতে জ্যান্ত হয়ে উঠল মেশিন পিস্তল। এক পশলা বুলেট ফর্কলিফটের সামনের লিফটিং গিয়ারে লেগে দিগ্বিদিক্ ছুটল, ওটা হেভি-ডিউটি স্টীলের তৈরি।

ভ্যানের তলা থেকেও পিস্তলের গুলি হলো। গ্রেনেডটা ফাটার আগেই গড়িয়ে ওটার নিচে চলে গেছে তুং। তার ডান হাত কোন কাজ করছে না। গুলি করছে বাঁ হাত দিয়ে, একটা বুলেটও লক্ষ্যের কাছাকাছি আসছে না।

ভ্যানের ক্যাবে রয়েছে মিন, মাথা নিচু; এক হাতে গুলি করছে, অপর হাত দিয়ে চেষ্টা করছে স্টার্ট দেয়ার।

গিয়ার দিয়ে ফর্কলিফট ছেড়ে দিল রানা, টার্গেট করল মেশিন গানারকে। ট্রিগার টিপতে ভুলে গেল লোকটা, আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল। ফর্কলিফট দ্রুত কাছে চলে আসছে, কিন্তু তার পালাবার কোন জায়গা নেই।

ব্যারেলের তৈরি পাঁচিল ভেঙে দিল ফর্কলিফট, ওগুলোর নিচে চিড়ে চ্যাপ্টা, কিংবা হয়তো আলুভর্তাই হয়ে গেল মেশিনগানার।

ব্যাক গিয়ার দিল রানা, ভেঙে পড়া ব্যারেলের পাঁচিল থেকে পিছিয়ে আসছে ফর্কলিফট।

ভ্যানের এঞ্জিনটাকে ফুয়েলে ভাসিয়ে দিয়েছে মিন। সরাসরি সংঘর্ষের পথ ধরে ফর্কলিফটকে ছুটে আসতে দেখে নিষ্ফল রাগে গর্জে উঠল সে।

ভ্যানের চওড়া দিকটায় আঘাত করল ফর্ক লিফট, স্টীলের বর্ধিত ফর্ক গা ভেদ করল রকার আর্ম-এর ওপরে। টিনফয়েলের মত দুমড়েমুচড়ে গেল ধাতব গা। সংঘর্ষের পরপরই একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হলো, দুটো ভেহিকেলের একটাও নড়ল না।

গিয়ার বদলে গ্যাস পেডাল মেঝেতে চেপে ধরল রানা। গর্জে উঠে সামনে বাড়ল ফর্কলিফট, ভ্যানটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

জান হাতে নিয়ে ক্রল করছে তুং। শরীরের ওপরের অংশ ভ্যানের নিচে থেকে বের হলো। হাতে এখনও পিস্তল থাকলেও কারও জান কবচ করার সময় নেই তার। ভ্যানের ডান ও সামনের চাকা তার শরীরের মাঝখানে উঠে পড়ল। মরণচিৎকার বেরিয়ে এল গলা থেকে, থেমে গেল মাঝপথে।

ভ্যানটাকে ঠেলে জেটির কিনারায় নিয়ে এল ফর্কলিফট।

ক্যাবের ভেতর, চারদিকে, ফুটবলের মত ঘন ঘন বাড়ি খাচ্ছে মিন। কোন রকমে দরজার ফ্রেমটা দু'হাতে ধরতে পারল। নিজেকে তুলতে যাবে, এই সময় পিছনদিকে কাত হতে শুরু করল ভ্যান।

ছিটকে ড্রাইভারের সাইড ডোরের ওপর পড়ল মিন। ভ্যান পানিতে পড়ছে, লাফ দিয়ে তফাতে সরে এল রানা। ভ্যানের পিছু নিয়ে সাগরে ডাইভ দিল ফর্কলিফট। মাটিতে পড়ে গড়াল রানা, স্থির হলো এক হাঁটুতে সিধে অবস্থায়, হাতে ল্যুগার।

ওকে চ্যালেঞ্জ করার মত নেই কেউ।

মেশিন গানারের পরিণতি সম্পর্কে সংশয় আছে মনে, এলোমেলোভাবে পড়ে থাকা ব্যারেলগুলোর দিকে সাবধানে এগোল রানা। রাসায়নিক তরল বর্জ্যে ভেসে যাচ্ছে চারদিক, ঝাঁঝাল ধোঁয়া আর উৎকট দুর্গন্ধে অসুস্থ বোধ করছে ও।

মেশিনগানার মারা গেছে। ব্যারেলের স্তূপ সরাসরি আঘাত করায় হাড়গোড়

গুঁড়ো হওয়া সত্ত্বেও প্রাণে হয়তো বেঁচে যেত, কিন্তু আহত অবস্থায় তরল বিষে ডুবে মরেছে সে।

সবচেয়ে করুণ অবস্থা তুঙের। ভ্যানের চাকা ঠিক মাঝখানে তাকে টুথপেস্ট ভরা টিউবের মত তুবড়ে দিয়ে গেছে।

পানি থেকে বুদ্বুদ উঠছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রানা, কিন্তু উঠল না মিন।

ক্যানভাস সরিয়ে গাড়িতে বসল রানা। খোলার জন্যে নামল না ও, গেট ভেঙে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

রুজের ফ্ল্যাট এখান থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে।

জেটির নিচে পিচ্ছিল একটা পিলার ধরে ঝুলে রয়েছে মিন। হাঁপাচ্ছে সে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে সাগরের লোনা পানি।

রানার চলে যাবার শব্দ পেয়ে সাঁতরে তীরে উঠল ও। কি করতে হবে জানে সে। বাংলাদেশী স্পাইকে ঠেকাবার এখনও একটা সুযোগ আছে। শুধু যদি একটা ফোন করতে পারে সে।

আট

ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। বারুদের পরিচিত গন্ধ ঢুকল নাকে।

হাতে ল্যুগার নিয়ে ঝুঁকে আছে রানা, স্যাৎ করে ভেতরে ঢুকল, টার্গেট খুঁজছে গানমাজল।

লাশ তো টার্গেট হয় না। প্রকাণ্ড শরীর, মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, মাথার ক্ষত থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত শুষে নিচ্ছে নকশাদার কার্পেট।

সাবধানে এগোল রানা। লাশের নিচে জুতোর ডগা ঢুকিয়ে চিৎ করল। দৃষ্টিহীন চোখ সিলিঙের দিকে তাকিয়ে, শেষ মুহূর্তের বিস্ময় এখনও সেং জার চেহারায় স্পষ্ট।

'লে বাবা!' বিড়বিড় করল রানা।

লিভিংরুম থেকে হলওয়েতে চলে এল। সামনে একটা দরজা, কবাট সামান্য একটু খোলা।

চোখের ভুল বা কল্পনা, নাকি সত্যি আরও একটু ফাঁক হলো কবাট? দেয়ালে পিঠ ঘষে এগোচ্ছে রানা, নরম গলায় ডাকল, 'রুজ?'

দরজার ভেতর থেকে খসখস শব্দ ভেসে এল।

'রুজ? আমি সুব্রত!'

হাতলে পাথর বসানো পিস্তলটা দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল। পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো কবাট।

দরজার ভেতর ঘর নয়, ক্লজিট। সেখানে গুড়ি মেরে বসে রয়েছে রুজ,

দু'হাতে ধরা পিস্তল রানার দিকে তাক করা।

রানা চায় না আঁতকে উঠে ট্রিগার টেনে দিক রুজ, তবু নিজের অস্ত্র নিচু করল না। মেয়েটা সম্পূর্ণ অন্য এক জগতের, এত সহজে চিনতে পারার কথা নয়। 'শূটিঙে দেখছি সত্যি খুব ভাল হাত তোমার,' ঘরোয়া আলাপের সুরে বলল ও।

'আপনাকে তো বলেছি, আত্মরক্ষা করতে জানি আমি।'

'পুলিস হয়তো অন্য কোন অর্থ করবে। ওরা পৌঁছানোর আগেই আমাদের সরে পড়া উচিত না?'

'হ্যাঁ।' পিস্তল সরিয়ে ক্লজিট থেকে বেরিয়ে এল রুজ।

আটকে রাখা নিঃশ্বাস ছেড়ে রুজের সামনে দাঁড়াল রানা। রুজের চোখ এখনও বড় হয়ে আছে। সামান্য একটু কাঁপছেও। তবে কোথাও আঘাত পায়নি। 'পিস্তলের সেফটি অন করলে খুশি হতাম,' বলল ও।

'কেন আপনাকে আমি বিশ্বাস করব?'

'এই মুহূর্তে একমাত্র আমাকেই শুধু বিশ্বাস করতে পারো তুমি, রুজ। তোমার একদিকে জার লোকেরা, আরেক দিকে পুলিস।'

'নিজেকে রক্ষা করাটা ক্রাইম নয়। তাছাড়া, আমার এই বিপদের জন্যে আপনিই দায়ী।'

'খেলতে রাজি হয়ে টাকা নিয়েছ তুমি। খেলোয়াড় যেখানে জা আর তুঙের মত লোক, এরকম কিছু একটা ঘটা স্রেফ সময়ের ব্যাপার ছিল মাত্র। দেরি করলে এখানে আরও ঘটনা ঘটবে।'

দেয়ালে হেলান দিল রুজ। ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত লাগছে তাকে। 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমার লাশ না দেখে থামবে না তুং।'

'তাকে থামানো হয়েছে।'

শিরদাঁড়া খাড়া করল রুজ, মুখের রঙ খানিকটা ফিরে পেল। 'আপনি থামিয়েছেন? তাহলে আমি হয়তো বিজয়ী দলকেই সমর্থন করেছিলাম।'

'তুমি কিন্তু অযথা ঝুঁকি নিচ্ছ।'

পিস্তলের সেফটি অন করল রুজ। 'আপনার সঙ্গে গাড়ি আছে, সুব্রত? নাকি এটা আপনার আসল নাম নয়?'

'মাসুদ রানা আমার আরও একটা নাম।' খুঁটিয়ে লক্ষ করল রানা, তবে রুজের চেহারায় এমন কিছু ফুটল না যা দেখে বোঝা যায় নামটার বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে তার কাছে।

'ঠিক আছে, মাসুদ রানা–আপনার সঙ্গে পালাব আমি।' ছুটে বেডরূমে ঢুকল রুজ, আরেক ক্লজিট থেকে সুটকেস বের করে বিছানায় ফেলল।

'করো কি!' প্রতিবাদ করল রানা। 'সুটকেস গোছাবার সময় কোথায়!' ভয় পাবার কারণ আছে ওর। ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। প্রতিবেশীরা নিশ্চয়ই কেউ গুলির শব্দ শুনেছে। জা'র দেরি হচ্ছে দেখে উঠে আসতে পারে ব্যাকআপ, যদি থাকে। ফোন পেয়ে থাকলে পুলিসও চলে আসতে পারে।

'বলেন কি!' হেসে উঠল রুজ। 'সারাজীবনের সঞ্চয় ফেলে চলে যাব?' ঘরের এক কোণে এসে হাঁটু গাড়ল সে, খানিকটা কার্পেট তুলে গুটিয়ে রাখল। কোথাও লুকানো হাতল আছে, সেটা ধরে টান দিতে কাঠের মেঝেতে ছোট্ট ফাঁক তৈরি হলো। ফাঁকের ভেতর, স্ট্রাকচারাল বীম-এর সঙ্গে বোল্ট দিয়ে আটকানো, একটা কমবিনেশন সেফ দেখা গেল। ডায়াল ঘুরিয়ে সেফ খুলল রুজ। 'সুটকেস দিন, প্লীজ।'

রুজের পাশে সুটকেস এনে রাখল রানা। সেফে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো অলঙ্কার তুলল রুজ। হাতটা বারবার সেফে ঢুকল, মুঠো মুঠো সোনা উঠে আসছে।

'ওগুলো যদি খাঁটি হয়, তুমি রীতিমত ধনী মেয়ে।'

'অনেক খেটে কামিয়েছি। চেষ্টা করেছি কেউ যাতে আমাকে ঠকাতে না পারে।'

'বেশি দেরি করলে এ-সবই পুলিসকে ঘুষ দিতে বেরিয়ে যাবে।'

'এই তো, হয়ে এসেছে।'

সেফে আর কোন অলঙ্কার নেই, কিন্তু এখনও ওটার তলায় হাত দেয়নি রুজ। তলা থেকে কিয়াতের মোটা এক জোড়া বান্ডিল উঠে এল। অলঙ্কারের স্তূপে ওগুলো রেখে সুটকেস বন্ধ করল সে। পিস্তলটা ঠাঁই পেল হাতব্যাগে। 'চলুন এবার।'

লিভিংরূমে ঢুকে জানালার দিকে এগোল রানা। পর্দার কিনারা সরিয়ে এক চোখে বাইরে তাকাল।

ছোটখাট হলেও, নিচের রাস্তায় একটা ভিড় জমেছে। লোকজন মুখ তুলে রুজের ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। তবে কোন পুলিস কার বা ইউনিফর্ম চোখে পড়ল না।

পর্দা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে আসবে রানা, এই সময় রাস্তায় চাকা ঘষার আওয়াজ শুনতে পেল। হঠাৎ পাখিদের উড়াল দেয়ার ভঙ্গিতে ছড়িয়ে পড়ল লোকজন। বাঁক ঘুরে তাদের দিকে ছুটে আসছে একটা ট্যাক্সি। সরাসরি ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে এসে থামল সেটা। বিস্ফোরিত দরজা দিয়ে মুখোশ পরা চারজন লোক লাফ দিল।

'পিছন দিকে কোন দরজা আছে?' রুজের কাঁধ ধরে ঝাঁকাল রানা।

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'জলদি!' রুজের কাঁধ ছেড়ে কব্জি চেপে ধরল রানা।

রানাকে নিয়ে কিচেনে চলে এল রুজ। পিছনের দরজায় তালা দেয়া রয়েছে, তবে দরজার পাশেই পেরেকের সঙ্গে ঝুলছে চাবিটা। তালা খোলার সময় রুজ জিজ্ঞেস করল, 'কারা ওরা?'

'সেং জার বন্ধু।'

ফ্ল্যাটের সামনের সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ হলো। লোকগুলো কাছে চলে এসেছে। এভাবে পালাতে চেষ্টা করাটা বিপজ্জনক মনে হলো রানার, পিছন থেকে

আক্রান্ত হলে বাঁচা-মরা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করবে। রুজকে রেখে ছুটে হলে চলে এল ও।

হলে ও-ও ঢুকল, একই সঙ্গে মুখোশ পরা প্রথম লোকটাও। পেঁচানোই ছিল আঙুল, পর পর দু'বার শুধু টান দিতে হলো ট্রিগারে। গর্জে উঠে লোকটার বুকে একজোড়া বুলেট ঢুকিয়ে দিল ল্যুগার।

গুরুতর আহত, কাত হয়ে মেঝেতে ঢলে পড়ল মুখোশ পরা আততায়ী; জীবন রক্ষাকারী শোণিত ধারা দু'হাতে ঠেকিয়ে রাখতে এত ব্যস্ত যে খসে পড়া অস্ত্রের কথা ভুলে গেছে।

গুলির শব্দে সাবধান, দ্বিতীয় লোকটা দরজার পাশের দেয়ালে আড়াল নিয়েছে। মুখের অংশ বিশেষ আর অস্ত্র ধরা হাত বের করে গুলি করল। ভাঙা প্লাস্টার আর ধুলো বৃষ্টির মত নেমে এল রানার মাথায়, তবে কোথাও চোট পায়নি। তাড়াহুড়ো না করে একবারই ট্রিগার টানল, মুখোশ পরা মাথার দু'ইঞ্চি ওপরে দরজার ফ্রেমে লাগল বুলেট। দ্বিতীয় গুলি করার সময় পাওয়া গেল না, তার আগেই সরে গেছে মাথা।

এখানে দাঁড়িয়ে থেকে ওদেরকে টার্গেট প্র্যাকটিস করতে দেয়ার কোন মানে হয় না। দরজার দিকে দুটো গুলি করে পিছিয়ে কিচেনে ফিরে এল রানা, ঠোঁটে আঙুল তুলে চুপ থাকার নির্দেশ দিল রুজকে। পিছনের দরজা খুলে সশব্দে বন্ধ করল ও।

এক সেকেন্ড পরই সদর দরজার খুনীটা লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকল, আওয়াজ শুনে ধরে নিয়েছে পিছনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে রানা ও রুজ। হলওয়েতে সে ঢুকল রানার বুলেট খাবার জন্যে। একটা বুলেট সত্যি সত্যি মুখে পুরল সে, প্রায় নিখুঁত ভঙ্গিতে ডিগবাজি খেলো পিছন দিকে।

পিছনের পথটা উঁকি দিয়ে দেখে নিল রানা। কেউ কোথাও নেই, কাজেই নিরাপদ। কিন্তু মন বলল, এত সহজে কি ওরা পালাতে দেবে?

রানার দিকে তাকিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে রুজ, এক হাতে পিস্তল, অপরহাতে সুটকেস।

'দাঁড়াও এখানে,' বলে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নামল রানা। ল্যান্ডিংটা সিঁড়ির মাঝামাঝি, ওখানে পৌঁছে আক্রমণাত্মক ভঙ্গি নিল—সামান্য একটু কুঁজো হলো, পুরোপুরি লম্বা করা দুই হাতের তালুতে ল্যুগারের হাতল।

সিঁড়ির নিচে করিডরে উদয় হলো বাকি দু'জন। চার নম্বরটা তিন নম্বরের চেয়ে বেশি চালাক, সঙ্গীকে সামনে থাকতে দিয়ে নিজে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে।

সামনের লোকটার মাথা গরম, তা না হলে রানাকে দেখা মাত্র গুলি করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে উঠত না। তার বোধহয় ধারণা বেশি গুলি করলে এক-আধটা লাগবেই। তিন ধাপও ওঠেনি, ক্লিপ প্রায় খালি করে ফেলল, অথচ লক্ষ্যস্থির করেনি।

রানা করল। একটা বুলেটেই থামিয়ে দিল লোকটাকে, সিঁড়িতে পড়ে ধাপ

বেয়ে গড়িয়ে নেমে গেল নিচে, মেঝেতে স্থির হলো মরা মানুষ।

করিডরের বাঁকে আড়াল নিয়ে সঙ্গীর পাগলামি দেখছিল চার নম্বর, রানা তাকে টার্গেট করার সুযোগই পায়নি। তবু দুটো গুলি করল ও, বাঁকের মুখে দেয়ালের কিনারা ভাঙল বুলেট। ল্যান্ডিঙের রেইল টপকে আট ফুট নিচে নামল রানা, মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে দিল নিজেকে। স্থির হলো উপুড় করা শরীর, হাতের ল্যুগার টার্গেট খুঁজছে। ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ ঢুকল কানে। মুখোশের ভেতর সবচেয়ে চতুর লোকটা পালাচ্ছে। ট্যাক্সির আওয়াজ বলে দিল, তাকে ধাওয়া করেও এখন আর কোন লাভ নেই।

রুজকে নিয়ে কেটে পড়ল রানাও।

পুলিস এল পনেরো মিনিট পর।

আয়ে মোয়েকে যেন ভূতে ধরেছে, চুরি করা ট্যাক্সি তার হাতে পড়ে পাগলামি শুরু করল। ইয়ানগনের প্রতি ইঞ্চি তার চেনা, চোখে পট্টি বেঁধে দিলেও যে-কোন ঠিকানায় পৌঁছে যাবে সে। কিন্তু উন তার কাছে অচেনা বিদেশ বললেও চলে। এখানকার অ্যাভিনিউ, বাঁক, উঁচু ফুটপাথ, সরু গলি, কানাগলি–সব মিলিয়ে জটিল একটা গোলকধাঁধার মত লাগছে। ওয়ান ওয়ে রাস্তা ধরে যাচ্ছিল, খানিক পর খেয়াল করল এটা তার জন্যে রঙ ওয়ে।

উল্টোদিক থেকে আসা ড্রাইভারদের চোখেমুখে আতঙ্ক দেখে উল্লাসবোধ করল আয়ে মোয়ে। ট্যাক্সিটাকে এড়াবার জন্যে নিজেদের গাড়ি দ্রুত ডানে বাঁয়ে সরিয়ে নিচ্ছে তারা, তা না হলে মুখোমুখি সংঘর্ষ কেউ ঠেকাতে পারবে না। অনেকেই গাড়ি নিয়ে ফুটপাথে উঠে পড়তে বাধ্য হলো।

মনে হচ্ছে এই তো মাত্র এক মুহূর্ত আগে মাইয়ো মিন তাকে ফোন করেছিল। ৫০৩ নম্বর ওয়্যারহাউসে সাংঘাতিক একটা ম্যাসাকার ঘটে গেছে। এ কি বিশ্বাস করার মত একটা ঘটনা? একজন মাত্র লোক নান তুঙের গোটা দলকে নিশ্চিহ্ন করে দিল? বেঁচে থাকল একা শুধু মিন?

'তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারলে ওকে তুমি ধরতে পারবে,' মিন তাকে বলেছে। 'আমি জানি কোথায় সে যাচ্ছে।'

মিনা রুজ উন-এ থাকে, ঠিকানাটা লিখে নিয়ে মিনকে সে জানিয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রক্তপিপাসু বিদেশী খুনীর একটা ব্যবস্থা করবে সে।

এখন গতি হলো সবচেয়ে মূল্যবান। সময়ের অভাবে খবর দিয়ে প্রফেশনাল হিটম্যানদের জড়ো করতে পারেনি সে। তবে তার মানে এই নয় যে সে নিজে রানার সঙ্গে লাগতে যাবে। ইউনিভার্সিটির ছাত্র সে, ক্যাডার হিসেবে ফ্রীল্যান্সার, গুরু হিসেবে রহস্যমানব মায়াতকা থুয়েকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে; সেই সূত্রে কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র শাখার কয়েকজন উগ্রপন্থী ক্যাডারকে চেনে। ফোন করে সেই কমরেডদের তিনজনকে পায় সে। ক্যাম্পাসের কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় অপেক্ষা করতে বলে তাদের, কথা দেয় দশ মিনিটের মধ্যে দেখা হবে।

একটা ব্যাগে কয়েকটা পিস্তল আর অ্যামিউনিশন ভরে মোয়ে। রাইফেল আর

মেশিন গান হলে ভাল হত, কিন্তু স্টকে হ্যান্ডগান ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। আসলে সময়ের অভাবেই আরও ভারী কিছু যোগাড় করা যায়নি।

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করায় মোয়ে। প্যাসেঞ্জার সীটের দরজা খোলার জন্যে ক্যাব থেকে নেমে পড়ে ড্রাইভার, অমনি তার মুখে পিস্তল চেপে ধরে সে। ওই পিস্তলের বাড়ি খেয়েই জ্ঞান হারাল ড্রাইভার। ফলে ট্যাক্সি হাইজ্যাক হবার পরপরই খবরটা পায়নি পুলিস।

রেস্তোরাঁর সামনে সশব্দে ট্যাক্সি থামতে তিন কমরেড বন্ধু বুঝতে পারল বড় ধরনের কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। তাড়াহুড়ো করে ট্যাক্সিতে উঠে বসল তারা। সঙ্গে সঙ্গে আবার স্পীড তুলল মোয়ে।

কাভার স্টোরিটা মুখস্থ বলে গেল সে। 'গোপন সূত্রে খবর পেয়েছি, ইয়ানগনে কমিউনিস্টদের তৎপরতা বন্ধ করার জন্যে সিআইএ একজন এজেন্টকে পাঠিয়েছে। তার কাজ মৌলবাদী গোষ্ঠিগুলোকে টাকা দিয়ে কমিউনিজম বিরোধী আন্দোলনে উৎসাহিত করে তোলা। কাজ সেরে মায়ানমার ছেড়ে চলে যাচ্ছে লোকটা, কিন্তু আমরা দেরি না করলে এখনও তাকে ধরা সম্ভব।'

কোন প্রশ্ন ছাড়াই গল্পটা বিশ্বাস করল মাওপন্থী কমরেডরা। সিআইএ মানে যে আমেরিকা, আর আমেরিকা মানেই যে কমিউনিস্টদের শত্রু এটা সবাই জানে। তিন কমরেড উত্তেজনায় টগবগ করছে। এতবড় কাজে এর আগে তারা হাত দেয়নি।

এই প্রথম তারা মানুষ খুন করতে যাচ্ছে।

মোয়ে তাদেরকে অস্ত্র আর মুখোশ দিল, তারপর সতর্ক করে দিয়ে বলল, 'সাবধান কিন্তু! শুনলাম এই এজেন্ট ব্যাটা সিআইএ-র টপ ট্রিগারম্যান।'

মানুষ খুন না করলেও, ওদেরকে আনাড়ি বলা যাবে না। নাং ও ফাই এর আগেও পিস্তল চালিয়েছে, আর খাইয়াংও মার্কসম্যানশিপ প্রতিযোগিতায় মেডেল জিতেছে।

তবে রেঞ্জে টার্গেট প্র্যাকটিস আর বন্দুকযুদ্ধ এক কথা নয়। টার্গেট কখনও পাল্টা গুলি করে না।

বাস্তবে দেখা গেল 'সিআইএ এজেন্ট' একাই একশো। তার সামনে ওরা কেউ দাঁড়াতেই পারল না।

ফলাফল?

তিন কমরেড খুন হয়ে গেছে। আর আয়ে মোয়ে আটকা পড়েছে অচেনা রাস্তার জটিল জালে।

বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে মোয়ে। শোকে কাঁদবে সে পরে, এই মুহূর্তে তার প্রার্থনা: তিন কমরেড বন্ধুই যেন মারা গিয়ে থাকে। কেউ যদি বেঁচে থাকে, তাহলে মনে করতে হবে তার ভাগ্যটাই বিশ্বাসঘাতক। সবাই মরে গেলে পুলিসকে কেউ বলার থাকবে না, কার নেতৃত্বে খুনটা করতে গিয়েছিল তারা।

ওয়ান ওয়ে রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে দিক বদল করল মোয়ে। রঙ ওয়েতে না থাকায় চিন্তা করার অবসর পেল সে। প্রথমেই ভাবল, উন্মাদের মত গাড়ি

চালালে পুলিস তাকে থামাবে। ট্যাক্সির স্পীড কমাল সে। কিছুক্ষণ পর নিশ্চিত হলো, কেউ তাকে অনুসরণ করছে না।

পালানো তাহলে সম্ভব।

মাথা ঠাণ্ডা রেখে অজুহাত খুঁজছে মোয়ে। বাংলাদেশী এজেন্ট মাসুদ রানাকে খুন করতে কেন সে ব্যর্থ হলো, এর একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রফেসর মায়াতকা থুয়েকে অবশ্যই তার দিতে হবে।

আরও আধমাইল ছোটার পর চমকে উঠে উপলব্ধি করল মোয়ে, মুখোশটা এখনও খোলেনি সে।

নয়

বৃষ্টির সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। পে-ফোন থেকে ডায়াল করছে, এক লাইন থেকে আরেক লাইনে চলে গেল কলটা, শেষ লাইনে বৃষ্টির নম্বরটা সকল অর্থেই নিরাপদ, কারও পক্ষে ট্রেস করা সম্ভব নয়।

সর্বশেষ কি ঘটেছে শোনার আগেই বৃষ্টি বলল, 'এদিকের আবহাওয়া খুব গরম, মাসুদ ভাই।'

রানা মন্তব্য করল, 'সবটুকু তুমি এখনও জানো না।'

'আপনার মূল কাভার নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি এখন আর সুব্রত নন।'

'বাকিটুকু বলো।'

'দূতাবাস থেকে একের পর এক ফোন আসছে আজ। প্রথমবার করেছেন জাহাঙ্গীর সাহেব। নঈম জাহাঙ্গীর, দূতাবাসের লিগাল অ্যাডভাইজার। সাংঘাতিক খেপে আছেন ভদ্রলোক। আপনার পরিচয় জানেন তিনি, জিজ্ঞেস করছেন আপনার উদ্দেশ্যটা কি।'

'কি উত্তর দিলে তুমি?'

'উত্তর দেব? আমি আপনাকে চিনি নাকি?'

'গুড। ভদ্রলোককে শান্ত করার এটাই একমাত্র উপায়।' হাসল রানা।

'জাহাঙ্গীর সাহেব মানুষ ভাল, মানে আমার সঙ্গে এমনি সময়ে ভালই বনে। আজ ভদ্রলোককে সম্পূর্ণ অচেনা লাগল। সন্দেহ হচ্ছিল, তাঁর ওপর কোন চাপ আছে। দশ মিনিট পরই আমার ধারণা সত্যি প্রমাণিত হলো। ফোন করলেন উনি নিজে।'

'সৈয়দ তারিক মোস্তফা?'

'হ্যাঁ।'

রানা চিন্তিত। দূতাবাস প্রধান নাক গলাচ্ছেন, তাঁর ভূমিকাটা কি? 'কি বললেন তিনি?'

'তার আগে জেনে নিই, আপনি কি জানেন, মোস্তফা সাহেব এবার নিয়ে

তিনবার মায়ানমার এলেন?'

'হ্যাঁ, জানি। এর আগে নেপাল ও কুয়েতে ছিলেন, সেকেন্ড সেক্রেটারি হিসেবে। দ্বিতীয়বার মায়ানমারে আসেন চার বছর আগে, ফার্স্ট সেক্রেটারি হয়ে। প্রথমবার, সে অনেক বছর আগের কথা, জুনিয়ার অফিসার হিসেবে ছিলেন এখানে। এবারই তাকে প্রথম দূতাবাস প্রধান করে পাঠানো হয়েছে।'

'হ্যাঁ। তো উনি যখন নেপালে ছিলেন তখন ওখানে আমিও ছিলাম, সেই থেকে আমার পরিচয় ও পেশা সম্পর্কে জানেন উনি। দূতাবাসের আর মাত্র একজন আমার সম্পর্কে জানেন—নঈম জাহাঙ্গীর।'

'আমরা বোধহয় প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি,' বলল রানা। 'মোস্তফা সাহেব ফোন করে কি বললেন, তোমাকে?'

'উনি আমাকে মায়ানমারের বায়ট অ্যাক্ট পড়ে শোনালেন। জানতে চাইলেন এখানে আপনি কি ধরনের অপারেশন চালাচ্ছেন। জানতে চাইলেন, তাঁর অনুমতি চাওয়া হয়নি কেন।'

'সবাই দেখছি মঞ্চে উঠতে চায়।'

'তাঁকেও আমি ওই একই জবাব দিয়েছি। অর্থাৎ কিছুই বলিনি। তারপর আমি ঢাকায় ফোন করে অভিযোগ করেছি।'

'ঢাকায় কাকে ফোন করলে?'

'ইচ্ছা ছিল সোহেল ভাইকে বলব, কিন্তু তাঁকে পাইনি। হঠাৎ কলজেটা লাফিয়ে উঠল, মাসুদ ভাই! সেই জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর! যখন বুঝতে পারলাম অপর প্রান্তে আমার বসের বস্ কথা বলছেন, ঘেমে নেয়ে উঠলাম আমি।' বৃষ্টি হাসছে।

'কি বললেন বস্?'

'প্রায় কিছুই বললেন না, আমার অভিযোগ শুনে শুধু হুঁ-হ্যাঁ করলেন। তবে দূতাবাস এভাবে নাক গলানোয় তিনি যে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'জানা কথা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এক হাত নেবেন তিনি।' রানা হাসল।

'কিন্তু, মাসুদ ভাই, জাহাঙ্গীর সাহেব আপনাকে সতর্ক করার নামে ঝামেলা করতে পারেন, তার কি হবে?'

'এ-সব ঘরোয়া ব্যাপারে আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই,' বলল রানা। 'ওঁরা কি তোমাকে খুব বেশি বিরক্ত করছেন?'

'না, মানে, ব্যাপারটা হয়তো অ্যাডমিনিসট্রেটিভ লেভেলে পাওয়ার প্লে ছাড়া কিছু নয়, যা বলা হচ্ছে সবই খুব সিভিলাইজড্ ওয়েতে। কিন্তু আপনার বেলায় ওঁরা হয়তো কর্কশ ট্যাকটিকস্ ব্যবহার করবেন।'

'আমার কাছে এমন কিছু খবর আছে, শোনার পর দূতাবাসের ওঁরা স্বীকারই করবে না যে আমি বাংলাদেশী।' এরপর আজ সারাদিন কি কি ঘটেছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিল রানা।

'গুড গড, মাসুদ ভাই!' সব শুনে প্রায় আঁতকে উঠল বৃষ্টি। 'আপনি তো দেখছি রীতিমত যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছেন!'

'জীবনে একঘেয়েমি থাকা উচিত নয়,' শুকনো গলায় দর্শন আওড়াল রানা।

'এটাও অদ্ভুত এক কাকতালীয় ব্যাপার যে সবাই একই সময়ে হঠাৎ করে আবিষ্কার করল সুব্রত আসলে সুব্রত নন।'

'হ্যাঁ, অদ্ভুতই বলতে হবে।'

'এরপর কি, মাসুদ ভাই?'

'আমরা নিরাপত্তা না দিলে রুজ খুন হয়ে যাবে,' বলল রানা। 'ওর জন্যে একটা সেফ হাউস দরকার।'

'এয়ারপোর্টের কাছাকাছি হলে চলবে?'

'চলবে।'

রানাকে ঠিকানা আর কোড বলে দিল বৃষ্টি। 'ওরা আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।'

দূতাবাসের লিগাল অ্যাডভাইজার নঈম জাহাঙ্গীর এই সেফ হাউস সম্পর্কে জানেন কি জানেন না, এ নিয়ে রানার কোন দুশ্চিন্তা নেই। রানা এজেন্সির সেফ হাউস সম্পর্কে কখনোই বাইরের কাউকে কিছু জানানো হয় না। 'ধন্যবাদ, বৃষ্টি। খেলাটা কঠিন হয়ে উঠছে, একটু সতর্ক থেকো।'

'সতর্ক তো বটেই, আমি তৈরিও হয়ে আছি, মাসুদ ভাই,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল বৃষ্টি। 'ডাকলেই পাবেন আমাকে।'

আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল রানা। গাড়িতে ফিরে এসে কিছু বলল না, সাগর ঘেঁষা রাস্তা ধরে কয়েকমাইল প্রায় উড়ে এল।

'রানা–,' বলে থেমে গেল রুজ।

'শুনছি।' গাড়ির স্পীড কমিয়ে আনল রানা।

'আপনাকে আমি একটা কথা বলতে চাই।'

'বলো।

ড্রেসের একটা আলগা সুতো আঙুলে পেঁচাচ্ছে রুজ। 'মেজর ইয়ে আউংকে আমি আপনার সম্পর্কে বলেছি–মানে, সুব্রত সম্পর্কে আর কি।'

'আমি আশ্চর্য হচ্ছি না।'

'আপনার রাগ হচ্ছে না?'

'সেটা অন্য প্রসঙ্গ,' বলল রানা। 'আশ্চর্য হচ্ছি না এই কারণে যে তার সঙ্গে একবার দেখা হওয়াটা হয়তো কাকতালীয় হতে পারত...তারমানে এই নয় যে কাকতালীয় ব্যাপারে আমি বিশ্বাস করি। তবে কেউ নিশ্চয়ই তাকে জানিয়েছিল যে আমরা কালো বিড়ালে যাচ্ছি। আমি বলিনি। বাকি থাকলে শুধু তুমি।'

'আপনি আমার ওপর রেগে আছেন?'

'ব্যাপারটা আমি মেনে নিয়েছি,' বলল রানা। 'আমার অনুভূতির কথা জানতে না চেয়ে তুমি বরং তার ভূমিকাটা পরিষ্কার করো।'

'আমি একবার আমার এক বন্ধুকে খানিকটা কোকেন দিয়েছিলাম। দিয়েছিলাম, বেচিনি। খুবই সামান্য, তাও হাতে-পায়ে ধরেছিল বলে। এর মধ্যে কি এমন অন্যায় ছিল, বলুন? সবাই যেখানে কোটি কোটি কিয়াতের কোকেন নিয়ে

ব্যবসা করছে?'

রুজের চোখ ছল ছল করছে। 'তখন কি আর আমি জানতাম যে আমার ওই বন্ধু আসলে মেজর আউংয়ের চর। ওই একটুখানি কোকেন দেয়ার অপরাধে মেজর আমাকে গ্রেফতার করল। বলল, তার হয়ে কাজ করতে রাজি হলে অভিযোগ তুলে নেবে সে। আর রাজি না হলে সাক্ষী-সাবুদ যোগাড় করে এমন ভাবে ফাঁসাবে, জেল থেকে ছাড়া পাব বুড়ি হওয়ার পর।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে শিউরে উঠল রুজ। 'বুড়ি হওয়ার সুযোগ আমি পেতাম না, রানা। কয়েদীরা আমাকে মেরে ফেলার আগে আমি নিজেই আত্মহত্যা করতাম।'

'তো সেই থেকে মেজরের হয়ে কাজ করছ তুমি।'

'হ্যাঁ, ও আমাকে তার একজন স্পাই বানাল।'

'তার সুতোটা কার হাতে? মানে সে কার হয়ে কাজ করছে?'

'আউং নিজেই নিজের রাজা। বলে, সে কাউকে জমা খরচ দেয় না।'

'আমার পিছনে লাগার কারণ?'

'ঠিক জানি না। এমন হতে পারে যে আপনার ব্যাপারে সে আগ্রহী নয়, আগ্রহী নান তুং আর হিনান ফো...'

'কেন?'

'তার একটা জেদ, দৈনিক মায়ানমার যারা পুড়িয়েছে তাদেরকে সে ধরবেই ধরবে। তার সন্দেহ, কাজটা হিনান ফো-ই করেছে।'

'ধরল, কিন্তু তারপর? গ্রেফতার করবে, নাকি মোটা টাকা ঘুষ খেয়ে ছেড়ে দেবে?'

'এর জবাব শুধু মেজর আউংই দিতে পারবে।' কাঁধ ঝাঁকাল রুজ। 'লোকটা অসৎ পুলিস অফিসার, ঠিক, কিন্তু ক্রিমিনালদের ঘৃণা করে। সে যদি ঘুষ খেয়েও হিনান ফোকে জেলে ভরে, আমি আশ্চর্য হব না।'

'বাহ! এরকম নমুনা আমাদের দেশেও কিছু আছে!'

'কিংবা হয়তো মেরেই ফেলবে,' বলল রুজ। 'আউং একটা খুনীও।'

তিক্ত হেসে রানা বলল, 'তুমি দেখছি ভাল লোকদের সঙ্গেই ওঠাবসা করো।' গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হলো।

নিজের সীটে নেতিয়ে পড়ল রুজ। 'কি জানি, আমার কপালটাই বোধহয় খারাপ। দেখুন না, এখন আবার পালাচ্ছিও আরেকজন খুনীর সঙ্গে। জানি না অভিশপ্ত ভাগ্য কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে।'

'তুমি পালাচ্ছ না, তোমার সঙ্গীটিও খুনী নয়,' বলল রানা। 'তোমাকে একটা নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওখান থেকে যেদিন তুমি বেরুবে, দেখবে সেদিন থেকে কেউ তোমাকে আর অযথা বিরক্ত করছে না।'

রুজের শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল। 'মানে? কি বলছেন আপনি, রানা?'

'তুমি মারাত্মক হুমকির মধ্যে পড়েছ, সেজন্যে আমি দায়ী,' বলল রানা। 'কাজেই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখাটা আমারই দায়িত্ব। বিপদ না কাটা পর্যন্ত তুমি

আমাদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকবে।'

'আমি কি তাহলে আপনাকে চিনতে ভুল করেছি?' বিহ্বল দেখাল রুজকে। একটু পর অভিমানের সুরে বলল, 'আপনি আমাকে সব কথা বলছেন না। আসলে আপনি কে?'

'বিনা স্বার্থে তোমার ভাল চাই, এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না।'

'আমাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে আপনি কোথায় যাবেন?' জিজ্ঞেস করল রুজ, চোখ দুটো ভেজা ভেজা।

'কিছু আলগা সুতো জোড়া লাগাতে হবে আমাকে,' বলল রানা। 'এক কি দু'হপ্তা পর আবার আমাদের দেখা হবে।'

'যদি না ওরা আপনাকে মেরে ফেলে।' অসহায় মেয়েটা এবার কেঁদেই ফেলল।

রাজধানীর উপকণ্ঠে, ইরাবতী নদীর কিনারায়, ম্যাডাম জয়াতুন-এর ব্রথেল। তিনতলা দালানের ত্রিশটা কামরায় রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা মদ, গাঁজা, কোকেন আর হেরোইনের জমজমাট আসর চলছে, তারই ফাঁকে ফাঁকে চলে আদিরসের চর্চা। এখানে যৌনকর্মীদের পালাবদল ঘটে, কিন্তু আসর ভাঙে না।

নিচতলার বড় একটা কামরায় চেয়ার টেবিল ফেলা আছে, অতিথিদের এখানেই প্রথমে স্বাগত জানানো হয়। আজ রাতে খদ্দেরের সংখ্যা বেশি, ফলে নরক একেবারে গুলজার। গাঁজার ধোঁয়ায় ভারী হয়ে আছে বাতাস, তারপরও ঘাম আর সস্তা পারফিউমের গন্ধ একেবারে দূর হয়নি।

ম্যাডাম জয়াতুনকে দেখে মনে হবে মাতাল একজন ট্রাক ড্রাইভার। বিশাল কাঠামো, তাতে চর্বির পরিমাণ কমই, বেয়াড়া খদ্দেরদের একাই সামলাতে পারে। তবে তার একজন দেহরক্ষী আছে। ময়ে নয়ে একজন বডিবিল্ডার, ক্ষুর চালানোয় ওস্তাদ, পিস্তলেও ভাল হাত।

চারজন যৌনকর্মীকে এক লাইনে দাঁড় করাল মাদাম জয়াতুন। দু'জন মোটাসোটা, বাকি দু'জন হাড্ডিসার ড্রাগ অ্যাডিক্ট। 'বলুন, এদের মধ্যে কাকে আপনাদের মনে ধরে। কে সেই ভাগ্যবতী?'

'একজোড়া মাদী শেয়াল, আর একজোড়া নেড়ীকুত্তা।' হিনান ফো হাসছে না। 'আমাদের চোখকে তুমি অপমান করছ, মাদাম জয়াতুন। বিদায় করো ওদের।'

চো মাউং বলল, 'বিদায় করো ওদের। আমরা ফ্রেশ জিনিস চাই।'

'ফ্রেশ মেয়েছেলে?' হাসল জয়াতুন। 'মেয়েছেলে তো গোসল করলেই ফ্রেশ! ভাল করে দেখুন,' বলে একটা মেয়ের চিবুকে হাত রাখল সে। 'দেখুন, সব ক'টা দাঁতই আসল।'

'দাঁত? গরু নাকি যে কেনার আগে দাঁত দেখতে হবে?' হিনান ফো মেজাজ খারাপ করছে না। 'যা বলছি শোনো, জয়াতুন। নতুন জিনিস দেখাও।'

'বুঝেছি! আপনারা আসলে তরমুজের মত বড় বড় পার্টস চান।' জয়াতুনের

মুখে সবজান্তার হাসি। 'তাহলে এই থান নোয়িকে নিন। তাকান, ভাল করে দেখুন...'

ফো বলল, 'কি হে, পার্টনার, পছন্দ হয়?'

চো মাউং অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। মদের গ্লাস সাজানো ট্রে নিয়ে এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে যাচ্ছে কিশোরী একটা মেয়ে, বাচ্চা বললেই হয়, টেনে টুনে বছর পনেরো বয়স হবে; তারই ওপর আঠার মত আটকে আছে মাউং-এর চোখ। একা মাউং নয়, অন্যান্য টেবিলের লোকজনও দেখছে তাকে। কেউ কেউ হাতও বাড়াচ্ছে। তবে মেয়েটা সতর্ক, কৌশলে নাগালের বাইরে থাকছে।

ফোও তাকে দেখল। 'হুমম। এটাকে তো আগে কখনও দেখিনি।'

'থিন আয়াং নতুন,' জয়াতুন বলল, মুখের হাসি নিভে গেছে। 'এখনও কচি, কাজ শুরু করার বয়স হয়নি। না পাকলে ঠোকর দিয়ে কি লাভ। আপনাদের আসলে দরকার পাকা ফল।'

'আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, আমরা একরাতেই পাকিয়ে দেব।'

'না-না। নির্যাতন ওর সহ্য হবে না।'

'যার সহ্য হয় না তাকেই তো নির্যাতন করে মজা!' হেসে উঠল ফো।

জয়াতুন উদ্বিগ্ন। 'ওর পিছনে আমার এক কাঁড়ি টাকা খরচ হয়েছে। আপনাদের হাতে পড়লে ওর যা অবস্থা হবে, তারপর ওর আর বাজারদর বলে কিছু থাকবে না।'

'কেন, খানিক আগে তুমিই না বললে—গোসল করলেই মেয়েছেলে ফ্রেশ? চিন্তার কিছু নেই, জয়াতুন, বিনিময়ে তোমাকে ন্যায্য কিয়াতই দেয়া হবে।'

'না, মানে, বলছিলাম কি, আপনাদের হাতে পড়লে বাচ্চা মেয়েটা না মরে যায়...'

চুরুট প্রায় শেষ, নতুন আরেকটা ধরাল ফো, প্রথমটা ফেলে দিল ছুঁড়ে। জয়াতুনের পায়ের কাছে কার্পেটের ওপর পড়ল সেটা। জয়াতুন হাঁ করে তাকিয়ে থাকল জ্বলন্ত চুরুটের দিকে।

জুতো দিয়ে মাড়িয়ে সেটা নেভাল ফো। 'আগুন দেখলেই কিছু না কিছু আমার ধরাতে ইচ্ছা করে, নিজেকে সামলে রাখতে পারি না।'

পাশের একটা টেবিলে একদল নির্মাণ শ্রমিক বসেছে, পেটা লোহার মত শক্ত তাদের কাঠামো। তাদেরকে বিয়ার পরিবেশন করছে কিশোরী থিন আয়াং। চো মাউং তার বাহু ধরল। 'এদিকে এসো, কচি ময়না।'

শ্রমিকদের একজন, বিশাল এক দৈত্য, কর্কশ গলায় বলল, 'এখানে ওর কাজ আগে শেষ হোক।'

আয়াঙের হাত থেকে ট্রেটা নিয়ে টেবিলের ওপর আছাড় মারল মাউং। টেবিল থেকে ভাঙা কাঁচ আর বিয়ার ঝরে পড়ল কার্পেটে। 'হয়েছে? ওর কাজ শেষ হয়েছে? চলো, সুন্দরী, ওপরতলায় যাই আমরা।'

বাহুটা ছাড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো আয়াং। ব্যথা পাচ্ছে সে। 'ছাড়ুন! আহ্, ব্যথা লাগছে!'

'ব্যথা লাগছে? ওপরে চলো, আরাম লাগবে...'

চেয়ার ঠেলে দৈত্যটা খাড়া হলো। যথেষ্ট লম্বা সে, কিন্তু তারপরও মাউং-এর চেয়ে ছ'ইঞ্চি খাটো। তবে চওড়ায় বেশি সে। চার সঙ্গী তাকে উৎসাহ যোগাল। প্রায় একযোগে চেঁচিয়ে উঠল তারা। 'ব্যাটাকে একটু শিক্ষা দিয়ে দাও!'

'এই,' মাউংকে ডাকল দৈত্য।

'তোমার কোন সমস্যা হয়েছে?' জানতে চাইল মাউং।

'আমার নয়, সমস্যা হয়েছে তোমার,' জবাব দিল দৈত্য।

'উনকুয়ে, একটা ঘুসি মেরে বসে পড়ো, নিজের দাঁত নিজেই কুড়িয়ে নেবে ও,' বলে হেসে উঠল শ্রমিকদের একজন।

উনকুয়ে টের পাচ্ছে আশপাশের সব টেবিল থেকে লোকজন লক্ষ করছে তাকে। নিজের কাছে তার দাম বেড়ে গেল। সে যেন মঞ্চে অভিনয় করছে। 'শুরু থেকেই তোমাকে লক্ষ করছি আমি। ভেতরে এমনভাবে ঢুকলে, এটা যেন তোমার বাপের কেনা বাড়ি। তারপর আমাদের বিয়ার ফেলে দিলে, তোমার মেয়ের বয়েসী আয়াংকে কুপ্রস্তাব দিলে। নিজেকে তুমি আসলে কি ভাবছ বলো তো?'

'ভাবছি তোমার কপালে আমার মার লেখা আছে।' মাউং-এর মুখে ছেলেমানুষের মত সরল হাসি।

হাসল দৈত্য উনকুয়েও। 'তাহলে দেখাই যাক কে কাকে মারে!'

দেখে মনে হলো মাউং শুধু হাতঝাপটা দিয়েছে। কিন্তু তার ফলে উনকুয়ে কিভাবে যে শূন্যে উঠে পড়ল, কেউ বলতে পারবে না। টেবিলে পড়ল সে, তারপর টেবিলসহ কার্পেটে। তার বন্ধুরা লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল।

ধীরে ধীরে সিধে হলো উনকুয়ে। কয়েকবার ঝাঁকিয়ে মাথাটা পরিষ্কার করে নিল। 'এটাই যদি তোমার সেরা মার হয়, আজ তোমার কপালে খারাবি আছে।'

বন্ধুদের একজন বলল, 'উনকুয়ে, শালাকে ভর্তা বানা!'

ওদেরই আরেকজন চেঁচাচ্ছে, 'তুই সরে আয়, উনকুয়ে, আমাকে একটা চান্স দে।'

চারজনই ওরা উনকুয়ের সাহায্যে একযোগে এগিয়ে এল। মাত্র দু'তিন পা এগিয়েছে, এই সময় একটা গুলি হলো।

সবাই দেখল ফোর পিস্তল থেকে ধোঁয়া উঠছে। 'সবাই চুপচাপ বসে পড়ো। তোমাদের উচিত বেঁচে থাকার চেষ্টা করা।'

থমকে দাঁড়ানো চারজনের একজন বলল, 'সঙ্গে অস্ত্র থাকলে আমরাও উপদেশ দিতে পারতাম। কিন্তু গুলি তুমি কজনকে করবে? সবাইকে তো আর মেরে ফেলতে পারবে না। আমরা একজন ঠিকই তোমাকে ধরব...'

ফো নড়ল না, ফলে বোঝা যায়নি সে গুলি করতে যাচ্ছে। কোমরের কাছে ধরা পিস্তল থেকে শুধু আগুনের কিছু ফুলকি ছুটল।

উনকুয়ের যে বন্ধুটা কথা বলছিল ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে, হাত দিয়ে চেপে ধরল রক্তাক্ত কানটা। ফো তার কানের লতি উড়িয়ে দিয়েছে।

'এরপর পুরো কানটা,' নরম সুরে বলল ফো, মিটিমিটি হাসছে।

মাদাম জয়াতুন তার দেহরক্ষী ময়ে নয়ের দিকে তাকাল। কোমরের বেল্টে গোঁজা পিস্তলের দিকে একটু একটু করে হাত বাড়াচ্ছে ময়ে নয়ে।

'কব্জি উড়ে যাচ্ছে,' ফিসফিস করল মাউং।

হাতটা শরীরের পাশে নামিয়ে নিল ময়ে নয়ে।

নিঃশব্দে হাসল মাউং।

কান চেপে ধরে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল উনকুয়ের বন্ধু। দেখাদেখি তার বাকি সঙ্গীরাও, সবার শেষে উনকুয়ে।

ফোর পিস্তল ঘুরে গেল সদ্য আগত এক লোকের দিকে। লোকটাকে দেখার পর ট্রিগার পেঁচানো আঙুলে ঢিল দিল সে। 'আয়ে মোয়ে।' অবাক হয়ে বলল সে। 'তুমি! তুমি এখানে কি করছ?'

'আয়ে মোয়ে আর মেয়েমানুষ? নাহ্!' মাথা নাড়ল মাউং। 'ওর ওইটা নেই, কাজেই মেয়েমানুষ নিয়ে কি করবে!'

আয়ে মোয়ে বলল, 'আমি বেশ্যাদের ঘৃণা করি।'

'তোমার বাপ করত না,' ঝাঁঝিয়ে উঠল জয়াতুন।

'ঘটনা কি?' জানতে চাইল ফো।

'জরুরী একটা কাজ সারতে হবে,' বলল আয়ে মোয়ে।

'ফো আর মাউং পরস্পরের দিকে তাকাল, তারপর একযোগে ফিরল আয়ে মোয়ের দিকে। 'এখানে, এই মাদী শুয়োরের খোঁয়াড়ে কি করছি আমরা? চলো, যাই!'

'কি করছি আমরা!' প্রতিধ্বনি তুলল মাউং। 'চলো!' থিন আয়াংকে ছেড়ে দিল সে। 'অন্য কোন সময়, কচি ময়না।'

উনকুয়ে আর চার বন্ধুদের উদ্দেশে মাথা নুইয়ে ফো বলল, 'আজ তোমরা লটারি জিতেছ। সেই লটারির নাম জীবন।' কোমরের কাছ থেকে পর পর দুটো গুলি করে উনকুয়ের চেয়ারের একজোড়া পায়া ভেঙে দিল, দৈত্যাকৃতি উনকুয়ে ধপাস করে বসে পড়ল কার্পেটে। 'আমাকে যাতে ভুলে না যাও,' বলে আয়ে মোয়ে আর মাউঙের পিছু নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

দশ

মর্নিংওয়াক শেষে হোটেলে ফিরছে রানা।

আপাতত ওর হাতে কোন সূত্র নেই। তবে জানে অ্যাকশনের কোন অভাব হবে না; কারণ ও এখন একটা টার্গেট। মর্নিংওয়াকে বেরুবার উদ্দেশ্য ছিল প্রতিপক্ষদের চোখে ধরা দেয়া, তারপর দেখা, কি ঘটে।

হোটেলের ফ্রন্ট ডোর দিয়েই ভেতরে ঢুকল রানা। ইউনিফর্ম পরা ডোরম্যান মাথা নুইয়ে সম্মান জনাল, 'গুড মর্নিং, স্যার।'

'মর্নিং।'

লবিতে প্রচুর ঠাণ্ডা আলো। ফ্লাওয়ার ভাসে এইমাত্র তাজা ফুল সাজানো হয়েছে, মিষ্টি গন্ধে প্রাণ ভরে গেল। সোফা আর চেয়ারগুলো বেশিরভাগই খালি দেখা যাচ্ছে। অল্প যে কজন লোক আছে তাদের মধ্যে একজনকে বাঙালী বলে সন্দেহ হলো রানার। ছোট করে ছাঁটা চুল খুলি কামড়ে আছে, অ্যাথলেটের মত সুঠাম কাঠামো।

লোকটা লবির দূরপ্রান্তে বসেছে, দরজার দিকে মুখ করে। সামনে খোলা খবরের কাগজ, তবে পড়ছে না। রানাকে দেখে কাগজে মুখ লুকাল।

রানা তার দিকে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে লবির মেঝে পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। লোকটার দৃষ্টিপথ থেকে সরে এসে দোতলার একটা পিলারের আড়ালে গা ঢাকা দিল ও, উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে।

বাঙালী তরুণ খবরের কাগজ ফেলে ছুটল ফোন বুদের দিকে। দু'একটা কথা বলে বুদ থেকে বেরিয়ে এল সে, হন-হন করে হেঁটে এসে ঢুকে পড়ল একটা এলিভেটরে।

এলিভেটর থেকে চারতলায় নামল তরুণ। ওখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছে রানা।

তরুণ কোন দিকে না তাকিয়ে রানার স্যুইটের দিকে যাচ্ছে। সিঁড়ির দরজা খুলে তার পিছনে চলে এল রানা। পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরাতে যাবে, তরুণের পিঠে তর্জনী ঠেকাল ও। 'হাত দুটো শরীরের পাশে ঝুলিয়ে রাখো। তা না হলে ট্রিগার টেনে দেব।'

তারপরও রানাকে দেখার জন্যে ঘাড় ফেরাতে গেল তরুণ। আঙুলটা তার পিঠে আরও একটু ঢোকাল রানা। 'সোজা সামনে তাকাও!'

'আমি জানি তুমি গুলি করবে না!' রুদ্ধশ্বাসে বলল তরুণ। 'অন্তত এরকম খোলা জায়গায়...'

'দেখতে চাও?' ধমক দিল রানা। উত্তরের অপেক্ষায় থাকল না। 'দেয়ালে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়াও।'

'শোনো, তুমি...'

'কি বললাম!'

দু'পা এগিয়ে দেয়ালে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়াল তরুণ। সার্চ করে তার পকেট থেকে একটা ওয়ালথার পিপিকে বের করল রানা। আঙুলের বদলে কাজে লাগাল ওটা। ট্রাউজারের পকেটে পাওয়া গেল মানি ব্যাগ। সেটা খুলে আইডেনটি কার্ড বের করল। 'বাবুল আখতার, বাংলাদেশ পুলিস, ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ,' পড়ল ও, মুখ তুলে বলল, 'এখানে কেন আসা হয়েছে, কি করা হচ্ছে, এ-সব পরে; তার আগে এক জায়গায় যাব আমরা।'

'কোথায়?'

'না, বেশি দূরে কোথাও নয়। এই তো, আমার স্যুইটে। কোন চালাকি নয়, কেমন?'

করিডর ধরে রওনা হলো ওরা। আখতারের ঠিক পিছনেই রয়েছে রানা। আখতার বলল, 'কাজটা কিন্তু তুমি ভাল করছ না, রানা। আমি সরকারী দায়িত্ব পালন করছি, তাতে বাধা দেয়া তোমার উচিত হচ্ছে না। এখন যদি আমি চিৎকার করি, এখানকার পুলিস এসে তোমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে।'

'তার আগে তুমি আমার গুলি খেয়ে মারা যাবে,' বলল রানা। 'আমার নাম যখন জানো, তাহলে এ-ও জানো যে সত্যি আমি গুলি করব।'

'অতীতে তুমি যতই নাম কিনে থাকো,' হিসহিস করে বলল আখতার, 'এবার যে বিপদে জড়িয়েছ তা থেকে তোমার আর বাঁচার কোন উপায় নেই!'

'কিন্তু দু'জনের মধ্যে শুধু আমার হাতে অস্ত্র।'

নিজের স্যুইটের কাছাকাছি এসে রানা জানতে চাইল, 'ভেতরে ক'জন, আখতার?'

'ক'জন মানে···উফ্!'

গান মাজল দিয়ে পাঁজরের ফাঁকে খোঁচা মারায় ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল আখতার। 'চালাকি করতে নিষেধ করিনি? ক'জন?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

'একজন।'

'মাত্র একজন?'

'খোদার কসম!'

'নাম?'

'শাহিন।' রানার স্যুইটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল আখতার।

'আবার বলছি, কোন চালাকি নয়। শাহিনকে যদি কোনভাবে সাবধান করো, তোমাকে দু'হপ্তা হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হবে। নক করো।'

আখতার নক করল। কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

'আমি হোটেলে ফিরে এসে অন্য দিক দিয়ে আবার বেরিয়ে গেছি,' ফিসফিস করল রানা।

ঠোঁট কামড়ে আবার নক করল আখতার। 'শাহিন! আমি, বাবুল! দরজা খোলো!'

এক মুহূর্ত পর দরজা খুলে গেল। ভারী একটা গলা খেঁকিয়ে উঠল, 'ওই ব্যাটা কোথায়?'

'হোটেলে ফিরে এসে অন্য দিক দিয়ে আবার বেরিয়ে···'

পিঠে ধাক্কা দিয়ে আখতারকে ঘরের ভেতর ঠেলে দিল রানা। হেভিওয়েট বক্সারের মত কাঠামো, বয়স হবে ত্রিশ, আখতারের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল কার্পেটের ওপর, আখতারকে বুকে নিয়ে।

ঘরে ঢুকে পা ছুঁড়ে দরজা বন্ধ করল রানা, ওয়ালথার তাক করল দুই ডিবি অফিসারের দিকে।

আখতারকে বুক থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দাঁড়াল শাহিন। 'এর মানে কি?' রানার স্যুইটে একা সময় কাটাবার সময় একটু আরাম পাবার লোভ ছাড়তে পারেনি সে। জ্যাকেটটা খুলে একটা চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে রেখেছে। গলার কাছে

ঢিলে হয়ে আছে টাই। শার্টের আস্তিন গুটানো।

কোমরে, উঁচু করে, একটা হোলস্টার পরে আছে সে, তাতে একটা .৩৮ স্পেশাল দেখা যাচ্ছে।

'ওটা নিলাম।' শাহিনের পিছনে এসে তার মাথায় ওয়ালথার ঠেকাল রানা, হোলস্টার থেকে রিভলভারটা তুলে কোমরে গুঁজে রাখল।

'গর্দভ!' আখতারের উদ্দেশে বলল শাহিন। রাগে ফোঁস ফোঁস করছে।

'আমি···আমার···' শুরু করল আখতার।

'তুমি একটা স্টুপিড!' ধমক মারল শাহিন। তারপর রানার দিকে ফিরল। 'তুমিও তাই।'

'সেজন্যেই আমার হাতে অস্ত্র আর তোমার হাত খালি।' রানা হাসল।

'আপাতত, বন্ধু, আপাতত।'

'দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসো তোমরা,' নির্দেশ দিল রানা। 'মাথার পিছনে হাত রাখতে ভুলো না। মুভ!'

নির্দেশ পালন করল ওরা।

ওয়ার্ড্রোব থেকে সুটকেস বের করে বিছানার ওপর ফেলল রানা। 'বাধ্য হয়ে চলে যেতে হচ্ছে,' বলল ও। 'ইন্টারকনে অবাঞ্ছিত অ্যামেচারদের বড় বেশি ভিড়।' নিজের জিনিস-পত্র সুটকেসে ভরছে।

'পালাচ্ছ, পালাও,' বলল শাহিন। 'কিন্তু বেশিদিন লুকিয়ে থাকতে পারবে না।'

'আমি ভয়ে কাঁদছি।'

'দু'দিন পরই কাঁদতে হবে, কাজেই হেসে নাও।'

'নঈম জাহাঙ্গীরকে বলবে, এরপর উনি যেন প্রফেশনালদের পাঠান।'

'নঈম জাহাঙ্গীর!' মাথা নাড়ল শাহিন। 'তার মত অযোগ্য লোককে সাহায্য করতে বয়েই গেছে আমাদের। আমরা চৌধুরী সাহেবের নির্দেশে কাজ করছি।'

রানার হাত স্থির হয়ে গেল। 'চৌধুরী?'

'মিনহাজ চৌধুরী। নামটা শোনোনি?'

'শুনেছি বৈকি,' বলল রানা।

মিনহাজ চৌধুরী ডিবি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। ডিবিতে ফরেন ডেস্ক নামে একটা সেকশন আছে, সেই সেকশনের প্রধান তিনি। তাঁর কাজ হলো বিদেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশী দূতাবাসে, কোন অপরাধ বা দুর্নীতির ঘটনা ঘটলে তা তদন্ত করা এবং তদন্তের রিপোর্ট বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া।

রানার আরও মনে পড়ল, দশ বছর আগে ইয়ানগনের বাংলাদেশ দূতাবাসে লিগাল অ্যাডভাইজার হিসেবে চাকরি করে গেছেন মিনহাজ চৌধুরী। পুলিস অফিসার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করলেও, আইনের ওপর তার পড়াশোনা ও দখল রীতিমত ঈর্ষণীয়।

রানার চিন্তামগ্নতার ভুল অর্থ করল শাহিন। 'এতক্ষণে তোমার টনক নড়ল, কেমন? মিনহাজ সাহেবকে খেপালে তোমার কপালে সত্যি ভোগান্তি আছে।'

'হাত তোলো!' ধমক দিল রানা।

নামিয়ে নিয়েছিল, ধমক খেয়ে আবার মাথার পিছনে হাত রাখল শাহিন। 'তুমি আসলেই গর্দভ! তা না হলে মিনহাজ স্যারকে ভয় পাচ্ছ না কেন?'

'ওঁর সঙ্গে আমি কথা বলব।' মাথার চুলে আঙুল চালাল রানা।

'বলতে তুমি বাধ্য। তোমাকে টাইট করতেই তো ইয়ানগনে এসেছেন তিনি।'

'উনি এখানে!'

'হ্যাঁ, এখানে,' বিদ্রূপের সুরে বলল শাহিন। 'তোমাকে তুলে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। নিজের ভাল চাইলে অস্ত্রগুলো ফেরত দাও, তারপর আমাদের সঙ্গে চলো।'

কথা না বলে ক্রেডল থেকে ফোনের রিসিভার তুলল রানা।

'কাকে ফোন করছ?' জানতে চাইল শাহিন।

রানা জবাব দিল না। হোটেলের অপারেটরকে বলল, 'বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে কথা বলব।' লাইন পাবার পর নঈম জাহাঙ্গীরকে চাইল ও।

নঈম জাহাঙ্গীর এক মিনিট পর লাইনে এলেন। 'লিগাল অ্যাডভাইজার, বাংলাদেশ দূতাবাস।'

'আমি মাসুদ রানা। খোলা লাইন, কাজেই কথা বলার সময় সাবধান।'

এক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল, তারপর নঈম জাহাঙ্গীর বললেন, 'শুনুন, মি. রানা...'

'না, আপনি শুনুন। আমি এখানে দু'জন জোকারকে বসিয়ে রেখেছি, নাম বলছে আখতার আর শাহিন।'

'কারা ওরা?'

'বলছে ডিবির অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার মিনহাজ চৌধুরী পাঠিয়েছেন। ভাব দেখে মনে হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার নয়, মিনহাজ চৌধুরী পোষেন ওদেরকে।'

'মিনহাজ চৌধুরীর লোক? আপনি ঠিক জানেন?'

'ওরা আরও বলছে, চৌধুরী সাহেব নাকি ইয়ানগনে।'

'অসম্ভব! সে এখন ঢাকায়।'

'আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত, মি. জাহাঙ্গীর?'

'না, মানে, সে ইয়ানগনে আসবে অথচ আমি জানব না?'

'এখন জানলেন। দেখে শুনে মনে হচ্ছে আপনার জঙ্গলে শিকার করে বেড়াচ্ছেন চৌধুরী।'

'তা করলে আমি তাকে দেখে নেব! সে...' নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার জন্যে চুপ করে গেলেন নঈম জাহাঙ্গীর। তারপর অস্বাভাবিক শান্ত গলায় বললেন, 'এ এমন একটা বিষয়, টেলিফোনে আমরা আলোচনা করতে পারি না।'

'না, পারি না,' একমত হলো রানা। 'আমি একটা মীটিং চাই–আপনি, চৌধুরী আর আমি বসব। আয়োজনটা কি রকম হবে পরে আপনাকে জানাচ্ছি।'

'এক মিনিট, প্লীজ...'

যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

'আমাদেরকে ঝামেলায় জড়ানোর জন্যে ধন্যবাদ।' শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল শাহিন।

'মাই প্লেজার।'

'এ আমি ভুলব না।'

শাহিনের অস্ত্র ভরে সুটকেস বন্ধ করল রানা।

'আরে, কি করছ তুমি?' চেঁচিয়ে উঠল শাহিন।

'তোমাদের অস্ত্র জাহাঙ্গীর সাহেবের মাধ্যমে ফেরত দেব,' বলল রানা। 'তাঁর সঙ্গে দেখা করে চাইলেই পেয়ে যাবে।'

'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করল আখতার।

সুটকেস নিয়ে দরজার কাছে চলে এল রানা, এতক্ষণে পকেটে ভরল ওয়ালথারটা। রানার হাত খালি, তবু ভাগ্য পরীক্ষায় উৎসাহিত হলো না আখতার। মেঝেতে বসেই থাকল সে।

'এখানে দুপুর পর্যন্ত থাকতে পারবে তোমরা, তারপরও থাকতে চাইলে ভাড়া দিতে হবে। ততক্ষণ আরাম করো।'

ফাঁকা করিডরে বেরিয়ে এল রানা। এলিভেটরে ঢোকার সময়ও কাউকে দেখতে পেল না। নিচের লবিতে লোকজন বেড়েছে, তবে তাদের মধ্যে ওকে কেউ বিশেষভাবে লক্ষ করছে বলে মনে হলো না।

সুইংডোর ঠেলে লবি থেকে বেরিয়ে এল রানা। গেট দিয়ে ঢুকে গাড়ি-বারান্দায় একটা ট্যাক্সি এসে থামল, ড্রাইভার দরজা খুলে দিতে নিচে নামল প্রৌঢ় এক চীনা দম্পতি, সঙ্গে ষোলো-সতেরো বছরের একটা মেয়ে। বোঝাই যায়, নিরীহ ট্যুরিস্ট। একজন পোর্টার ট্যাক্সি থেকে তাদের ব্যাগগুলো নামাল, তারপর ট্যুরিস্টদের পিছু নিয়ে লবিতে ঢুকে পড়ল।

ধাপ ক'টা টপকে নিচে নামল রানা, চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দরজা খুলে উঠে বসল ট্যাক্সির ব্যাক সীটে। ড্রাইভারকে বলল, 'খই খই কুয়া।'

ড্রাইভার ইংরেজিতে বলল, 'ইয়েস, স্যার!'

রাস্তায় যানবাহনের অবিচ্ছিন্ন মিছিল, রানার ড্রাইভার গেট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে বেরুতেই পারছে না। জানালা দিয়ে মাথা বের করে ফাঁক খুঁজছে সে।

ওদের পিছনের বাঁকে ট্র্যাফিক লাইট বদলে যেতে মিছিলে সাময়িক ছেদ পড়ল।

গেট থেকে রাস্তায় বেরুচ্ছে ট্যাক্সি।

কেউ একজন হর্ন চেপে ধরার পর আর ছাড়ছে না। বিরক্ত হয়ে পিছনের উইন্ডো দিয়ে বাইরে তাকাল রানা।

হঠাৎ একটা মার্সিডিজ ট্রাক রেডলাইট অগ্রাহ্য করে ছুটে এল। একসঙ্গে বেজে উঠল আরও কয়েকটা হর্ন, তার সঙ্গে শোনা গেল অকস্মাৎ ব্রেক করায় কংক্রিটের সঙ্গে চাকার ঘর্ষণ।

মার্সিডিজ ট্রাক থামছে না। সোজা রানার ট্যাক্সি লক্ষ্য করে ছুটে আসছে বলে

মনে হলো।

'ব্যাটা কি মানুষ মারবে?' আঁতকে উঠল ড্রাইভার।

রাস্তায় অর্ধেকটা বেরিয়েছে রানার ট্যাক্সি। ইতিমধ্যে পিছনে দুটো প্রাইভেট কার চলে এসেছে, সামনে যাবার পথও বন্ধ। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে দরজা খুলেই ডাইভ দিল রানা। ডাইভটা এমনভাবে দিল, মাথাটা ফুটপাথেই পড়ার কথা, তবে তার আগেই কায়দা করে শরীরের নিচে কাঁধ নামাল, তারপর ডিগবাজি খেয়ে এক লাফে খাড়া হলো। তবে সংঘর্ষটা ঘটল ও যখন ডিগবাজির মাঝখানে রয়েছে।

ট্রাক ড্রাইভার ট্যাক্সি ড্রাইভারের আর্তনাদ গ্রাহ্য করেনি, ট্রাকটা সরাসরি তুলে দিল ট্যাক্সির ওপর।

প্রচণ্ড চাপে দুমড়ে গেল ট্যাক্সি, বিস্ফোরিত কাঁচ ছিটকে পড়ল রাস্তার ওপর। রাস্তা থেকে ট্যাক্সিকে ফুটপাথে তুলল মার্সিডিজ, ফুটপাথ থেকে দুর্ভাগা দু'জন পথিককেও তুলল, তারপর ছুঁড়ে দিল হোটেলের লাগোয়া ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের শো-কেসের গায়ে।

চিৎকার চেঁচামেচি আগেই শুরু হয়েছে, তার সঙ্গে ভাঙচুরের কর্কশ আওয়াজ যোগ হলো। ট্যাক্সির ফাটা রেডিয়েটর থেকে হিসহিস শব্দে বেরিয়ে আসছে বাষ্প।

হাতের তালু আর হাঁটুর চামড়া উঠে গেছে সামান্য, তাছাড়া আর কোথাও লাগেনি রানার।

ট্যাক্সির ড্রাইভার ওর ভাগ্য নিয়ে জন্মায়নি। তার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, দেখে মনে হলো টিনের ফাটা ক্যান থেকে কাঁচা মাংস বেরিয়ে আসছে।

ট্রাক ড্রাইভার লাফ দিয়ে ক্যাব থেকে নেমে ছুটল। তার মাথায় নির্মাণ শ্রমিকের ক্যাপ, শার্টের ওপর চকলেট রঙের জ্যাকেট।

চারদিকে লোকজন, গুলি করতে না পেরে লোকটাকে ধাওয়া করল রানা।

লোকটার অবশ্য সে ধরনের কোন উদ্বেগ বা বিবেচনাবোধ নেই, রাস্তা পার হয়েই কোমরের কাছ থেকে একটা পিস্তল বের করে রানার দিকে তাক করল সে।

ছুটন্ত একটা বাদামী পাজেরোকে এড়াবার জন্যে লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল রানা। এক পলকের জন্যে দেখতে পেল পাজেরোয় ষণ্ডামার্কা চারজন লোক।

প্রায় কাত হয়ে রানাকে এড়াল পাজেরো জীপ, রাস্তার মাঝখানে প্রচণ্ড চাকা ঘষে ইউ টার্ন নিল, ফুলস্পীডে ছুটল উল্টোদিকে।

ট্রাক ড্রাইভার গুলি করার কথা ভুলে খিঁচে দৌড় দিল। তার সামনে বাঁকটা বেশি দূরে নয়। মনে হলো বাঁক ঘুরে সে পালাতে পারবে।

বাদামী পাজেরো রাস্তা ছেড়ে উঠে পড়ল ফুটপাথে, ভাবটা যেন লোকটাকে চাপা দিতে কোন বাধাই মানবে না। কারের ডানদিকের ফ্রন্ট ফেন্ডার ড্রাইভারকে আঘাত করল, ইঁটের একটা পাঁচিলে প্রায় গেঁথেই ফেলল বলা যায়।

পাজেরোর গতিতে এক কি দুই সেকেন্ডের জন্যে ছেদ পড়ল মাত্র, ওটার হেভি-ডিউটি সাসপেনসন সংঘর্ষের ধকল সামলে নিয়েছে। রাস্তায় ফিরে এসে

স্পীড আরও বেড়ে গেল। ড্রাইভার থেমে থেমে বার কয়েক হর্ন বাজাল, যেন নিজের বিজয় ঘোষণা করছে। চোখের পলকে বাঁকের কাছে পৌঁছে গেল ওটা। বাঁক ঘুরছে, এই সময় ড্রাইভার জানালা দিয়ে মুখ বের করে প্রথমে হাসল, তারপর হাত নাড়ল–কার উদ্দেশে বলা মুশকিল। তবে রানার মনে হলো লোকটার দৃষ্টি ওর ওপরই স্থির ছিল।

রাস্তার ওপারে, ট্রাক ড্রাইভারের দিকে তাকাল রানা। রক্তাক্ত ন্যাকড়া দিয়ে তৈরি একটা পুতুলের মত লাগছে তাকে। তবে মুখটা প্রায় অক্ষতই।

রানা তাকে চেনে না।

বিধ্বস্ত ট্যাক্সি থেকে সুটকেস উদ্ধার করতে যাওয়াটা এখন বোকামিই হবে। ট্র্যাফিক পুলিস এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে। সুটকেসে অবশ্য এমন কিছু নেই যা দেখে পুলিস ওর পরিচয় জানতে পারবে। তবে শাহিনের অস্ত্রটা আছে। থাক, ক্ষতি যা হবার ডিবি-র অযোগ্য অফিসারের হবে।

ফুটপাথ ধরে হাঁটছে রানা, ভাবটা যেন, কিছুই হয়নি। হোটেল ইন্টারকন থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূরে সরে যাওয়া উচিত।

রানা চলে যাওয়ার পর একটা বন্ধ দরজার আড়াল থেকে ফুটপাথে নেমে এল মাইয়ো মিন। 'রেজন্যাটা ভাগ্যবান!' বিড়বিড় করল সে। রানা পালিয়ে গেছে, তবে তার দৃষ্টিতে ওর তেমন কোন গুরুত্ব নেই। রানাকে সে জিন্দালাশ বলেই ভাবছে। তাদের দল আজ হোক বা কাল, ঠিকই ওকে খুন করবে।

গুরুত্বপূর্ণ হলো বাদামী পাজেরোর প্যাসেঞ্জারদের চিনতে পেরেছে মিন। ব্যাপারটা তার কাছে শুধুই একটা ঘটনা নয়। এটা একটা উৎকট ধাঁধা। 'ওরা চারজন 'হাতুড়ি'-র সদস্য। হাতুড়ি হলো পুরানো একটা গ্যাঙ। ওদের কথা লোকজন আজকাল প্রায় ভুলেই গেছে। এর রহস্যটা তাহলে কি? ওরা কেন নাক গলাচ্ছে? রানাকে বাঁচাবার পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। কি হতে পারে সেটা?'

কারণ যাই হোক, খবরটা মায়াতকা থুয়েকে জানাতে হবে। এই রহস্যের সমাধান একমাত্র তিনিই যদি করতে পারেন।

এগারো

বৃষ্টির শোফার ও বডিগার্ড একজন বার্মীজ, নাম লুইন থুইন। পেশীবহুল চওড়া কাঠামো, বুলেটপ্রুফ আর্মারড় লিমোজিনটাকে দক্ষ হাতে পাহাড়ী পথ ধরে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে, চুলের কাঁটার মত বিপজ্জনক বাঁকগুলোতেও স্পীড কমাচ্ছে না। বাংলাদেশী দূতাবাস প্রধান সৈয়দ তারিক মোস্তফার বাড়িতে যাচ্ছে ওরা।

ওদের নিচে ও পিছনে আলো ঝলমলে রাজধানী ইয়ানগন। আরও পিছনে

আন্দামান সাগর, বিশাল ও কালো একটা গহ্বরের মত লাগছে।
রানা ও বৃষ্টি পিছনের সীটে বসেছে।
'মেজর আউং ডিটেকটিভ অফিসার হলে কি হবে, পদের চেয়েও অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী সে,' রানার একটা প্রশ্নের উত্তরে বলল বৃষ্টি। 'সরকারের প্রভাবশালী কিছু কর্মকর্তা তাকে খুব পছন্দ করেন।'
'তাদের এতই প্রভাব যে আটটা খুন চাপা দিতে পারবে?'
'আট, আশি, আটশো—সংখ্যাটা বড় কথা নয়, মাসুদ ভাই। ওরা এমনকি রাতকেও দিন বলে চালিয়ে দিতে পারে। আমাকে যেটা অবাক করছে, ওয়্যারহাউস ও রুজের ফ্ল্যাটে যে খুনগুলো হলো, তার সঙ্গে আপনি জড়িত থাকলেও এই তথ্যটা ভুলেও উল্লেখ করা হচ্ছে না।'
'নিশ্চয়ই এর পিছনে কোন কারণ আছে।'
'কি জানি কি কারণ...'
'মেজর আউং হয়তো এর মধ্যে টাকার গন্ধ পাচ্ছে। কিংবা সে হয়তো চায় তার কাজ অন্য কেউ করে দিক—ক্রিমিনালদের গুলি করে মারুক।'
'উদ্দেশ্য যাই থাক, সেজন্যে আমি ভাগ্যের প্রতি কৃতজ্ঞ,' বলল বৃষ্টি। 'তা না হলে এই মুহূর্তে দেশ জুড়ে আপনার খোঁজে ব্যাপক তল্লাশী চলত।'
'ঘটছেও হয়তো ঠিক তাই,' বলল রানা। 'আউং হয়তো খুঁজছেই কাউকে, শিকারকে গর্ত থেকে বের করার কাজে ব্যবহার করছে আমাকে।'
'অসম্ভব নয়।'
'রুজকে সেফ হাউসে পাঠিয়ে স্বস্তি বোধ করছি আমি,' বলল রানা। 'আমাকে ব্ল্যাকমেইল করার জন্যে ওকে হয়তো ব্যবহার করত সে।' একটু থেমে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল রানা, 'ভাল কথা, বৃষ্টি, এজেন্সির অফিস আজ কার হাতে ছেড়ে এলে?'
'রাতে শহীদের ডিউটি ছিল, তবে মনিরকেও থাকতে বলে এসেছি।'
'গুড,' মন্তব্য করল রানা।
'ক্রাইসিসে পড়েছি, তা না হলে শহীদকে আমি ঢাকার অফিসে ফেরত পাঠাতাম।'
'পিছনে গাড়ি,' বলল থুইন।
আধমাইল পিছনে উঁচু-নিচু হচ্ছে একজোড়া হেডলাইট।
ল্যুগার ভরা হোলস্টার একটু ঢিল করে রাখল রানা। দুই পকেটের মিনি-গ্রেনেডের ওজনও স্বস্তিকর।
গাড়ির স্পীড একই রাখল থুইন। পিছনের গাড়িটাও মধ্যবর্তী দূরত্ব কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে না।
সামনে ও ওপরে, রাস্তা যেখানে সমতল হয়ে গেছে, ছবির মত লাগছে তারিক মোস্তফার আলোকিত ভিলা।
ঠিক পাহাড় নয়, মাটির এক বিশাল টিলার ওপর বাড়িটা। চারদিকে উঁচু পাথরের পাঁচিল, পাঁচিলের মাথায় কাঁটাতারের বেড়া। বেড়ার ভেতরে ও বাইরে

আলোর প্রখরতা চোখ ধাঁধিয়ে দিল। বাড়ির চারদিকে একশো ফুটের মধ্যে সমস্ত ঝোপ কেটে ফেলা হয়েছে।

গেটের ঠিক সামনে গাড়ি থামাল থুইন। গেট নয়, পাশের দরজা খুলে বেরিয়ে এল সাদা পোশাক পরা গার্ড।

গার্ডকে থুইন নিজের ও আরোহীদের পরিচয় জানাচ্ছে, পিছনে এসে থামতে গাড়িটাকে চিনতে পারল বৃষ্টি। 'নঈম জাহাঙ্গীর, মাসুদ ভাই।'

ল্যুগারের বাঁট থেকে সরিয়ে হাঁটুর ওপর হাত রাখল রানা।

পরিচয় যাচাই করার পর গেটের ভেতর দাঁড়ানো এক লোককে ইঙ্গিত করল গার্ড। গেট খুলে দিল লোকটা।

চাকা গড়াল, প্রকাণ্ড উঠানে ঢুকল গাড়ি। ওদের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল গেট, নঈম জাহাঙ্গীরের পরিচয় যাচাই করছে গার্ড।

ঘোড়ার খুর আকৃতির ড্রাইভওয়ে, দু'পাশে সবুজ বাগান। নিচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা লম্বাটে দালানের সামনে চওড়া গাড়ি-বারান্দায় থামল থুইন। গাড়ি থেকে নেমে বৃষ্টির দিকের দরজা খুলে দিল সে। রানা নিজেই নামল, উল্টোদিকের দরজা দিয়ে।

ইউনিফর্ম পরা একজন গার্ড পথ দেখিয়ে ওদেরকে বাড়ির ভেতর নিয়ে এল। তার কোমরে জড়ানো গানবেল্ট, হোলস্টারে ভরা সাইডআর্ম। 'এদিকে, প্লীজ।'

'এক মিনিট,' বলল রানা। 'জাহাঙ্গীর সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করি।'

লিমোজিনের পিছনে থামল দ্বিতীয় গাড়িটা, ভেতর থেকে নামলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের লিগাল অ্যাডভাইজার নঈম জাহাঙ্গীর। শুনলে হয়তো অপমান বোধ করবেন, তবে তাঁকে দেখে ফুটবলের কথাই মনে পড়ল রানার। নিজের শারীরিক গঠন ভদ্রলোক নষ্ট করে ফেলেছেন, নিশ্চয় অতিভোজনই দায়ী। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। 'গুড ইভিনিং, বৃষ্টি।'

'ইভিনিং। ভাল তো, জাহাঙ্গীর সাহেব?'

বৃষ্টির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে রানার দিকে তাকালেন লিগাল অ্যাডভাইজার। 'আপনিই তাহলে আমাদের সেই...' কি কারণে তিনিই বলতে পারবেন, নামটা উচ্চারণ করলেন না। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।' যদিও চোখমুখে খুশির কোন ছাপ দেখা গেল না।

'কেন?' হ্যান্ডশেকের সময় একটু কৌতুক করল রানা।

গলা খাদে নামিয়ে জাহাঙ্গীর বললেন, 'মিনহাজ চৌধুরীর যে-কোন শত্রু আমার বন্ধু।'

'কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম আপনারা দু'জন একই দলে।'

'দল তো আমাদের সবারই একটা, কিন্তু তারমানে এই নয় যে চৌধুরী তার পোষা গুণ্ডাদের নিয়ে আমার সীমানায় ঢুকে পেশী ফোলাবে আর আমাকে তা সহ্য করতে হবে। আমি ভাবতেও পারছি না কোন সাহসে, কি অধিকারে মায়ানমারে এল সে!'

'এসেছেন যখন, নিশ্চয়ই কারও অনুমতি নিয়েই এসেছেন। কাজটা হয়তো

খুব জরুরী…'

'কি কাজ, কার অনুমতি, সব আমি খোঁজ নিয়ে দেখব তবে সে যে ডিবির ফরেন ডেস্ক-এর দায়িত্বে আছে, এ-কথা সবাই জানে। বেশ ক'বছর হলো তাকে ওই ডেস্ক কামড়ে পড়ে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে গুরুতর কোন অভিযোগ না থাকলে এরকম হওয়ার কথা নয়। ছিল তো ফরেন ডিপার্টমেন্টে, কেন তাকে হোম-এ নিয়ে এসে ফেলা হয়েছে সেটাও একটা প্রশ্ন।'

'একটু সাবধানে, জাহাঙ্গীর সাহেব,' বলল বৃষ্টি। 'ভুলে যাবেন না, ওপরমহলে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি কম নয়।'

'আরে রাখুন, বৃষ্টি! ওর কি রকম এক আত্মীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা। তো কি হয়েছে? এ-সবে আমি অন্তত ভয় পাই না।' নঈম জাহাঙ্গীর আরেকবার দেখে নিলেন গার্ডরা তাঁর কথা শুনছে কিনা, তারপর গলার আওয়াজ কমিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাল কথা, কি নিয়ে এতকিছু ঘটছে?'

'চলুন না, ভেতরে ঢুকে জানা যাক,' বলল রানা।

'চমৎকার আইডিয়া,' সায় দিল বৃষ্টি।

এসকর্ট-এর পিছু নিয়ে ফ্রন্ট হলে ঢুকল ওরা, একটা খিলান হয়ে বেরিয়ে এল সরু ও লম্বা করিডরে। ওটার শেষ মাথায় একটা কাঠের দরজা, কাঠের গায়ে খোদাই করা নকশা, হাতলটা রুপোলি। গার্ড একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ঢুকতে দিল, তারপর ওদের পিছনে বন্ধ করে দিল কবাট। চওড়া অ্যান্টিরুমে রয়েছে ওরা। একটা ফ্লোর ল্যাম্পের দু'পাশে সবুজ লেদার মোড়া দুটো আর্মচেয়ারে বসে রয়েছে আখতার ও শাহিন। রানাকে দেখামাত্র লাফিয়ে চেয়ার ছাড়ল তারা।

লিগাল অ্যাডভাইজারকে রানা বলল, 'ডিবির এই-জোকারের কথাই বলছিলাম আপনাকে।'

তরুণ আখতারকে বিব্রত দেখাল। শাহিনের চেহারা রাগে লালচে হয়ে উঠল। রানার চোখে চোখ, কোমরে হাত রাখল সে, বৃষস্কন্ধ ফুলছে। 'আমার অস্ত্র কোথায়?'

'হারিয়ে গেছে,' বলল রানা।

'ইউ বাস্টার্ড! এর জন্যে তোমাকে ভুগতে হবে। ওটা আমার নিজের টাকায় কেনা…'

'চৌধুরীকে বললে আরেকটা কিনে দেবেন,' বলল রানা।

'তোমার এত বড় স্পর্ধা, আমার সঙ্গে কৌতুক করো!' শার্টের আস্তিন গুটাচ্ছে শাহিন।

'আহ্, কি শুরু করলে! মাথা ঠাণ্ডা করো!' শাহিনকে শান্ত করতে চাইল আখতার।

'শাট আপ!' আখতারকে চুপ করিয়ে রানাকে চ্যালেঞ্জ করে বসল শাহিন, 'তুমি, মাসুদ রানা, আমার একটা লোমও ছিঁড়তে পারবে না শক্তি থাকে তো ঠেকাও, আমি তোমাকে এখন পিটিয়ে তক্তা বানাব।'

অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় রানার গোটা কাঠামো ঝাপসা হয়ে গেল। ওর গতি এত

দ্রুত যে চোখ দিয়ে অনুসরণ করা গেল না। শাহিন তার চিবুক সামনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল, তার সামনে উড়ে এল রানা, ডান হাতের ঘুসিটা লাগল ওই চিবুকে। চোখের পলকে শূন্যে উঠে পড়ল শাহিন। খপ করে তার একটা হাত ধরে থামাল রানা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে শরীরটাকে বসিয়ে দিল চেয়ারে। ছেড়ে দিতে চেয়ারেই ঢলে পড়ল শাহিন, জ্ঞান হারিয়েছে।

'এরকম মার আগে কখনও দেখিনি। ঘুসিটার কি বিশেষ কোন নাম আছে?' সকৌতুকে কৌতূহল প্রকাশ করলেন নঈম জাহাঙ্গীর।

'যথেষ্ট হয়েছে, মাসুদ ভাই,' নরম সুরে বলল বৃষ্টি।

ভেতর দিকের একটা দরজা খুলে অ্যান্টিরুমে ঢুকলেন দু'জন ভদ্রলোক।

প্রথম ব্যক্তির চালচলনে আভিজাত্য। চোখেমুখে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। তাঁর শুধু কানের দু'পাশে পাক ধরেছে চুলে। তবে ভুরু জোড়া সাদা। গোঁফ পেন্সিলের মত সরু, কাঁচা-পাকা। ইনিই সৈয়দ তারিক মোস্তফা, মায়ানমারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। মীটিঙে ওরা তাঁরই মেহমান হয়ে এসেছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি মিনহাজ চৌধুরী। তাঁর কাঁধ দুটো বিশাল, পেট ঢোলের মত ফোলা, কোমরের নিচের অংশটা অসম্ভব চওড়া। ধবধবে ফর্সা তিনি, তবে দৃশ্যটা দেখেই লালচে হয়ে উঠল চেহারা। 'কি ঘটছে এখানে?' জানতে চাইলেন তিনি, চোয়ালের নিচে ঝুলে পড়া চামড়া ঢাকা চর্বি একটু কাঁপল।

পিন মারার সুযোগটা নঈম জাহাঙ্গীর হাতছাড়া করলেন না। 'তোমার লোক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়ে লজ্জায় শুয়ে পড়েছে, চৌধুরী।' সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত তিনি।

রাষ্ট্রদূত হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

দু'পা এগিয়ে শাহিনের সামনে দাঁড়ালেন মিনহাজ চৌধুরী। 'ও তো দেখছি জ্ঞান হারিয়েছে! কে মারল ওকে? কেন মারল?'

'মারলে তো মরেই যেত,' বলল রানা। 'মারিনি–মারার ভঙ্গি করেছি শুধু।'

'দেখুন, সবাইকেই বলছি,' দৃঢ় কণ্ঠ, তিরস্কারের সুরে কথা বলছেন রাষ্ট্রদূত। 'আমার বাড়িতে আমি ভায়োলেন্স সহ্য করব না। এখানে অত্যন্ত সিরিয়াস একটা মীটিং হবার কথা, অথচ আপনারা স্কুল ছাত্রদের মত ঝগড়া করছেন।'

'শাহিন, এই শাহিন! ধ্যাত, চোখ মেলো তো!' শাহিনের মুখে বারকয়েক হালকা চড় মারলেন মিনহাজ চৌধুরী।

একটু গোঙাল শাহিন, তবে চোখ মেলেনি।

টেবিলে এক গ্লাস পানি দেখে হাতে নিলেন চৌধুরী, শাহিনের মুখে ঢেলে দিলেন খানিকটা।

চোখ মেলল শাহিন, তবে চোখে দৃষ্টি নেই, ব্রেনও কাজ করছে না। 'কে…কি…কোথায়…'

'কি ব্যাপার? শুয়ে কেন?' চৌধুরীর গলায় ধমক। জবাব না পেয়ে রেগে গেলেন আরও। 'যদি কথাই বলতে না পারো, তাহলে দূর হও আমার সামনে থেকে! আখতার, নিয়ে যাও ওকে, তাজা বাতাসে বসিয়ে রাখো কিছুক্ষণ।'

'ইয়েস, স্যার।' চেয়ার থেকে তুলে শাহিনকে দাঁড় করাল আখতার। টলমল

করছে শাহিনের পা, আখতারের কাঁধে ভর দিয়ে অ্যান্টিরুম থেকে বেরিয়ে গেল সে।

'আমি জানতে চাই, কিভাবে আপনি এই অবস্থা করলেন ওর,' দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে জানতে চাইলেন চৌধুরী। 'শাহিন আমার সেরা অফিসারদের একজন!'

'এই সেরা দিয়ে কাজ হবে না,' বলল রানা। 'আরও ভাল কেউ থাকলে আনিয়ে নিন।'

'তুমি বরং এক কাজ করো, চৌধুরী,' পরামর্শ দিলেন জাহাঙ্গীর। 'ওদেরকে ঢাকায় ফেরত পাঠাও। আর সঙ্গে তুমিও চলে যাও।'

'তোমার ব্যঙ্গ আমি সহ্য করব না, জাহাঙ্গীর!' চৌধুরী চোখ গরম করলেন।

'বেলাইনে চললে শুধু ব্যঙ্গ নয়, সর্প-ব্যঙ্গ সবকিছুই তোমাকে সহ্য করতে হবে, চৌধুরী। ভাল কথা, তুমি ইয়ানগনে কেন মরতে এলে?'

'জেন্টেলমেন, প্লীজ!' রাষ্ট্রদূত ভব্যতা ও যৌক্তিকতার পথে থাকার আবেদন জানালেন। 'আমরা সবাই গলা নামিয়ে কথা বললেও তো পারি।'

'খুব ভাল সাজেশন, মি. মোস্তফা, স্যার,' বলল বৃষ্টি। 'পরিবেশ শান্ত হলে প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে সুবিধে হবে আমাদের।'

'আপনারা সবাই আমার স্টাডিতে আসুন, প্লীজ,' বলে ঘুরে দাঁড়ালেন রাষ্ট্রদূত।

অ্যান্টিরুম থেকে এক লাইনে বেরিয়ে এল সবাই। মিনহাজ চৌধুরীকে আগে থাকতে দিল রানা। ভদ্রলোককে নিজের পিছনে থাকতে দিলে অস্বস্তি বোধ করবে ও।

স্টাডিতে শুধু বই আর বই। বুককেসগুলো মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত লম্বা। দেখার বিষয় হলো, বুককেসের প্রতিটি বই দামী লেদারে মোড়া।

একটা সাইডবোর্ডে বোতল, গ্লাস, মিক্সার আর বরফ দেখা গেল।

'কোল্ড ড্রিঙ্ক এখন খুব কাজ দেবে বলে মনে হয়,' পরিবেশটা হালকা করার জন্যে হেসে বললেন রাষ্ট্রদূত।

রানা ও বৃষ্টি কোল্ড ড্রিঙ্কই নিল। বাকি তিনজন হুইস্কির বোতল থেকে নিজেদের গ্লাস ভরলেন

বড় একটা ডেস্কের পিছনে বসলেন রাষ্ট্রদূত। ডেস্কের সামনে অর্ধবৃত্তাকারে কয়েকটা চেয়ার ফেলা আছে, বৃষ্টি বসার পর বাকি তিনজনও বসল।

মিনহাজ চৌধুরীই কথা পাড়লেন, 'যথেষ্ট হয়েছে, ভদ্রতার মুখোশ এবার খোলা যেতে পারে।'

'পারে,' বললেন নঈম জাহাঙ্গীর। 'তুমি ইয়ানগনে কি করছ, চৌধুরী?'

'করছি তোমার কাজ। সন্দেহ নেই তুমি সব জমিয়ে রেখেছ।'

'এটা কি আমি পাগলের প্রলাপ বলে ধরে নেব?'

'না বোঝার ভান করে কোন লাভ নেই,' বললেন চৌধুরী।

খুক করে কেশে রাষ্ট্রদূত মোস্তফা সাহেব গলা পরিষ্কার করলেন। 'এমন ভাব

দেখানো উচিত নয় যাতে মনে হয় আমরা একেকজন একেকটা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছি। আসলে তো আমাদের সবার একটাই লক্ষ্য।'

'কি সেটা?' জানতে চাইল বৃষ্টি।

'ড. মুহিত হায়দারকে কে খুন করেছিল, এটা জানা,' বললেন চৌধুরী।

'কেন ভাবছেন তিনি খুন হয়েছিলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'প্লেনটা অ্যাক্সিডেন্টও করে থাকতে পারে।'

'আপনি তা বিশ্বাস করেন না। অন্তত আমি করি না। দশ বছর আগে আমার দৃঢ় সন্দেহ ছিল, ড. হায়দার একটা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। সেই সন্দেহ এখন আরও বেড়েছে আমার।'

চৌধুরীর দিকে খানিকটা ঝুঁকল বৃষ্টি। 'সে সময় আপনি লিগাল অ্যাডভাইজার হিসেবে মায়ানমারে ছিলেন, ড. হায়দারকে আইনগত অনেক পরামর্শও দিয়েছেন। কে বা কারা তাঁকে খুন করল, এ-সম্পর্কে আপনার তো কিছু না কিছু জানার কথা।'

'জানব না কেন, অবশ্যই জানতাম,' তিক্তকণ্ঠে বললেন চৌধুরী। 'একজনকে নয়, বেশ কয়েকজনকেই সন্দেহ হয়েছিল আমার। কিন্তু ক্লু ধরে তদন্ত চালানো সম্ভব হয়নি। ড. হায়দার নিখোঁজ হবার সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহভাজন চরিত্রগুলোও যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল। তারপর বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হলো ফালাম বাঁধ। বাঁধ ভাঙা পানির প্রবল তোড়ে আর কি ভেসে গেল জানি না, তবে রটিয়ে দেয়া হলো যে ড. হায়দারের আবিষ্কৃত বিপুল আর্টিফ্যাক্ট নষ্ট হয়ে সাগরে ভেসে গেছে।'

'ব্যাপারটা তাহলে স্রেফ একটা ধারণা নয়? প্রাচীন মং ও বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন ড. হায়দার সত্যি আবিষ্কার করেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল বৃষ্টি।

'আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া অত্যন্ত কঠিন,' ম্লান মুখে বললেন চৌধুরী। 'দূতাবাসের তরফ থেকে আমাকেই দায়িত্ব দেয়া হয় ড. হায়দারকে সাহায্য করার। ঘন ঘন দেখা তো হতই, আমি এমনকি তাঁর ক্যাম্পে রাতও কাটিয়েছি। কিন্তু মন খুলে সব কথা কখনোই তিনি আমাকে বলেননি। আবিষ্কার গোপন রাখার অদ্ভুত এক বাতিক থাকে আর্কিওলজিস্টদের, ড. হায়দারও ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি শুধু সম্ভাবনার কথাই বলতেন। বলতেন, তাঁর ধারণা সত্যি হলে ফালাম থেকে দুই বিলিয়ন ডলার মূল্যের আর্টিফ্যাক্ট পাবে মায়ানমার সরকার।'

গ্লাসের বাকি হুইস্কি এক ঢোকে খেয়ে ফেললেন চৌধুরী। 'কাছ থেকে দেখে তাঁকে আমার এত ভাল লেগে গেল, পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলাম আমরা। তিনি নিখোঁজ হবার পর দশ বছর পার হতে চলল, সবাই তাঁর কথা ভুলে গেছে, কিন্তু আমি ভুলিনি। ভুলিনি, ভুলবও না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যত সময়ই লাগুক, তাঁর নিখোঁজ রহস্য ঠিকই একদিন আমি খুঁজে বের করব। দশ বছর পর আজ সেই সুযোগ এসেছে।'

চোখ দুটো লাল ও ভেজা ভেজা, একে একে বৃষ্টি, নঈম জাহাঙ্গীর ও রানার দিকে তাকালেন চৌধুরী। 'রহস্যটা দশ বছরের পুরনো হলেও, কোথাও নিশ্চয়ই একটা সূত্র আছে। ওই সূত্র ধরে এগোতে পারলে আমি জানতে পারব কে ড.

হায়দারকে খুন করেছিল। টাকা বা সময় যতই লাগুক, আমি তৈরি। এমনভাবেই তৈরি, কেউ আমাকে বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।'

'প্রপার চ্যানেল বলে একটা কথা আছে,' বললেন লিগাল অ্যাডভাইজার জাহাঙ্গীর। 'অন্য কোনও দেশের সীমানার ভেতর কাজ করতে হলে প্রপার চ্যানেল ধরে আসতে হয়। তুমি বোধহয় এ-সবের তোয়াক্কা করো না?'

'আমি ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত চালাবার বিশেষ অনুমতি নিয়েই এখানে এসেছি।'

'অনুমতি নিয়ে এসেছ? কার? কে তোমাকে অনুমতি দিল? তোমার আত্মীয় ভদ্রলোক, ওই যে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা?'

গর্বের হাসিটা চোখেমুখে ফুটতে দিয়েও দিলেন না চৌধুরী। 'হ্যাঁ, তাঁর অনুমতি আমি পেয়েছি।'

'কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, লিগাল অ্যাডভাইজারের দায়িত্ব আমিই পালন করছি এখানে।'

'কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর অফিসের মাধ্যমে তাঁর একজন উপদেষ্টা বিদেশে তদন্ত চালাবার দায়িত্ব ডিবিকে দিতে পারেন।'

'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই?' নঈম জাহাঙ্গীরের গলায় চ্যালেঞ্জের সুর।

মিনহাজ চৌধুরী হাসলেন। 'প্রভাবশালী আত্মীয়র এইটুকু প্রভাব কাজে লাগাব না? না-না, আমাকে ভুল বুঝো না, জাহাঙ্গীর। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখানে আমার আসাটা অবশ্যই অনুমোদন করবে। তবে যেহেতু চাওয়া হয়েছে দেরিতে, অনুমোদন পেতে একটু দেরি হবে, এই যা। তুমি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো, এরই মধ্যে হয়তো অনুমোদন দিয়ে দিয়েছে ওরা। তোমাকে আরও একটা তথ্য দিই, জাহাঙ্গীর। মায়ানমারের প্রধান সামরিক প্রশাসকের অফিস থেকে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে একটা অনুরোধ জানানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ড. হায়দারের কেসটা নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করায় মায়ানমার সরকার ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই তদন্তের কাজে, তাঁদের ধারণা, বাংলাদেশ ডি[illegible] অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার মিনহাজ চৌধুরী সাহায্য করতে পারবেন। সংক্ষেপে, আমাকে তাঁরা মায়ানমারে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।'

'কে চার্জে আছে তা নিয়ে ঝগড়া-ফ্যাসাদে না গিয়ে আপনারা একসঙ্গে কাজ করলেই তো পারেন,' বলল বৃষ্টি।

সাবেক ও বর্তমান দুই লিগাল অ্যাডভাইজার এমনভাবে তাকালেন, বৃষ্টির যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অবশেষে চৌধুরী বললেন, 'এরমধ্যে আপনার কি স্বার্থ? ব্যাপারটায় আমি তো রানা এজেন্সির কোন ভূমিকা দেখছি না।'

রানা হাতঘড়ি দেখল। ন'টা দশ। ঘড়ি থেকে চোখ তুলে মৃদু হাসল ও।

'হাসির কি ঘটল?' ভুরু কোঁচকালেন চৌধুরী।

'দু'এক মিনিটের মধ্যেই জানতে পারবেন,' বলল রানা। 'মেসেজটা ঢাকা থেকে ইয়ানগনে পাঠানো হয়েছে মায়ানমার স্ট্যান্ডার্ড টাইম ন'টায়।'

'কিসের মেসেজ?'

'দূতাবাসের ক্রিপটোগ্রাফিক কমপিউটার মেসেজটা সঙ্গে সঙ্গে ডিকোড করবে। জনাব রাষ্ট্রদূতকে তাঁর স্টাফ মেসেজটা পৌঁছে দিতে সময় নেবে খুব বেশি হলে পনেরো মিনিট।'

'কিসের মেসেজ?' তারিক মোস্তফা বিস্মিত।

'ওঁর কথায় কান দেবেন না,' চৌধুরী বললেন। 'উনি মনে হয় হেঁয়ালি করছেন।'

মৃদু, প্রায় অস্পষ্ট, নক হলো দরজায়।

'ওই বোধহয় এসে গেছে,' বলল রানা।

রাষ্ট্রদূত কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে বললেন, 'কাম ইন।'

একজন গার্ড ঢুকল স্টাডিতে। 'দূতাবাস থেকে আপনার কল, স্যার। স্ক্র্যাম্বলার লাইনে।'

'ঠিক আছে।'

স্যালুট করল গার্ড, ঘুরল, কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে।

'এক্সকিউজ মি; প্লীজ।' রাষ্ট্রদূত, প্রায় হতভম্ব, ডেস্কের পিছনের একটা দরজা খুলে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

'আপনার খেলাটা কি?' চৌধুরী যেন জেরা করছেন রানাকে।

'মোস্তফা সাহেবের মুখ থেকেই শুনুন,' বলল রানা। 'উনি বললে বিশ্বাস করাটা সহজ হবে।'

কামরার ভেতর হঠাৎ সবাই যেন অপ্রতিভ ও অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। যে-যার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। শুধু রানাকে স্বাভাবিক মনে হলো।

কয়েক মিনিট পর রাষ্ট্রদূত ফিরে এলেন। তাঁকে রীতিমত বিস্মিত দেখাচ্ছে।

'হ্যাঁ, বলুন? কি ব্যাপার?' আটকে রাখা দম ছেড়ে জানতে চাইলেন চৌধুরী।

'প্লীজ, আমার কানের কাছে এভাবে চিৎকার করবেন না, চৌধুরী সাহেব। বিশেষ করে খবরটা যখন আপনি আগেই শুনেছেন।'

'কি খবর?'

রাষ্ট্রদূত তাঁর চেয়ারে বসলেন। 'ওই লোক দূতাবাসের কোড ক্লার্ক। আজ ঠিক ন'টার সময় ঢাকা থেকে ওরা একটা টপ-প্রায়োরিটি কমিউনিকেই রিসিভ করেছে।'

'কে পাঠিয়েছে?'

'প্রধানমন্ত্রীর অফিস। মেসেজে বলা হয়েছে, ড. হায়দারের কেস তদন্ত করার ব্যাপারে রানা এজেন্সির অথরিটি অন্যান্য সকল সংস্থার অথরিটিকে সুপারসিড করবে।'

চৌধুরী বিস্ফোরিত হলেন। 'এ আপনি কি বলছেন!'

'আমাদেরকে অনুরোধ করা হয়েছে—আসলে হুকুম করা হয়েছে, যদিও ভাষার কেতাকায়দার আড়ালে মনে হবে অনুরোধ—আমরা যেন রানা এজেন্সিকে সাধ্যের

মধ্যে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য-সহযোগিতা করি। রানা এজেন্সি বলতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, এখানে বোঝাবে ফারহানা আহমেদ বৃষ্টি ও মাসুদ রানা।'

'এ আমি বিশ্বাস করি না!' নঈম জাহাঙ্গীর এমনকি হাসতেও ভুলে গেছেন।

দীর্ঘ নাকটা একটু উঁচু করে সেটা তাক করলেন রাষ্ট্রদূত লিগাল অ্যাডভাইজারের দিকে। চোখে ভর্ৎসনা। 'আমার মুখের কথা সন্দেহজনক, এরকম মন্তব্য শুনতে আমি অভ্যস্ত নই, জাহাঙ্গীর সাহেব।'

নঈম জাহাঙ্গীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'আমি আপনাকে মিথ্যেবাদী বলছি না, স্যার। আমি শুধু আমার বিস্ময় প্রকাশ করছিলাম।'

'এ যেন অসম্ভবকে সম্ভব করা হয়েছে,' আক্রোশ চেপে রেখে স্বীকার করলেন চৌধুরী। 'ক্ষমতা নিয়ে এই খেলার প্যাঁচ আপনি কোত্থেকে শিখলেন, মাসুদ রানা?'

'আমার শেখার প্রয়োজন হয়নি,' বলল রানা। 'খেলাটা আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা খেলেছেন। ক্ষমতা নিয়ে সত্যিকার খেলা যখন শুরু হয়, তিনিই সবার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরান।' একটু থেমে রানা আবার বলল, 'জনাব রাষ্ট্রদূত একটা বিষয় উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। উনি বলেননি, মেসেজের নিচে সইটা কার ছিল।'

'ও, হ্যাঁ, তাই তো,' বলে মুচকি হাসলেন রাষ্ট্রদূত, তারপর চৌধুরী ও জাহাঙ্গীর সাহেবের দিকে ফিরে বললেন, 'সইটা খোদ গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর।'

রাষ্ট্রদূত তারিক মোস্তফা মায়ানমারের একটা রিলিফ ম্যাপের ভাঁজ খুললেন তাঁর ডেস্কে। মায়ানমার-ভারত ও মায়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি তারকা চিহ্নিত একটা বিন্দুতে আঙুল তাক করে বললেন, 'এই হলো ফালাম।'

ফালাম এখনও একটা শহর, তবে এই শহর অতীতের গৌরব ও গুরুত্ব অনেক কাল আগেই হারিয়ে ফেলেছে। ঐতিহাসিকদের ভাষ্য অনুসারে, কয়েক হাজার বছরের ব্যবধানে ফালামে অন্তত দুটো সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল। একটা নিকট অতীতের ঘটনা: মাত্র দেড় হাজার বছর আগে ভারত ও তিব্বতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ফালামে বিশালাকার কয়েক ডজন মন্দির নির্মাণ করেন, সেই মন্দিরগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সমৃদ্ধ জনপদ। দ্বিতীয় ঘটনাটি পাঁচ থেকে ছয় হাজার বছরের প্রাচীন: মং নামে স্থানীয় এক যুদ্ধপ্রিয় জাতি ফালামে বসতি স্থাপন করে, তাদের রাজা এক সময় গোটা মায়ানমার ছাড়াও থাইল্যান্ড ও চীনের অংশ বিশেষ দখল করে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। প্রাচীন বৌদ্ধ ও মং সভ্যতার পতন কোন যুদ্ধ বা মহামারীর কারণে ঘটেনি, দু'বারই আঘাত হেনেছিল প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প।

ইয়ানগন থেকে ফালামের দূরত্ব উত্তরে সাড়ে চারশো মাইল।

ফালাম থেকে পঞ্চাশ মাইল পুবে একটা জায়গার নাম কোকো গুম, সেদিকে একটা আঙুল তাক করলেন তারিক মোস্তফা। 'ড. মুহিত হায়দার ফালাম ও

শওয়েবুর মাঝামাঝি পাহাড় ও জঙ্গলের ভেতর কোকো গুন-এ প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন—মানে, তাঁর দাবি আদৌ যদি সত্যি বলে ধরে নেয়া হয় আর কি। তবে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করার আগে মায়ানমার সরকারের ফালাম প্রজেক্ট সম্পর্কে সবারই একটা ধারণা থাকলে ভাল হয়।

'ফালাম ও শওয়েবু, এই দুই শহরকে রেলপথ বসিয়ে এক করার প্রজেক্ট ছিল ওটা। বলা হচ্ছিল, বিশাল বনভূমিতে রেলপথটা লাইফ লাইন হিসেবে অবদান রাখবে। স্থানীয় মানুষেরও বহুকালের স্বপ্ন ছিল এই রেলপথ। মায়ানমার সরকার দেশীয় পুঁজি ও লোকবল নিয়ে এই কাজে হাত দেয়, তবে বন্ধু রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিশজন এঞ্জিনিয়ার এই কাজে তাদেরকে সাহায্য করছিল।

'প্রজেক্টের কাজ শুরু হয় একই সঙ্গে দুই শহর থেকে। দুটো রেলপথ মাঝামাঝি জায়গায়, অর্থাৎ ইরাবতীর দুই তীরে এসে থামার কথা। নদীর ওপর একটা ব্রিজ ও বাঁধ তৈরি হবে, ব্রিজের ওপর থাকবে রেললাইন।'

'এখানেই প্রজেক্টটা বাধা পেল,' বললেন চৌধুরী।

'বাঁধ তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এই সময় গুজব রটে গেল যে ড. মুহিত হায়দার বিপুল পরিমাণ প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট আবিষ্কার করেছেন। বাতাসে ছড়ানো এই গুজব শুনে পিঁপড়ের মত ছুটে এল রোহিঙ্গা গেরিলারা। কি ব্যাপার? না, আবিস্কৃত আর্টিফ্যাক্টের ভাগ চায় তারা; ওগুলো বিক্রি করে আর্মস-অ্যামিউনিশন কিনবে। বলাই বাহুল্য যে ওদেরকে লেলিয়ে দিয়েছিল আইএসআই এজেন্টরা। ওই পাকিস্তানী এজেন্টরাই ট্রেনিং দিচ্ছিল রোহিঙ্গাদের।

'দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, বাঁধ ও আর্টিফ্যাক্ট নিয়ে শুরু হয়ে গেল ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্র। আইএসআই এজেন্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাঁধের কাজ বন্ধ করে দিল পাকিস্তানী এঞ্জিনিয়াররা। স্থানীয় প্রশাসনও গুপ্তধনের ভাগ পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। কি ঘটতে যাচ্ছে আঁচ করতে পেরে সরকার প্রথমে পুলিস, তারপর সামরিক কর্মকর্তাদের পাঠাল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে। কিন্তু কথায় আছে না, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ! এখানেও ঠিক তাই ঘটল।

'এরপর আমরা, অর্থাৎ সে সময়কার বাংলাদেশ দূতাবাসের স্টাফও ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। আমি তখন ছিলাম জুনিয়র সার্ভিস অফিসার, আমার ওপর দায়িত্ব ছিল যা কিছু ঘটছে তার রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুসন্ধান করা। আর লিগাল অ্যাডভাইজার হিসেবে চৌধুরীর দায়িত্ব ছিল ড. মুহিত হায়দারকে প্রোটেকশন দেয়া।'

'রাজনৈতিক তাৎপর্য খুঁজতে গিয়ে মোস্তফা সাহেব জানতে পারলেন রোহিঙ্গা গেরিলা এবং তাদের উপদেষ্টা ও ট্রেনার আইএসআই এজেন্টরা প্রথম থেকেই চাইছিল যেন বাঁধটা তৈরি না হয়,' বললেন চৌধুরী। 'এর কারণ পরিষ্কার। বাঁধ, ব্রিজ ও রেলপথ হলে ফালামে সরকারী সৈন্য খুব সহজেই আসতে পারবে, আর তা আসতে পারলে বাংলাদেশ মায়ানমার সীমান্তে রোহিঙ্গা গেরিলাদের তৎপরতায় বিঘ্ন সৃষ্টি হবে, সেই সঙ্গে গভীর জঙ্গলের ভেতর তাদের গোপন ক্যাম্পও গুরুতর হুমকির মুখে পড়বে। মোস্তফা সাহেব জানতে পারলেন, পাকিস্তানী এঞ্জিনিয়াররা

সাহায্য করার নামে বাঁধ তৈরিতে আসলে বাধাই দিচ্ছে। নির্মাণ কৌশলে ক্রটি দেখা দেয়ার পিছনে তাদেরই নোংরা হাত ছিল। শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত মজুরি ও সুযোগ-সুবিধার দাবি তুলে শ্রমিকদের আন্দোলন করতেও উৎসাহ দেয় তারা, যার ফলে বাঁধের কাজ শেষ করে আনতে অস্বাভাবিক বেশি সময় লেগে যায়। তারপর কি ঘটল? এলাকায় উদয় হলো রোহিঙ্গা গেরিলা আর তাদের ট্রেনার পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স আইএসআই-এর এজেন্টরা। এঞ্জিনিয়ারদের মধ্যেও দু-চারজন আইএসআই এজেন্ট ছিল, অর্থাৎ তাদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটল। তারা প্ল্যান করল বিস্ফোরকের সাহায্যে বাঁধটা উড়িয়ে দেবে।

'এদিকে ড. হায়দারকে নিয়ে আমি পড়লাম আরেক সঙ্কটে। প্রথমে তিনি বিপুল পরিমাণ আর্টিফ্যাক্ট পাবার কথা পঞ্চমুখে প্রচার করেছিলেন, কিন্তু তারপর হঠাৎ করেই মুখে কুলুপ আঁটলেন। আসলে কাউকেই তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তবে শেষ দিকে আমার সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার কোন সুযোগও তিনি পাননি। স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা সারাক্ষণ তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। প্রায় বন্দীই ছিলেন বলতে হবে। এক পর্যায়ে তাঁকে এমনকি সাইট থেকেও সরিয়ে আনা হয়। মাটি খুঁড়ে কি পাওয়া গেছে, আদৌ কিছু পাওয়া গেছে কিনা, কিছুই আমরা জানতে পারিনি। শুধু শুনেছি, সাইটকে ঘিরে দুটো দুর্ভেদ্য পাঁচিল তৈরি হয়েছিল–একটা তৈরি করে স্থানীয় প্রশাসন, অন্যটা রোহিঙ্গা গেরিলারা।'

'আর এইরকম জটিল একটা পরিস্থিতির মধ্যে খুন হয়ে গেলেন ড. হায়দার।'

'হ্যাঁ। ড. হায়দারকে তারা খুন করল, তার দু'দিন পর বাঁধটাও দিল উড়িয়ে। যে বিপুল পরিমাণ ডিনামাইট ব্যবহার করা হয়েছিল, একটা পাহাড়কে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার জন্যে তা যথেষ্ট। এতদিনের পরিশ্রম, এত খরচ, সব বৃথা হয়ে গেল।

'স্থানীয় প্রশাসন সমস্ত দোষ চাপাল গেরিলাদের ওপর। সরকার আগে থেকেই জানত যে রোহিঙ্গারা চায় না বাঁধ তৈরি হোক, কাজেই এই ব্যাখ্যা ইয়ানগন এক রকম মেনেই নিল। আর প্রাচীন মং ও বৌদ্ধ সভ্যতা সম্পর্কে বলা হলো, ড. হায়দার মিথ্যা আশা দিয়েছিলেন, আসলে নাকি মাটি খুঁড়ে কিছুই পাওয়া যায়নি। তবে অন্যরকম একটা গুজবও ছড়িয়ে দেয়া হয়। তা হলো: ড. হায়দার যে বিপুল আর্টিফ্যাক্ট আবিষ্কার করেন তার সবই বাঁধ ভাঙা পানির তোড়ে ভেসে গেছে।'

এতক্ষণ ওঁদের কথা মন দিয়ে শুনেছে রানা, মিনহাজ চৌধুরী থামতে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ধারণা ড. হায়দারকে খুন করা হয়েছে, এ ধারণা কেন হলো একটু খুলে বলুন, প্লীজ।'

'ড. হায়দারের সহকারী ছিল রায়হান সিদ্দিকী,' বললেন চৌধুরী। 'ওই রায়হানই আমাকে বলেছিল, যে চার্টার করা প্লেনে ড. হায়দার নিখোঁজ হন তাতে তারও থাকার কথা ছিল। কিন্তু বাধা দেয়ার কারণে প্লেনে সে উঠতে পারেনি...'

'কে তাকে বাধা দিল?'

'সে প্রসঙ্গে যাবার আগে এয়ারস্ট্রিপ আর চার্টার করা প্লেনটা সম্পর্কে দু'একটা কথা বলা দরকার। প্রচুর আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া যাবে, সে-সব ইয়ানগনে নিয়ে যেতে হলে কার্গো প্লেন দরকার, ড. হায়দারের এই কথা শোনার পর সামরিক বাহিনী তাদের এয়ারস্ট্রিপটা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিল। অনুমতি পাবার পর চার্টার কোম্পানির প্লেন নিয়ে ইয়ানগন থেকে ফালাম ও ফালাম থেকে ইয়ানগনে কয়েকবার আসা-যাওয়াও করেছিলেন ড. হায়দার। কোম্পানিটার সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে, মোবাইল ফোনে অনুরোধ করলেই ইয়ানগন থেকে প্লেন পাঠিয়ে দিত তারা। সেদিন দুপুরবেলা সহকারী রায়হান সিদ্দিকীকে প্লেন চার্টার করার নির্দেশ দেন ড. হায়দার। প্লেন এসে পৌঁছায় সন্ধের দিকে। সে সময় সিদ্দিকী এয়ারস্ট্রিপের কাছেই এক শুঁড়ি হিন্দুর দোকানে বসে মদ খাচ্ছিল...'

বাধা দিল রানা। 'ড. হায়দারের ছাত্র ছিল সিদ্দিকী—একটু পরই শিক্ষকের সঙ্গে প্লেনে চড়তে হবে তাকে, তাসত্ত্বেও সে মদ খাচ্ছিল?'

'প্রশ্নটা আমিও তাকে করেছিলাম,' বললেন চৌধুরী। 'সিদ্দিকীর বক্তব্য ছিল, ড. হায়দার বাকি সবার মত তাকেও অবিশ্বাস করতেন, এমনকি প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কারের সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠার পর থেকে তাকে তিনি সাইটেও নিয়ে যেতেন না। সেই দুঃখ ও অপমান ভোলার জন্যেই নাকি মদ খাওয়া ধরে সে। তো সে যাই হোক, শুঁড়িখানায় বসে প্লেনটাকে আসতে দেখল সিদ্দিকী, কিন্তু প্লেনে ওঠার জন্যে ওখান থেকে সে বেরুতে পারেনি। কেউ একজন তার মাথার পিছনে আঘাত করে, ফলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে। জ্ঞান ফেরার পর দেখতে পায় ড. হায়দারকে নিয়ে চলে গেছে প্লেনটা।'

'কিন্তু কে তাকে প্লেনে উঠতে দিল না, কারা ড. হায়দারকে খুন করল, পরে খোঁজ নেয়নি সে?'

'হ্যাঁ, নিয়েছিল বৈকি। আমি তো তাকে সঙ্গে নিয়েই তদন্ত শুরু করি। কিন্তু তথ্য ও সূত্রের অভাবে নিরেট কিছুই আমরা জানতে পারিনি।'

'আপনি আমাকে মেকানিক হতর কো সম্পর্কে বলুন।' রানা সামনের দিকে একটু ঝুঁকল।

'হতর কো!' চৌধুরী বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলেন। 'ওর নাম আপনি কিভাবে জানলেন?'

'মায়ানমার পুলিস তাদের তদন্তের ফাইলটা ফটোকপি করে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিল, সেটার ওপর চোখ বোলাবার সুযোগ আমার হয়েছে।'

'প্লেনটা ক্র্যাশ করাবার জন্যে তাকে দিয়েই যে কারিগরি ফলানো হয়, এ-ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই,' বললেন চৌধুরী। 'ইয়ানগন থেকে সাড়ে চারশো মাইল উড়ে ফালামে এসেছিল প্লেনটা, স্বভাবতই খানিকটা সার্ভিসিং-এর প্রয়োজন দেখা দেয়। এর আগেও ইয়ানগন থেকে আসা প্লেনে সার্ভিসিং-এর প্রয়োজন হয়েছিল, প্রতিবার হতর কো-ই কাজটা করে। অর্থাৎ খুনীরা জানত হতর কো-কে দিয়েই কাজটা করাতে হবে। সন্দেহ নেই, মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে তাকে রাজি করানো হয়।'

'কো-ই তাহলে ষড়যন্ত্রকারীদের হাতিয়ার ছিল?'

'হ্যাঁ। তাকে তার পাওনাও অবশ্য কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দেয়া হয়। সিদ্দিকী আর আমি তার লাশ দেখতে পাই এক হপ্তা পর। কেউ তার পেটে ছ'টা গুলি করেছিল।'

'কঠিন মৃত্যু,' বলল রানা।

চৌধুরীর ঠোঁটে শুকনো হাসি। 'তবে সে ছিল নেহাতই ছোট মাছ। রাঘব-বোয়ালরা গা ঢাকা দেয় গভীর জলে।'

'বড় মাপের সব অঘটনেই নারীচরিত্র একটা থাকতেই হবে,' রাষ্ট্রদূত তারিক মোস্তফা বললেন। 'এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। চৌধুরী, ওকে সেই ভদ্রমহিলার কথাও বলুন।'

'উঁহুঁ, আপনি বলুন, স্যার। কারণ শেষ দিকে আপনি তাকে চাকরি দেন—আপনার স্টাফ ছিলেন তিনি।'

ভুরু কুঁচকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কি মায়া মায়া মালহার-এর কথা বলছেন?'

'আপনি তো দেখছি প্রায় সবই জানেন, মি. রানা,' প্রশংসার সুরে বললেন রাষ্ট্রদূত। 'হ্যাঁ। মায়া মায়া মালহার ইয়ানগনের এক অভিজাত পরিবারের মেয়ে ছিলেন। ড. হায়দারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় লন্ডনে—পরিচয় মানে, ড. হায়দারের ছাত্রী ছিলেন তিনি। ড. হায়দার লন্ডন থেকে মায়ানমারে যখন এলেন, মায়া মালহার তখন ইয়ানগন ভার্সিটিতে লেকচারারের চাকরি করছেন। ড. হায়দারের আর্কিওলজিকাল এক্সপিডিশনে কিছু স্বেচ্ছাসেবকের দরকার, শুনে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ফালামে চলে আসেন তিনি।'

'শুনেছি মায়া মালহার ড. হায়দারের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, তবে ব্যাপারটা এক তরফা ছিল না,' বললেন রাষ্ট্রদূত। 'সম্পর্কটা তাঁরা গোপনও করেননি। বয়সের ব্যবধান যাই হোক, ড. হায়দার ছিলেন সুপুরুষ, আর মায়া মালহার ছিলেন অপরূপ সুন্দরী।'

'আপনি তাঁকে চাকরি দিতে গেলেন কি মনে করে?'

'তখন যিনি আমার বস্ ছিলেন, বুদ্ধিটা তাঁর,' বললেন রাষ্ট্রদূত। 'ড. হায়দার বিশ্বাস করে কাউকে কিছু বলছেন না, ফলে আমরা জানতে পারছি না সত্যি তিনি প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট আবিষ্কার করেছেন কিনা, এ-ও বুঝতে পারছি না আইএসআই তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করছে কিনা। এই অবস্থায় আমরা মায়া মালহারকে আমাদের হয়ে কাজ করার প্রস্তাব দিই। তিনি রাজি হন ঠিকই, কিন্তু অনেক দেরি করে ফেলেন।'

'তাঁকেও ওরা শেষ করে দেয়,' বললেন চৌধুরী।

'হ্যাঁ, কোন খোঁজই তো পাওয়া যায়নি।'

'তিনি নিখোঁজ হন ড. হায়দারের আগে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দু'দিন আগে। সে সময় আমার একবারও সন্দেহ হয়নি মায়া মালহার কোন অপরাধের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে পারেন। এরকম সন্দেহ ড. হায়দারের মনেও

জাগেনি। অন্তত আমাকে তিনি এ-ব্যাপারে কিছুই বলেননি। তবে আমার চেয়ে চৌধুরীর সঙ্গেই তাঁর বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল।'

মাথা নাড়লেন চৌধুরী। 'নাহ্, আমাকেও কিছু বলেননি। ওই শেষ দু'দিন তাঁর মধ্যে আমি চরম অস্থিরতা লক্ষ করেছি। পরে, অনেক পরে, গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার মনে একটা সন্দেহ জাগে।'

'কি সন্দেহ?'

রানার দিকে ঝুঁকলেন মিনহাজ চৌধুরী, মাংসল ও লোমশ হাত রাখলেন বিশাল উরুতে, মাথাটা নিচের দিকে নুয়ে পড়ল। 'দেখুন আপনি এর মধ্যে কোন অর্থ খুঁজে পান কিনা। যদি বলি মায়া মালহারকে কেউ রোপণ করেছিল? আসলে পাকিস্তানী স্পাই ছিল সে? আইএসআই-এর এজেন্ট?'

'অসম্ভব!' তীক্ষ্ণস্বরে প্রতিবাদ করলেন রাষ্ট্রদূত। 'কি যা তা বলছেন আপনি!'

'না না, আগে আমার সব কথা শুনুন, প্লীজ!' হাত নেড়ে আবেদন জানালেন চৌধুরী। 'পাকিস্তানী এঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে আইএসআই-এর এজেন্ট তো ছিলই, তাই না? ড. হায়দার কি করছেন, মাটি খুঁড়ে কিছু পাচ্ছেন কিনা, এ-সব নিশ্চয়ই তারা খোঁজ নিচ্ছিল। কিভাবে? ভেবে দেখুন,মায়া মালহার ছিলেন অপরূপ সুন্দরী, মধ্যবয়স্ক ও নিঃসঙ্গ ড. হায়দারের জন্যে আদর্শ টোপ।'

'ইন্টারেস্টিং,' বলল রানা।

'ড. হায়দারের সঙ্গে কাজ করছিলেন মায়া, এমনকি তাঁর সঙ্গে হয়তো শুচ্ছিলেনও। এই বয়সে প্রেমে পড়লে কিছু কি আর গোপন রাখা সম্ভব? তাছাড়া, স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে প্রজেক্টের সমস্ত তথ্য এমনিতেও পাচ্ছিলেন মায়া, এবং সে-সব তথ্য নিয়মিত পাচার করছিলেন। এটা প্রথম দিকের অবস্থা। এবার আন্দাজ করা যাক শেষদিকে কি ঘটেছিল। মায়া একটা নাটকও করে থাকতে পারেন, ড. হায়দারকে হয়তো বলেছেন যে তিনি খুব বিপদে পড়েছেন, আর তারপর দৃশ্যপট থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন। মায়া নিখোঁজ হয়ে গেলে স্বভাবতই উদভ্রান্ত হয়ে পড়েন ড. হায়দার। এই সময় মায়া তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, বললেন তিনি তাঁকে ভালবাসেন, তাঁকে ছাড়া তিনি বাঁচবেন না ইত্যাদি। আরও বললেন, ড. হায়দারের জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি–ইয়ানগনে।'

'ইন্টারেস্টিং!' বলল রানা।

'একটা প্রশ্নের উত্তর কখনোই আমরা পাইনি, হঠাৎ প্লেন চার্টার করে ইয়ানগনে যাবার কি প্রয়োজন ছিল ড. হায়দারের। আমি যেভাবে বলছি সেভাবে চিন্তা করলে এই প্রশ্নের একটা উত্তর পাওয়া যায়। মায়া মালহারই ছিলেন আইএসআই-এর টোপ। তিনিই ড. হায়দারকে ওই প্লেনে উঠতে প্ররোচিত করেন।'

'এ আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করতে পারি না। মায়া ড. হায়দারকে শুধু ভালবাসতেন না, দেবতা জ্ঞানে পুজো করতেন,' বললেন রাষ্ট্রদূত।

'কি করে বুঝলেন ওই প্রেম আর পুজো অভিনয় ছিল না?' জিজ্ঞেস করলেন চৌধুরী।

মাথা নাড়লেন তারিক মোস্তফা। দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে শুধু বললেন, 'বলিহারি আপনার কল্পনাশক্তি!'

'আপনি কি বলেন, মি. রানা?' রানার দিকে তাকালেন চৌধুরী। 'আমার সন্দেহ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?'

'নাহ্, উড়িয়ে দেয়ার মত নয়,' বলল রানা। 'যে-সব তথ্য ও ঘটনা আমরা জানি, তার সঙ্গে মেলে।'

'তাহলে এ-কথাও বলতে হয় যে অনেক তথ্য আমরা জানিও না,' বলল বৃষ্টি। 'সেই সব অজানা তথ্য আর ঘটনার সঙ্গে আপনার সন্দেহ হয়তো না-ও মিলতে পারে।'

'গোটা ব্যাপারটা এখন আপনাদের মাথাব্যথা।' চৌধুরী এত জোরে হেসে উঠলেন, তাঁর হাতের গ্লাস থেকে খানিকটা হুইস্কি ছলকে উঠল। 'আপনারা কেসটার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিতে চেয়েছিলেন–নিন! দেখা যাক সবাই যেখানে ফেল মেরেছে রানা এজেন্সি সেখানে কি করতে পারে!'

বারো

অ্যান্টিক শপ ঐতিহ্য সাড়া দিচ্ছে না।

'আমার ভয় করছে, মাসুদ ভাই,' কার ফোন রেখে দিয়ে বলল বৃষ্টি। 'ওরা রিসিভার তুলছে না।'

'একটু পরই জানা যাবে কি ঘটনা,' বলল রানা।

ট্র্যাফিক আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একের পর এক ওভারটেক করছে থুইন, পিছনে পড়া ড্রাইভাররা নিষ্ফল আক্রোশে হর্ন বাজাচ্ছে।

সামনে একটা তেমাথা। ট্র্যাফিক লাইট লাল হয়ে গেল।

হর্নের বোতাম চেপে ধরে সিগন্যাল অমান্য করল থুইন। একটা কার ওদের রিয়ার বাম্পারকে দু'ইঞ্চির জন্যে মিস করল।

বৃষ্টির চোখমুখ শান্ত, তবে রানার হাতটা শক্ত করে ধরে আছে।

'আমাদের বোধহয় সীটবেল্ট বাঁধা উচিত,' বলল রানা।

'স্পীড কমে আসছে।' ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকল বৃষ্টি। 'কি ব্যাপার, থুইন?'

'সিরিয়াস জ্যাম, ম্যাডাম।'

'গাড়ি সাইড করো!'

গাড়ির নাক ফুটপাথের দিকে ঘুরে গেল। চাকা থামার আগেই দরজা খুলে ফেলল রানা।

ফুটপাথ ধরে হন হন করে এগোল তিনজন। দু'বার বাঁক ঘোরার পর জে. খই খই কুয়া রোডে পৌঁছাল। আর মাত্র একটা বাঁক ঘুরলেই ঐতিহ্যকে দেখা

যাবে। কিন্তু তার আগেই আকাশের লালচে ভাব দেখে পেটের ভিতর শিরশিরে অনুভূতি হলো রানার। বাঁক ঘোরার পর ওদের আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হলো। দাউ দাউ করে জ্বলছে একটা বিল্ডিং।

'সর্বনাশ!' বলেই ছুটল বৃষ্টি।

খপ্ করে তার কব্জি চেপে ধরল রানা। 'থামো। এটা আমাদের জন্যে একটা ফাঁদও হতে পারে।'

জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পিস্তল ধরে আছে থুইন। তার চঞ্চল দৃষ্টি আগুন দেখতে জড়ো হওয়া ভিড়ের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঐতিহ্যের জায়গায় অশুভ, কুৎসিত ও ভীতিকর একটা আভা দেখতে পেল ওরা। কালো মেঘের মত বেরিয়ে আসা ধোঁয়া মোচড় খেতে খেতে ওপরে উঠে যাচ্ছে। দোকানের ভেতরে আগুনের শিখাগুলো মনে হলো ছুটোছুটি করছে। অগ্নিঝড়ের ভেতর বড় আকারের আর্ট পীসগুলোকে কালচে আর বেঢপ লাগছে দেখতে।

'আগুনটা খুব বেশিক্ষণ আগে ধরেনি,' বলল রানা। 'তা ধরলে ভিড় আরও বড় হত।'

'মনির আর শহীদ বেরুতে পেরেছে কিনা দেখা দরকার!' বৃষ্টির গলায় মিনতি।

এখনও তার হাত ধরে আছে রানা। 'বেরিয়ে থাকলে ভাল। আর যদি ভেতরে আটকা পড়ে থাকে, আমাদের কোনও সাহায্য ওদের কাজে লাগবে না।'

দোকানের সামনে প্রতি মুহূর্তে ভিড় বাড়ছে। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আহা-উহু করছে দর্শকরা, ভাল করে দেখার জন্যে ঠেলাঠেলিও চলছে। সাহসী লোকজন ঝুঁকি নিয়ে আগুনের কাছাকাছি চলে আসছে দেখে একজন পুলিস কনস্টেবল বাধা দিচ্ছে। তবে একা ভিড়টাকে সামলাতে পারছে না।

'মানুষ!' হঠাৎ একটা চিৎকার শোনা গেল। 'দেখো, দেখো! ভেতরে মানুষ রয়েছে!'

দৃশ্যটা এবার সবাই দেখতে পেল। শিখার ভেতর মোচড় খাচ্ছে একটা ছায়া। মনে হলো পুরুষমানুষ। মোচড় খেতে খেতে ছুটল সে। ছুটে এসে সরাসরি ধাক্কা খেলো ডিসপ্লে উইন্ডোয়, বাধা পেয়ে ফেরত গেল আবার।

'হায় হায়, কি করি!' কপাল চাপড়ে অসহায়ত্ব প্রকাশ করল কনস্টেবল, তারপর সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দোকানের দিকে ছুটল, আগুনের আঁচে কুঁকড়ে যাচ্ছে শরীর। দরজা ধরে টানাটানি শুরু করল সে। কিন্তু বৃথাই, খুলতে পারছে না। হাতের লাঠি দিয়ে উইন্ডোর কাঁচে বাড়ি মেরেও কোন লাভ হলো না।

আগুনের আঁচ কাবু করে ফেলল কনস্টেবলকে, দরজার সামনে ঢলে পড়ল সে। ভিড় থেকে ছুটে গেল দু'জন লোক, আগুন নাগাল পাবার আগেই টেনে সরিয়ে আনল তাকে।

দোকানের ভেতর জ্বলন্ত লোকটা ভারী একটা চেয়ার তুলে বাড়ি মারল কাঁচে। দ্বিতীয় আঘাতে চিড় ধরল গ্লাসে। তৃতীয় আঘাতে ঝাপসা হলো, তারপর

টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ফুটপাথে। লোকটা যেন জ্বলন্ত মশাল, পিছিয়ে গিয়ে লাফ দিল সদ্য তৈরি ফাঁক লক্ষ্য করে।

আঁতকে উঠে পিছিয়ে এল ভিড়টা।

এক রাশ ভাঙা কাঁচ সহ ফুটপাথে পা দিয়ে পড়ল লোকটা, টলমলে পায়ে দু'ফুট এগোল, তারপর সটান আছাড় খেলো। ফুটপাথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল সে।

ভিড়ে চ্যাপ্টা হচ্ছে রানা, কনুই আর হাঁটু চালিয়েও নিরেট পাঁচিল এতটুকু ফাঁক করতে পারছে না।

রানা ভিড় ঠেলে লোকটার কাছে পৌঁছাতে পারলে যা করতে পারত সেই কাজ দর্শকদের একজন করছে। নিজের গায়ের কোট খুলে জ্বলন্ত লোকটার গায়ে ঘন ঘন বাড়ি মারছে। তাকে সাহায্য করার জন্যে ভিড় থেকে আরেক লোক এগিয়ে এল।

খক্ খক্ করে কাশছে, উঠে বসল কনস্টেবল। 'দরজা আটকে গেছে···অনেক চেষ্টা করেও খুলতে পারলাম না···'

ভাঙা জানালা দিয়ে তাজা অক্সিজেন ঢুকছে দোকানের ভেতর, নতুন খোরাক পেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠল আগুন। লাল হয়ে উঠল কাঁচ। লালচে-হলুদ আগুনের চাদর দালানের মুখ চাটতে চাটতে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে।

উপকারী কয়েকজোড়া হাত পুড়ে সেদ্ধ হওয়া লোকটাকে টেনে সরিয়ে আনল। তার কাপড়ে বা শরীরে এখন কোন শিখা নেই, তবু পুড়ছে সে। সাহায্যকারীরা নিজেদের হাতে কাপড় জড়িয়ে লোকটাকে ধরে আরও খানিকটা দূরে সরিয়ে আনল।

ফুটপাথের যেখানে সে পড়েছিল সেখানে মানুষের আকৃতি ফুটে উঠেছে, নকশাটা থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা গেল।

লোকটাকে আলোয় নিয়ে আসতে ভিড়ের মধ্যে থেকে অনেকে কেঁদে ফেলল, তাদের মধ্যে সবাই মহিলা নয়। বৃষ্টির মনে হলো সে জ্ঞান হারাবে, রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'ও আমাদের শহীদ!'

'কি করে বুঝলে?' পোড়ার মাত্রা এত বেশি, নারী না পুরুষ চিনতে পারছে না রানা।

'জুতো!'

দগ্ধ লোকটার পা থেকে খুলে গেছে একটা জুতো। রানা না চিনলেও, বৃষ্টি জানে ওটা কার।

থুইন বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে।

বৃষ্টি একটা লাইটপোস্টে হেলান দিল।

পোড়া শরীরটার দিকে আরেকবার তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল রানা। এদিক ওদিক তাকাল ও, শুধু একটা দিকে ভুলেও সরাসরি তাকাচ্ছে না। কারণ ওদিকটায় দুজন লোককে আগেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সে। ওদেরকে দেখেই বৃষ্টিকে দোকানের সামনে যেতে দেয়নি ও।

ভিড়ের মুখ আতঙ্ক, করুণা আর শোকের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু দু'জন লোকের অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ অন্য রকম।

সরাসরি না তাকিয়ে তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আর একবার নিশ্চিত হয়ে নিল রানা।

লোকটার বিশাল শরীরই একটা সাইনবোর্ড। সাড়ে ছ'ফুটের কম নয় সে, তার মাথাই সবার ওপরে।

তার পাশে দাঁড়ানো খুদে লোকটাকে ভিড় ফাঁক হলেই শুধু দেখা গেল।

দু'জনেই তারা চকচকে চোখে আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে।

অগ্নিকুণ্ড থেকে একটা ঘূর্ণি উঠল। লোক দু'জন সেটা দেখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে তৃপ্তির হাসি হাসল।

'হিনান ফো আর চো মাউং।'

'কি?' ডানে বাঁয়ে তাকাল বৃষ্টি। 'কোথায়?'

'এখন তাকালেও দেখতে পাবে না,' বলল রানা। 'আমরা ভিড় থেকে বেরুচ্ছি না দেখে কেটে পড়ছে। থুইন!'

'ইয়েস, স্যার!'

'ম্যাডামকে দেখো। আশপাশে ওদের আরও লোক থাকতে পারে।' ভিড় ঠেলে এগোবার সময় এবার রানা নির্মম হয়ে উঠল।

হাঁটু আর কনুইয়ে গুঁতো খেয়ে লোকজন প্রায় দাঙ্গা বাধিয়ে দিল। এক তরুণী কাঁধের ধাক্কা খেয়ে খেপে গেল, হ্যান্ডব্যাগ দিয়ে রানার মুখে আঘাত করল সে। হাত দিয়ে ঢেকে চোখ দুটোকে বাঁচাল রানা। আরেক লোক সরাসরি ঘুসি চালাল, ভাগ্য ভাল যে রানার কাঁধে ঘষা খেয়ে পিছলে গেল সেটা।

ভিড় ঠেলে বেরিয়ে রানা দেখল ফো আর মাউং রাস্তার ওপারে চলে গেছে। এখন আর হাঁটছে না, দৌড়ে পালাচ্ছে। ধাওয়া করল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওরা। রানাকে দেখে দু'জনের মুখের হাসি চওড়া হলো। তবে ছুটছে আগের চেয়েও জোরে।

রানার হাতে পিস্তল বেরিয়ে এল। অন্তত একজনকে আহত করতে পারলেও কাজ হয়।

সাইরেন বাজিয়ে বাঁক ঘুরল একটা ফায়ার এঞ্জিন।

রাস্তা পেরুতে গিয়েও লাফ দিয়ে পিছিয়ে আসতে হলো রানাকে। প্রকাণ্ড লাল মেশিনটা গা রিরি করা কর্কশ আওয়াজ তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফায়ারম্যানরা লাফ দিয়ে রাস্তায় নামল, দীর্ঘ হোস-এর কুণ্ডলী খুলছে দ্রুত। দু'একজনকে ধাক্কা দিয়ে রানাকে ছুটতে দেখে তিরস্কার করল হেড ফায়ারম্যান।

লম্বা একটা হুক-অ্যান্ড-ল্যাডার রিগ সজোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রথম ফায়ার এঞ্জিনের পিছনে, লাফ দিয়ে আরও ফায়ারম্যান নামছে রাস্তায়।

গাড়ি ও লোকজনকে পিছনে ফেলে বেরিয়ে এল রানা। কিন্তু ফো বা মাউংকে কোথাও দেখতে পেল না।

ছোটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে পরবর্তী বাঁকের দিকে যাচ্ছে রানা। ছায়ার ভেতর

লুকিয়ে থাকতে পারে, প্রতিটি দরজার আড়ালে চোখ বোলাচ্ছে। কিন্তু চৌরাস্তায় পৌঁছেও কোথাও কাউকে দেখতে পেল না।

বড় করে শ্বাস নিল রানা, দশ পর্যন্ত গুনল, তারপর ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল। কাজে লাগল না। ডাস্টবিনে ঝেড়ে একটা লাথি কষতে সামান্য একটু ঠাণ্ডা হলো মাথা।

আগুনের কাছে ফিরে এল রানা। লোকজনের ভিড় এত বেড়ে গেছে যে রাস্তায় তিল ধারণের জায়গা নেই। থুইনের লাল ক্যাপটা দেখতে পেয়ে সেদিকে এগোল ও।

কেউ একজন ওর আস্তিন ধরে টান দিল।

বন করে আধপাক ঘুরল রানা। ওর আক্রমণাত্মক ভঙ্গি দশ বছরের টোকাই ছেলেটাকে সন্ত্রস্ত করে তুলল। 'মাসুদ রানা, স্যার?'

'তুমি আমার নাম জানলে কিভাবে?'

একটা এনভেলাপ এগিয়ে দিল ছেলেটা। 'এটা আপনার, স্যার। ওরা আমাকে বলল আমি যদি আপনাকে স্যার বলি আর এটা দিই তাহলে আপনি আমাকে একশো কিয়াতের একটা কড়কড়ে নোট দেবেন।'

ব্ল্যাকমার্কেটে একশো কিয়াত মানে প্রায় এক মার্কিন ডলার। 'ওরা কারা?' জানতে চাইল রানা।

'যারা বলল আপনি আমাকে একশো কিয়াত দেবেন।'

নোটটা দিয়ে এনভেলাপটা নিল রানা।

'আপনার মঙ্গল হোক, স্যার।'

'সত্যি করে বলো, এই এনভেলাপ কে দিল তোমাকে?' গলাটা আরও নরম করল রানা।

'ওই তো, স্যার–গাড়িতে বসে আছেন,' বলে হাত তুলে রাস্তার ওপারটা দেখাল টোকাই। সেদিকে তাকিয়ে বাদামী রঙের একটা পাজেরো জীপ দেখতে পেল রানা, রাস্তার পাশে পার্ক করা।

এই একই পাজেরো আজ ট্রাক ড্রাইভারকে চাপা দিয়েছে।

পাজেরো থেকে এক লোক একটা হাত বের করে নাড়ল রানার উদ্দেশে। চেহারা নয়, শুধু হাতটাই দেখা গেল। স্টার্ট দেয়াই ছিল, বাঁক নিয়ে চলে গেল পাজেরো। যাবার সময় কয়েকবার হর্ন বাজাল ড্রাইভার।

এনভেলাপটা পকেটে ভরে বৃষ্টি আর থুইনের কাছে ফিরে এল রানা।

আগুন ইতিমধ্যে নিভে এলেও পাঁচটা হোস পাইপ ঐতিহ্যের ভেতর এখনও পানি ছুঁড়ছে। বিল্ডিঙের বাকি দোকানগুলো রক্ষা পাওয়ায় ভাগ্যের প্রতি কৃতজ্ঞ মালিকরা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে ভুটানি, নেপালি ও ভারতীয়রা বৃষ্টিকে আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়ে গেল।

দোকানটাকে ঘিরে এখনও কালো ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ নিভে আসা আগুনের ভেতর চোখ ধাঁধানো সাদা আভার ক্ষণস্থায়ী একটা বিস্ফোরণ ঘটল।

ম্লান মুখে বিড়বিড় করল বৃষ্টি, 'অটোডেসট্রাক্ট তার কাজ করছে।'

রানা এজেন্সির সব শাখা অফিসেই এই ব্যবস্থাটা আছে। প্রতিটি ফাইল ও সফিসটিকেটেড ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টে খুদে বোমা ফিট করা আছে, আগুন ও পানির সংস্পর্শে এলে বা প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলে ওই বোমা নিজের থেকে ফেটে গিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ছাই করে দেবে সব।

থুইন দোকানটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। এক সময় ফিসফিস করে বলল, 'মনির সাহেব?'

'সে-ও বোধহয় ভেতরে ছিল,' বলল রানা, হাত দুটো মুঠো পাকানো।

'বলতে পারেন, স্যার, কারা এভাবে খুন করে?'

'কীট, নরকের কীট,' বলল রানা। 'প্রতিজ্ঞা করলাম, এই আগুন আমিও ওদেরকে খাওয়াব।'

বৃষ্টি বলল, 'মাসুদ ভাই, আমাকে একবার থানায় যেতে হচ্ছে...'

'একটু পর,' বলল রানা। 'তার আগে গাড়িতে এক মিনিট বসব আমরা।'

বুলেটপ্রুফ আর্মারড় লিমোজিনে ফিরে এল ওরা। ব্যাকসীটে বসে আলো জ্বেলে এনভেলাপটা পরীক্ষা করছে রানা।

'কি ওটা?' জিজ্ঞেস করল বৃষ্টি।

এনভেলাপটা কিভাবে পেয়েছে ব্যাখ্যা করল রানা।

'লেটার বম নয় তো?' বৃষ্টি উদ্বিগ্ন।

তালুতে ফেলে খামটার ওজন অনুভব করল রানা, আলোর সামনে ধরে ভেতরে কি আছে বোঝার চেষ্টা করল। 'জানি এটা লেটার বম নয়, তবে চেক করে দেখতে ক্ষতি নেই,' বলল ও।

'আপনি ওদেরকে চেনেন?'

মাথা নাড়ল রানা।

'তাহলে কেন বলছেন জানেন ওটা বোমা নয়?'

'বোমা পাঠাবার ঝামেলায় যাবে কেন? আমাকে খুন করার আরও অনেক ভাল সুযোগ পেয়েও যখন কাজে লাগায়নি?'

ছুরি বের করে এনভেলাপের একটা প্রান্ত কাটল রানা। ভেতর থেকে ভাঁজ করা ছোট একটুকরো কাগজ বেরুল শুধু। কাগজে কি যেন লেখা রয়েছে। ভাষাটা ইংরেজি।

'কোন মেসেজ?' জিজ্ঞেস করল বৃষ্টি।

কাগজটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা। তাতে লেখা:

জয়ে জয়ে থুনপুন
সাইট # ১০৫, কোকো গুন
ফালাম।

'ওটাই আমার পরবর্তী গন্তব্য,' বলল রানা।

তেরো

এই টরচার হাউস জনবসতিহীন জঙ্গলের ভেতর। এখানে চিৎকার করে কোন লাভ নেই, কারণ নির্যাতনকারীরা ছাড়া আর কেউ শুনতে পাবে না।

সিলিং থেকে নেমে আসা একটা শিকলের সঙ্গে ঝুলছে থান নোয়ে। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, তার পা দুটো ফাঁক করে রেখেছে একটা স্প্রেডার বার। এই মুহূর্তে নোয়ে চিৎকার করছে না, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

'কেউ একটা তোয়ালে দাও।' হাত বাড়াল মাইয়ো মিন। 'কুত্তার বাচ্চাটা আমার সারা শরীরে রক্ত মাখিয়ে দিয়েছে।'

'এই নাও, ওর শার্ট,' দলের একজন বলল। 'পুড়িয়েই যখন ফেলব, তার আগে কাজে লাগাও।'

'উফ্!' শার্টটা দিয়ে মুখ মুছল মিন। 'এ শালার বড় খাটনির কাজ, এই টরচার করা। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

'একটা বিয়ার নাও।'

একটা এক কোয়ার্ট বোতলের ছিপি খুলে এক ঢোকেই অর্ধেক বিয়ার গিলে ফেলল মিন। 'আহ্, শান্তি!' হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছে হাসল।

মিন আর তার তিনজন সঙ্গী মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। কামরাটা স্যাঁতসেঁতে, কোন জানালা নেই। পাথুরে দেয়াল, মেঝেটা মাটির। সরু তারের শেষ প্রান্তে একটা বালব জ্বলছে। ঘরের এক কোণে একটা গর্ত, তাতে কয়লা জ্বলছে। জ্বলন্ত কয়লা থেকে বেরিয়ে আছে বিভিন্ন আকৃতির লোহার শিকের হাতল।

কাঠের সিঁড়িতে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ উঠল, ধাপ বেয়ে নেমে আসছে মায়াতকা থুয়ে ও আয়ে মোয়ে।

মিন আর তার শিষ্যরা বামপন্থী কবি মায়াতকা থুয়েকে দেখে দাঁড়াল, সম্মান দেখিয়ে কয়েকবার করে মাথা নোয়াল।

'ও কথা বলেছে?' থুয়ে জানতে চাইল।

'না, একটা শব্দও করছে না,' বলল মিন। 'বুড়ো হলে কি হবে, এখনও অসম্ভব শক্ত।'

'না-না, যেভাবে পারো কথা বলাও!' মায়াতকা থুয়েকে অসহিষ্ণু মনে হলো। 'হাতুড়ির জন্ম থেকে এই বুড়ো নোয়ে দলটার সঙ্গে আছে। হাতুড়ির প্রতিষ্ঠাতা উইন হাটাইকের সাক্ষাৎ শিষ্য। অবসর নিলেও, হাতুড়ির ওরা কি করে না করে সব খবরই রাখে।'

'কথা বলছে না, অথচ তোমরা সবাই হাত-পা গুটিয়ে বসে ছিলে কি মনে করে?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল আয়ে মোয়ে।

'বসেছিলাম–বুড়োর জ্ঞান নেই, তাই। তাছাড়া, যা বয়স হয়েছে, বেশি চাপ দিলে বাঁচবে না। কলেজ বয়, তোমার প্রশ্নের উত্তর পেলে?' আয়ে মোয়েকে বিদ্রূপ করল মাইয়ো মিন।

'আমি ওর হুঁশ ফিরিয়ে আনছি।'

'শুনলে ছাত্রনেতা কি বলল?' শিষ্যদের দিকে ফিরে চোখ মটকাল মিন। 'ও আমাদেরকে কাজ শেখাবে!' আয়ে মোয়ের দিকে ফিরল আবার। 'তো দেখিয়ে দাও, কিভাবে জ্ঞান ফেরাতে হয় শিখি।'

'তোমার স্পর্ধা তো কম নয়, আমাকে চ্যালেঞ্জ করো!'

'তোমার ওপর দায়িত্ব ছিল বাঙালী বাবুটাকে খুন করা, সে দায়িত্ব কি তুমি পালন করেছ? তা করলে বুড়ো নোয়েকে নিয়ে এখানে আমাদের সময় নষ্ট করতে হত না।'

'তার আগে তো কাজটা নান তুং আর তোমাকে দেয়া হয়েছিল। তোমরা কেন পারোনি?'

'থামো তোমরা!' কর্তৃত্বের সুরে বলল মায়াতকা থুয়ে। 'তোমরা এভাবে চেঁচামেচি করলে কাজ এগোবে? মোয়ে, ওকে একটা সুই দাও।'

পকেট থেকে লেদার দিয়ে মোড়া একটা কেস বের করল মোয়ে। আস্ত একটা ইটের মত দেখতে ওটা।

'সুই মানে?' জিজ্ঞেস করল মিন।

কেসের ভেতর মখমলের লাইনিং, তাতে শুয়ে আছে একটা হাইপডারমিক সিরিঞ্জ আর স্বচ্ছ তরল পদার্থ ভরা ছোট একটা ফাইল।

আলোর নিচে দাঁড়িয়ে সিরিঞ্জে ফাইলের ফ্লুইড ভরল মোয়ে। অচেতন থান নোয়ের কাছে এসে সবার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল সে, কেউ যাতে দেখতে না পায় পোড়া মাংসের গন্ধে নাক সিটকাচ্ছে। নোয়ের গলায় একটা শিরা খুঁজে নিয়ে সলিউশনটুকু ইনজেক্ট করল।

'জিনিসটা কি?' মিনের এক শিষ্য জিজ্ঞেস করল।

'স্টিমিউল্যান্ট,' বলল মোয়ে।

'চোখেমুখে পানি ছিটালেও জ্ঞান ফিরত,' মন্তব্য করল মিন।

'এতে শুধু জ্ঞান ফিরবে না, তারপর যতই টরচার করা হোক, আর অজ্ঞান হবে না।'

নোয়ে মোচড় ও ঝাঁকি খেলো, তারপর গুঙিয়ে উঠে চোখ মেলে তাকাল।

'আমার কাজ আবার শুরু হলো।' জ্বলন্ত কয়লার স্তূপ থেকে টকটকে লাল একটা শিক তুলে নিয়ে নোয়ের সামনে এসে দাঁড়াল মিন।

পাঁচ মিনিট পরই নিজের পরাজয় স্বীকার করল সে, বলল, 'এই লোককে কথা বলানো অন্তত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এরচেয়ে বেশি কিছু করতে গেলে মারা যাবে।'

মিনের কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিল মায়াতকা থুয়ে। 'তুমি লোক ভাল, মাইয়ো, কিন্তু তোমার কাজে সূক্ষ্ম কৌশলের অভাব রয়েছে।' গায়ের কোট খুলে

একজনের হাতে ধরিয়ে দিল সে। শার্টের আস্তিন গুটিয়ে আগুন থেকে গরম একটা শিক তুলে নিল।

বাকি সবাই দেখার জন্যে তার দু'পাশে সরে এল।

'একটা কথা স্বীকার করতে হবে,' দলের একজন নিচু গলায় প্রশংসা করল, 'বস্ কলেজে লেকচার দেন, পত্রিকায় কবিতা ছাপান, অথচ তারপরও নোংরা হবার ভয়ে হাত গুটিয়ে রাখেন না।'

থুয়ে কাজ শুরু করতেই আর্তনাদ শুরু হলো। কয়েক মিনিট পর কাজে বিরতি দিল সে, সেই সঙ্গে চিৎকারও থেমে গেল। নোয়ের মুখ থেকে দুর্বোধ্য শব্দ বেরুচ্ছে।

'কিছু বলছ, নোয়ে? আমাকে তোমার কিছু বলার আছে?' থুয়ের কণ্ঠস্বর নরম, আদর ও স্নেহ যেন ঝরে পড়ছে।

নোয়ে ঘন ঘন মুখ খুলছে।

'কি বলছে ও?'

'চুপ! শুনতে দাও!' হাত তুলে শব্দ করতে নিষেধ করল থুয়ে, তারপর নোয়ের ঠোঁটের কাছে কান নামাল।

এক মুহূর্ত পর মাথা ঝাঁকিয়ে সিধে হয়ে বসল সে। 'এ গ্যাঙটা হাতুড়িই, পরিষ্কার। ওরাই আমাদের সঙ্গে লাগছে। তবে বাঙালী বাবুকে কেন ওরা সাহায্য করছে তা নোয়ে জানে না। কেউ ওদেরকে প্রচুর টাকা দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে তাও ওর জানা নেই। হাতুড়ির লোকজন ফালামের আর্কিওলজিকাল সাইটে গুরুত্বপূর্ণ একজন সাক্ষীকে আটকে রেখেছে।'

'বস্, আপনি জাদু জানেন!' গদগদ কণ্ঠে বলল মিন।

'চুপ!' ফিসফিস করল মোয়ে। 'আরও কি যেন বলছে!'

নোয়ের মুখের সামনে আবার কান পাতল থুয়ে। তার ভুরু ধীরে ধীরে কুঁচকে উঠল। 'কি? কি? জোরে বলো, নোয়ে! তোমার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না।'

নোয়ের ঠোঁট নড়ছে।

'এখনও শুনতে পাচ্ছি না।' মাথাটা আরও নিচু করল থুয়ে। নোয়ের মুখ হঠাৎ উঁচু হলো। তার দু'সারি দাঁত থুয়ের কান কামড়ে ধরল।

'উ-উ-উ-ই-ই-ই!' আর্তনাদ বেরুচ্ছে থুয়ের গলা থেকে। 'আমার কান গেল! কান গেল!'

নোয়ের দাঁত কানটা ছাড়ছে না। সবাই মিলে তাকে লাথি, কিল, ঘুসি মারছে। কাজ হচ্ছে না দেখে মিন তার গলা চেপে ধরল।

শরীর মুচড়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে কানটাকে মুক্ত করল থুয়ে। 'আমার কানের সর্বনাশ হয়ে গেছে! কামড়ে ফুটো করে দিয়েছে!'

মিনের আঙুল নোয়ের গলার গভীরে ডেবে গেল। 'বেজন্মা শুয়োর! মেরেই ফেলব তোকে...'

'তার আর দরকার নেই,' শান্ত গলায় বলল আয়ে মোয়ে। 'বুড়ো এরইমধ্যে পটল তুলেছে।'

গলা ছেড়ে দিয়ে সিধে হলো মিন।

নোয়ের মাথা একদিকে কাত হয়ে গেল। তার রক্তাক্ত নিষ্প্রাণ মুখে এক চিলতে শয়তানী হাসি লেগে রয়েছে।

সকাল ন'টা। তোবড়ানো পিকআপ ট্রাকটা একটা মাইলস্টোনকে পাশ কাটাল। মাইলস্টোনে লেখা রয়েছে–কোকো গুন। তার নিচে লেখা–ফালাম ৫০ মাইল।

রাস্তাটা কাঁচা, মাটির ছোটবড় টিলাকে পাশ কাটিয়ে গাছপালার ছায়ার ভেতর হারিয়ে গেছে। চারদিকে জঙ্গল, তারই ভেতর ছড়ানো ছিটানো ঘর-বাড়ি। পুরানো টিনের চাল আর ভাঙা বেড়ার দেয়াল দেখে বোঝা যায় এলাকার মানুষ স্বচ্ছল নয়। এদিকে ঘর-বাড়ির চেয়ে প্রাচীন সভ্যতার সন্ধানে খোঁড়া পাহাড়ের সংখ্যাই বেশি। খুব একটা উঁচু না হলেও, কোন কোন পাহাড় আয়তনে বিশাল।

আরও তিন মাইল সামনে এরকম একটা বিশালায়তন পাহাড়কে চক্কর দিয়ে এগিয়েছে রাস্তাটা, সরু শাখা উঠে গেছে পাহাড়ের মাথায়। উপত্যকার তিনশো ফুট ওপরে পাহাড়ের সমতল চূড়া।

চূড়ায় কোন গাছপালা নেই। নিচ থেকে পাথরের কিছু স্তম্ভ দেখা গেল। সকালের প্রখর রোদে চকচক করছে কয়েকটা গাড়ি, স্তম্ভগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। চূড়ায় কয়েকজন লোকও আছে।

এটাই ১০৫ নম্বর আর্কিওলজিকাল সাইট। তবে সশস্ত্র যে লোকগুলো ওখানে টহল দিচ্ছে তারা কেউ আর্কিলওজিস্ট নয়।

চক্কর শেষ করে পুরানো পিকআপটা গাছপালার ছায়ার ভেতর ঢুকে একটা বাঁক নিল, পাহাড় চূড়ায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেন্ট্রিরা এখন আর গাড়িটাকে দেখতে পাচ্ছে না। ড্রাইভার স্পীড কমিয়ে আনল।

ট্রাকের ক্যাবে ড্রাইভার ছাড়া আর মাত্র একজন লোক রয়েছে। লোকটার পরনে দেহাতী পোশাক–ছাপা লুঙ্গি, হাত কাটা ফতুয়া, টায়ার কেটে তৈরি করা স্যান্ডেল আর শুকনো ঘাস দিয়ে বোনা মাথাল। কাঁধ থেকে লম্বা ও নাদুসনুদুস ক্যানভাসের একটা ব্যাগও ঝুলছে।

গতি আরও কমল, ট্রাকের প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ার অবস্থা। 'ধন্যবাদ, ভাই,' ড্রাইভারকে বলল আরোহী। 'তুমি আমাকে অনেক কম পয়সায় পৌঁছে দিলে। বাসে করে এলে দ্বিগুণ কিয়াত গুনতে হত।'

'আমারও উপরি দু'পয়সা আয় হলো।' হাসল ড্রাইভার। 'ফেরার পথে তোমাকে পাব তো?'

'দশ মিনিট অপেক্ষা কোরো,' বলল আরোহী। 'আমাকে দেখতে না পেলে মনে করবে জরুরী কাজে আটকা পড়ে গেছি।'

দরজা খুলে লাফ দিল রানা, মাথা নিচু করে দ্রুত ঢুকে পড়ল ঝোপের আড়ালে, কান পেতে থাকায় শুনতে পেল এঞ্জিনের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অন্ধের মত কখনোই কোথাও যায় না রানা। কোকো গুন-এ যে বা যারাই ওকে ডেকে থাকুক, দেখা করার আগে আড়াল থেকে তাদের পরিচয় ও গতিবিধি

সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে হবে ওকে।

ইয়ানগনের ট্রাক স্ট্যান্ডে খোঁজ নিয়ে ফালাম শহরে সওদা নিয়ে আসবে এরকম একজন ড্রাইভারকে পেতে ওর কোন অসুবিধে হয়নি। প্রস্তাব দিতেই ওকে কোকো শুনে পৌঁছে দিতে রাজি হয়ে গেল লোকটা। ও যে ছদ্মবেশ নিয়ে আছে, এটা বুঝেও তাকে কোন প্রশ্ন করেনি সে।

ড্রাইভার সাইটটা চিনত। ওটার চারপাশের জঙ্গলে মেটো পথের কোন অভাব নেই। সাইটটা খুঁজে বের করতে হলে অনেক সময় লাগত রানার।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর নিশ্চিত হলো, ওর খোঁজে কেউ আসছে না। ঝোপ থেকে বেরিয়ে পথে নামল রানা। মাথার ওপর গাছপালার ছাউনি, পথটা এঁকেবেঁকে এগিয়েছে, প্রতিটি বাঁকের পর বিশ-পঁচিশ গজের বেশি দেখা যায় না। জঙ্গলটা নিস্তব্ধ নয়। গাছে গাছে বানর আর পাখি ছুটোছুটি ও হৈ-চৈ করছে। ঝাঁকে ঝাঁকে ফড়িং আর প্রজাপতি দেখা যাচ্ছে, ঝোপ থেকে ঝোপে উড়ে গিয়ে ফুলে বসছে প্রজাপতিগুলো। কি মনে করে বহুরঙা একটা প্রজাপতি রানার কাঁধেও একবার বসল।

রানা পা ফেলছে সাবধানে। মেঠো পথে শুকনো ঝরা পাতা প্রচুর, ওগুলোর নিচে ফাঁদ থাকতে পারে। এখনও তেমন কিছু দেখেনি, তবে পথের প্রতিটি বাঁকে ডেথট্র্যাপ লুকিয়ে থাকলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

এক সময় পথ ছেড়ে একটা ছোট পাহাড়ে চড়ল রানা। গাছপালার ফাঁকে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। ব্যাগ থেকে বিনকিউলার বের করে গলায় ঝোলাল, তারপর কোথায় আছে দেখার জন্যে লম্বা একটা গাছের মাথায় উঠে এল।

একশো পাঁচ নম্বর সাইট চারশো ফুট বা তারও বেশি উঁচু ছিল, খুঁড়ে তিনশো ফুটে নামিয়ে আনা হয়েছে। পাথরের স্তম্ভগুলো প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। ওগুলোর পাশে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাড়ির সামনে দুটো পিকআপ ট্রাক আর একটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে।

চওড়া একটা স্তম্ভের মাথায় পাহারায় দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র একজন সেন্ট্রি, সতর্ক মনোযোগের সঙ্গে নিচের উপত্যকায় চোখ বোলাচ্ছে। তবে পিছনদিকে একবারও তাকাচ্ছে না। তাকালেও গাছের ভেতর রানাকে দেখতে পাবে বলে মনে হয় না।

ছায়ায় বসে আছে আটজন লোক। কারও হাতে চুরুট, কেউ চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে। গল্প করে অলস সময় কাটাচ্ছে ওরা। সবার কাছেই পিস্তল আছে। অন্তত পাঁচজনের কাছে রাইফেলও আছে।

দিনের আলো থাকতে তেমন কিছু করার নেই রানার। গাছ থেকে নেমে একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে আরাম করে বসল। বেলা আরও একটু বাড়তে ব্যাগ থেকে স্যান্ডউইচ বের করে লাঞ্চ সারল। পানির বদলে ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে গলা ভেজাল।

রোদের আঁচে চোখে ঘুম চলে এল। ঝোপের ভেতর গাছের ছায়া আছে, কাত হয়ে চোখ বুজল রানা, মাথালটা মুখের ওপর ফেলে রোদের ঝাঁঝ ঠেকাল।

উঁচু জায়গায় অনেক দূরের শব্দও শোনা যায়। দ্রুত গতি গাড়ির আওয়াজে ভেঙে গেল ঘুমটা। কি ঘটছে দেখার জন্যে আরেকবার চড়তে হলো গাছটায়।

সাইটের লোকজন আগের মতই শান্ত ও অলস। গাড়িটাকে পাহাড়চূড়ায় উঠতে দেখছে তারা। পাহাড় পেঁচানো রাস্তায় ধুলোর ওড়না উড়িয়ে উঠে যাচ্ছে গাড়ি।

ওটা সেই বাদামী পাজেরো।

সমতল চূড়ায় উঠে থামল পাজেরো। দরজা খুলে আরোহীরা নামছে।

ওদের দিকে বিনকিউলার তাক করল রানা। কয়েকজনকে চিনতে পারল, ইয়ানগনে দেখেছে।

পাজেরোর অবস্থা বেশ কাহিল। হবারই কথা, কারণ খুব বাজে রাস্তা ধরে চারশো মাইলেরও বেশি পথ পেরুতে হয়েছে।

কি কারণে যেন আগন্তুকরা সবাই খুব উত্তেজিত। সাইটে উপস্থিত সঙ্গীদের উদ্দেশে চিৎকার করে কথা বলার সময় হাতের অস্ত্র নাড়ছে। রানা ধারণা করল, কোন দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে ওরা।

বাকি আটজনও উত্তেজিত ও ব্যস্ত হয়ে উঠল। কয়েকজন ছুটে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতর। একটু পরই বেরিয়ে এল তারা, হাতে শটগান, মেশিন গান আর অ্যামিউনিশনের বাক্স।

আগন্তুকরা পাজেরোয় উঠল আবার। সাইটের লোকগুলো উঠল দুটো পিকআপ ট্রাকে। দিক বদলে পাহাড় থেকে দ্রুতবেগে নেমে যাচ্ছে পাজেরো, ট্রাক দুটো পিছু নিল। নিচে নেমে ফালামের রাস্তা ধরল ওগুলো।

ধুলোর মেঘ সরে যেতে সাইটে মাত্র তিনজন লোককে দেখতে পেল রানা। স্তম্ভের ওপর থেকে নেমে এসেছে সেন্ট্রি।

গাছ থেকে নেমে ব্যাগ থেকে জিনসের ট্রাউযার আর ক্যানভাস শু বের করে পরল রানা, গায়ে চাপাল নীল শার্টের ওপর লেদার জ্যাকেট। পিস্তল, গ্রেনেড ইত্যাদি ব্যাগ থেকে বের করে যেখানে যা রাখার রেখে পাহাড় থেকে নেমে এল। রাস্তা থেকে দূরে থাকল ও, একশো পাঁচ নম্বর সাইটের দিকে যাচ্ছে। গাছপালা ও ঘন ঝোপ এড়িয়ে যেতে হচ্ছে, হাঁটার গতি তাতে কমে এলেও ভাল আড়াল পাওয়া যাচ্ছে।

সাইটটা সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে রানা, আরেকবার স্মরণ করল সব। দশ বছর আগে ব্রিটিশ আর্কিওলজিকাল সোসাইটির সদস্য ড. মুহিত হায়দারের তত্ত্বাবধানে এই পাহাড় কাটা হয়। মায়ানমার আর্কিওলজিকাল সোসাইটির রেকর্ড বুকে বলা হয়েছে, একশো পাঁচ নম্বর সাইটে প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের কিছু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি। ড. মুহিত হায়দার নিখোঁজ হবার পর প্রজেক্টটা সরকার বাতিল ঘোষণা করে।

ইয়ানগনের আন্ডারগ্রাউন্ড থেকেও কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে রানা। প্রজেক্ট বাতিল ঘোষণা করার পর সরকারের উচিত ছিল আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, কিন্তু কি কারণে কে জানে তা করা হয়নি। খালি পড়ে

থাকার সুযোগে একটা গ্যাঙ একশো পাঁচ নম্বর সাইট দখল করে নেয়। পাজোরো জীপের আরোহীরা সেই গ্যাঙেরই সদস্য।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চূড়ায় উঠে এল রানা। ভাঙা প্রাচীর, বিধ্বস্ত মন্দিরের অংশ ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে প্রাচীন শহরের চৌরাস্তায়। আড়াল নিয়ে এগোতে রানার কোন সমস্যা হচ্ছে না।

আড়াল থেকেই দেখতে পেল সেন্ট্রি আর তার দুই সঙ্গী সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। হোলস্টার থেকে বের করে পিস্তলটা হাতে নিল রানা। ওরা কি বলাবলি করছে শুনতে পেলে অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত, কিন্তু এখুনি ঝুঁকি নিয়ে আরও কাছে যেতে রাজি নয় ও।

মিনিট পাঁচেক পর লোকগুলোর উত্তেজিত আলোচনা থামল। স্তম্ভের মাথায় তার পোস্টে ফিরে যাচ্ছে সেন্ট্রি। বাকি দু'জন ঢুকল বাড়ির ভেতর।

সেন্ট্রি বিশ-বাইশ বছরের তরুণ, মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। গলা থেকে বিনকিউলার আর কাঁধ থেকে রাইফেল ঝুলছে।

সরু একটা পথ দেখতে পাচ্ছে রানা, বারান্দার ভাঙা একটা পাঁচিলের ভেতর দিয়ে এগিয়েছে। ফাঁকটার পাশে কয়েকটা পাথরের আড়ালে উবু হয়ে বসে থাকল ও। ওর অস্তিত্ব সম্পর্কে বেখেয়াল, ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে সেন্ট্রি।

ঝট করে সিধে হলো রানা, সেন্ট্রির মাথার পিছনে পিস্তল দিয়ে বাড়ি মারল।

নিষ্প্রাণ বোঝা হয়ে গেল তরুণ। টেনে তাকে পাঁচিলের আড়ালে নিয়ে এসে শোয়াল রানা। তারই বেল্ট খুলে হাত আর মোজা খুলে পা দুটো এক করে বাঁধল। ছুরি দিয়ে কাটা শার্টের ফালি মুখ বাঁধার কাজে লাগল। অন্তত এক ঘণ্টার আগে সেন্ট্রির জ্ঞান ফিরবে না, তবু রানা কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। সেন্ট্রির রাইফেলটা একটা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রাখল ও।

বাড়িটার পিছন দিকে চলে এল রানা। পিছনের দেয়ালে বড় একটা জানালা দেখা যাচ্ছে। জানালায় গরাদ বা কাঁচ নেই, শুধু মশা-মাছি ঠেকাবার জন্যে তারের জাল লাগানো আছে, তাও ছেঁড়া। জানালার ভেতর ছায়ামূর্তি হাঁটাচলা করছে, তবে কেউ তারা বাইরে তাকাচ্ছে না।

আকাশের গায়ে ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটা উচিত হচ্ছে না, ক্রল করে বাড়িটার সামনের দিকে চলে এল রানা।

বাড়িটা রাস্তার দিকে মুখ করা। সামনের ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে জীপটা। বাড়ির দরজার পাশে, বেশ খানিকটা ওপরে, ছোট একটা জানালা দেখা যাচ্ছে। বাড়ির ভেতর কিভাবে ঢোকা যায় ভাবছে রানা, এই সময় দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল এক লোক।

লম্বা-চওড়া কাঠামো, চোখে-মুখে হিংস্র ভাব, দু'কোমরের হোলস্টারে দুটো সাইডআর্ম। কয়েক পা হেঁটে এসে একটা ঝোপের সামনে দাঁড়াল, ট্রাউজারের চেইন খুলছে।

লোকটাকে হালকা হওয়ার সময় দিল রানা। ঠিক যখন চেইন লাগাচ্ছে, অনুভব করল খুলির পিছন দিকে শক্ত কি যেন ঠেকল। 'একদম চুপ!' হিস হিস

করল রানা, পিস্তল দুটো হোলস্টার থেকে তুলে নিয়ে ঝোপের দিকে ছুঁড়ে দিল।

'সাপ কোন শব্দ করে না। পিছন থেকে ছোবল মারে,' হঠাৎই যেন দার্শনিক হয়ে পড়ল লোকটা।

'শ্-শ্-শ্।'

'তবে তুমি বোধহয় কামড়াবে না। কি চাই?'

'ঠিক ধরেছ। তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই,' বলল রানা। 'চলো, ভেতরে ঢুকি।'

বন্দীকে নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকল রানা।

চোদ্দ

'মাইয়ো মিন, জলদি! দেখো কি ঘটছে ওখানে!'

উপত্যকার আরেক প্রান্তে এটাও একটা পাহাড়। চূড়ায় দাঁড়িয়ে একশো পাঁচ নম্বর সাইটের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা, খেয়াল নেই তার বিনকিউলারের লেন্সে লেগে প্রতিফলিত রোদ অনেক দূর থেকে দেখা যাবে।

রানার মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে সেন্ট্রি, তা না হলে লোকটার অস্তিত্ব তার চোখে ঠিকই ধরা পড়ত।

'কি ব্যাপার, থান্ট?' জিজ্ঞেস করল মিন।

'নিজেই দেখো,' বলে বিনকিউলারটা মিনের হাতে ধরিয়ে দিল থান্ট।

একশো পাঁচ নম্বর সাইটের দিকে তাকাল মিন। হাতুড়ির একজন সদস্যকে চিনতে পারল সে, কিন্তু তার পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। 'কে ও? আমাদের কোন লোক বলে তো মনে হচ্ছে না!'

বন্দীকে নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটছে লোকটা। মুহূর্তের জন্যে ঘাড় ফেরাল সে, বিনকিউলারের লেন্সে এবার তার মুখ ধরা পড়ল।

'কি সাংঘাতিক!' আঁতকে উঠল মিন। বিনকিউলার নামিয়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াল। 'ও তো মাসুদ রানা!' আবার চোখে বিনকিউলার তুলল সে, তবে ইতিমধ্যেই বন্দীকে নিয়ে বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে রানা।

'মাসুদ রানা? ওই শালাই নান তুংকে খুন করেছে?' জানতে চাইল থান্ট। 'কিন্তু এখানে কি করছে ও?'

হঠাৎ হাসল মিন। 'ওর দুর্ভাগ্যই ওকে এখানে টেনে এনেছে।'

'কিন্তু বস্ বললেন হাতুড়ির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে লোকটা। তাহলে ওদের একজনকে পিস্তল ঠেকিয়েছে কেন?'

'তা জেনে আমাদের দরকার কি! আমরা শুধু জানি, মাসুদ রানা আমাদের কাজ পানির মত সহজ করে দিচ্ছে।' হাঁক-ডাক ছেড়ে দলের পিস্তলবাজ লোকদের জড়ো করল মিন। 'এখুনি রওনা হচ্ছি আমরা। সবাই তৈরি হয়ে নাও।

মনে থাকে যেন, হামলা শুরু হলে কারও কোন গাফিলতি বা গা-বাঁচানো ভাব আমি সহ্য করব না। ওদের আস্তানার প্রতিটি কুকুর খুন হওয়া চাই।' পকেট থেকে একটা হ্যান্ড গ্রেনেড বের করল মিন। 'সবাইকে বলে দাও, হামলায় আমি নেতৃত্ব দেব।'

বন্দীর নাম উনু। বাড়ির ভেতর তার সঙ্গীর নাম তুতুপাই।

ওরা এক লোককে আটকে রেখেছে। তার নাম জা জা থুনপুন।

তিনজনকেই দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করল রানা, নিজে একটা চেয়ারে বসল। পিস্তলটা কারও দিকে তাক করেনি, কোলের ওপর ফেলে রেখেছে।

উনু গম্ভীর ও চুপচাপ। তুতুপাই নার্ভাস।

'আপনার পরিচয়?' প্রশ্নটা তুতুপাইই করল।

'তোমরা না, প্রশ্ন করব আমি,' বলল রানা। 'তোমাদের লোকজন তাড়াহুড়ো করে কোথায় গেল?'

'নাচ-গান হবে, তাই মেয়ে আনতে গেছে,' জবাব দিল উনু। 'চিন্তা কোরো না, এখুনি সবাই ফিরে আসবে।'

'তোমরা সত্যি কথা বলছ না। আমাকে দাওয়াত দিয়ে অন্য কাজে চলে গেল–তাও মেয়ে আনার মত একটা কাজে?' মাথা নাড়ল রানা।

উনু আর তুতুপাই দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করল। তুতুপাইকে দেখে মনে হলো, হঠাৎ তার চোখের ঝাপসা ভাবটা কেটে গেছে। 'চিনি! আপনাকে আমি চিনি! আপনি মাসুদ রানা! এই ব্যাটা, উনু, ওঁর কথাই তো চুয়ান আমাদেরকে বলেছে।'

'কিন্তু চুয়ান কি এ-কথা বলেছিল যে মাসুদ রানা আমার অস্ত্র কেড়ে নেবে?'

'এখন যখন বোঝা যাচ্ছে পরস্পরের বন্ধু আমরা, উনি নিশ্চয়ই তোর পিস্তল দুটো ফেরত দেবেন।' দেয়াল থেকে পিঠ তুলে রানার দিকে পা বাড়াল তুতুপাই।

'না,' বলল রানা। 'জায়গা ছেড়ে নড়বে না।'

'আমরা বন্ধু, এটা আপনি স্বীকার করেন না?' জিজ্ঞেস করল তুতুপাই, রীতিমত আহত দেখাচ্ছে তাকে। 'ভেবে দেখুন না, বন্ধু না হলে আপনার জন্যে ওকে ধরে আনতাম?' ইঙ্গিতে জা জা থুনপুনকে দেখাল সে।

'ওর কথা পরে,' বলল রানা। 'আগে নিজেদের পরিচয় দাও।'

'আমরা হাতুড়ি!' সগর্বে বলল তুতুপাই।

'তারমানে কি তোমাদের পেশা পেরেক ঠোকা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমরা হাতুড়ি–কথাটার মানে কি?'

তুতুপাই হতভম্ব। 'কি আশ্চর্য, আপনি আমাদের কথা শোনেননি?'

রানা চুপ করে থাকল।

'আরে, ধ্যাত আমরাই তো ভুল করছি!' হাসছে তুতুপাই। 'কিভাবে শুনবেন, আপনি বিদেশী না!'

'বিদেশী স্পাই,' বিড়বিড় করল উনু।

'তুই চুপ থাক, উনু!' সঙ্গীকে ধমক দিয়ে রানার দিকে ফিরল তুতুপাই। 'আমরা হাতুড়িরা অসাম্প্রদায়িক ও দেশপ্রেমিক দস্যু।'

হেসে ফেলল রানা।

'হাসবেন না, স্যার, হাসবেন না! আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। সত্যি আমরা অসাম্প্রদায়িক। আমাদের দলে সব ধর্মের ডাকাত আছে। জিজ্ঞেস করবেন আমরা দেশপ্রেমিক হলাম কিভাবে? শুনুন, আমরা মায়ানমার-ভারত সীমান্ত এলাকায় ডাকাতি করি, কিন্তু চোরাচালানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখি না। ভারতের বিচ্ছিন্নবাদীরা চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত তাই ওদেরকে আমরা ঘৃণা করি। ওদেরকে সাহায্য করে আইএসআই, তাই পাকিস্তানী স্পাইদেরও আমরা ঘৃণা করি। আর কমিউনিস্টদের দু'চোখে দেখতে পারি না, কারণ মুখে বিরোধিতা করলেও তলে তলে সামরিক স্বৈরশাসককে সাহায্য করে ওরা। এ-সব কথা থাক, স্যার। আপনার জন্যে ওই ব্যাটাকে ধরে এনেছি, আপনার যা জানার জেরা করে জেনে নিন।'

বন্দী লোকটার বয়স হবে প্রায় পঞ্চাশ। ধুলোময়লা লেগে থাকলেও তার কাপড়চোপড় বেশ দামী। যতটা না সন্ত্রস্ত তার চেয়ে বেশি বিষণ্ন দেখাচ্ছে তাকে।

রানা তার নাম উচ্চারণ করল, 'জয়ে-জয়ে থুনপুন।'

'আপনি আমার নাম জানলেন কিভাবে?' ম্লান গলায় জিজ্ঞেস করল থুনপুন। 'এরা আমাকে শুধু শুধু ধরে এনেছে। আপনি কি ওদের হাত থেকে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন?'

সরাসরি জবাব না দিয়ে রানা বলল, 'মি. থুনপুন, আমি আপনার ফাইল পড়েছি। ফালাম ড্যাম অ্যান্ড রেলরোড প্রজেক্টের একজন এঞ্জিনিয়ার ছিলেন আপনি।'

'ওই বাঁধ এখনও আমার কাছে একটা দুঃস্বপ্ন!' ধীরে ধীরে থুনপুনের মাথা নুয়ে এল। 'এখন মনে হয় ওই নোংরা টাকা নেয়ার বদলে নিজের হাতটা কেন কেটে ফেলিনি!'

'কে আপনাকে টাকা দিল? কেন দিল?'

'আমার ভাগটা আমি চীফ এঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে পাই। রেলরোড আর ড্যামসাইট ছেড়ে বাইরে বেরুনো নিষেধ করে দেয়া হয়, ফলে চীফ এঞ্জিনিয়ার কোত্থেকে টাকা নিয়ে এল তা আমি বলতে পারব না। তবে গুজব শুনছিলাম পাকিস্তানী এঞ্জিনিয়াররাই মার্কিন আর তাইওয়ানী আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা আনছে।'

'কিসের বিনিময়ে আপনাকে টাকা দেয়া হলো?'

'মুখ বন্ধ রাখার বিনিময়ে।'

'কোন বিষয়ে?'

'বিষয় যদিও দুটো ছিল, তবে আমরা স্থানীয় এঞ্জিনিয়াররা একটার সঙ্গে জড়িত ছিলাম—ড্যাম ও রেলরোড।'

'কি কি গোপন তথ্য জানতেন আপনি?'

'রড, সিমেন্ট, ইট, বালি—অর্থাৎ ড্যাম তৈরির জন্যে যা যা দরকার সবই নিম্নমানের সাপ্লাই দেয়া হচ্ছিল। অদ্ভুত এক কৌশলে সংশ্লিষ্ট সবাইকে খুশি রাখছিল্ পাকিস্তানী এঞ্জিনিয়াররা। কর্মবিরতিতে উৎসাহ দিয়ে শ্রমিকদের মজুরি বাড়াবার ব্যবস্থা করে তারা। ঠিকাদারদের বিল পরিশোধের সুপারিশ করে কাজের মান পরীক্ষা না করেই। সাপ্লাইয়ারদের কাছ থেকে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে দাম মেটানো হয় উন্নতমানের। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বশে রাখে মেয়েমানুষ আর মদ যুগিয়ে। ফলে কেউ তারা মুখ খোলেনি। সত্যি কথা বলতে কি, রোহিঙ্গা গেরিলারা ডিনামইট দিয়ে ড্যামটা উড়িয়ে দেয়ায় আমার চেয়ে খুশি কেউ হয়নি…'

'কেন?'

'কারণ, বর্ষা মরশুম শুরু হলে এমনিতেই ওটা ভেঙে যেত। তাতে ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা ঠেকানো যেত না।'

'ড্যাম ভেঙে যেত, এটা আপনার প্রফেশনাল অভিমত?'

'ফালাম ড্যামের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যায় কাজে হাত দেয়ার পরপরই। কোনও অবস্থাতেই ওটা কয়েক মাসের বেশি টিকত না।'

'দেখা যাচ্ছে দরকারী অনেক তথ্যই আপনি পাচ্ছেন, স্যার,' বলল তুতুপাই। 'ঘুষখোর বেঈমানটাকে বাঁচিয়ে রেখে আমরা আপনার উপকারই করেছি, তাই না?'

'সম্ভবত,' বলল রানা। 'এতে তোমাদের কি স্বার্থ?'

'স্বার্থ? কোন স্বার্থ নেই! বললাম না, দস্যু হলেও আমরা দেশপ্রেমিক।'

'ওর একটা কথাও আপনি বিশ্বাস করবেন না,' বলল থুনপুন। 'ওরা অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির গুণ্ডা ছাড়া আর কিছু নয়।'

'চোপ, শয়তানের ধাড়ী!' খেঁকিয়ে উঠল উনু। 'আর একটা কথা বলবি তো হাত-পা গুঁড়ো করে ফেলব।'

'তোমাদের বাকি লোক ওরকম ব্যস্তভাবে কোথায় গেল?' তুতুপাইকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঠিক আছে, বলছি।' তুতুপাইকে গম্ভীর দেখাল। 'বস্ যখন আপনাকে সাহায্য করতে চান, আপনাকে সত্যি কথাই বলা উচিত। মাওপন্থী কমিউনিস্ট গুণ্ডারা ফালামে আমাদের মূল আস্তানায় হামলা চালিয়েছে। খবর পেয়ে যুদ্ধ করতে গেছে ওরা।'

চেয়ার ছেড়ে রানা দাঁড়াল।

বোকার মত মুখ চাওয়াচাওয়ি করল উনু আর তুতুপাই। তারপর তুতুপাই বলল, 'আপনি কোথাও যাচ্ছেন, স্যার?'

'বাইরে একটা জীপ দেখলাম,' বলল রানা। 'চাবি আছে?'

'তা আছে, কিন্তু…'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে যেতে হবে,' বলল রানা। 'তোমাদের ফালাম আস্তানায় হামলাটা ডাইভারশান হতে পারে—থুনপুনের কাছ

থেকে তোমাদের লোকজনকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে।'

'সর্বনাশ! চলুন পালাই!'

উনু আর তুতুপাই দরজার দিকে ছুটল। আগে পৌঁছাল উনু, হ্যাঁচকা টান দিয়ে কবাট খুলে ফেলল সে।

একটা হাই-পাওয়ার্‌ড় বুলেট তার বুকে আঘাত করল। পিঠ থেকে বিস্ফোরিত হলো রক্ত, মাংস আর হাড়।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে কবাটে লাথি মারল তুতুপাই, দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কবাট ফুটো করে কয়েকটা বুলেট ঢুকল ভেতরে, পাথরের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ছুটোছুটি করল কিছুক্ষণ।

ঘরের এক কোণে সরে গেল থুনপুন, চোখ বুজে হাত দিয়ে কান ঢেকে রেখেছে। ঠোঁটের কাঁপুনি থামাতে পারছে না।

বাড়ির পিছন থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। 'মাসুদ রানা, এটা তোমার জন্যে!'

জানালার ছেঁড়া জাল গলে কিছু একটা ঢুকল ঘরে, ঠক করে পড়ল মেঝেতে। জিনিসটা স্থির হবার আগেই চিনতে পারল রানা।

পিন খোলা গ্রেনেড।

বাঁচার মাত্র একটা পথই খোলা দেখল রানা। পিছনের জানালা লক্ষ্য করে লাফ দিল।

প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড।

জানালার বাইরে মাটিতে পড়ল রানা, শরীরটাকে গড়িয়ে দিতে সরাসরি ঢাল বেয়ে নেমে এল একটা গর্তে।

গ্রেনেড ছোঁড়ার পর এই গর্তেই কাভার নিয়েছে মাইয়ো মিন। রানাকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'তুমি!'

এখনও পিস্তলটা ধরে আছে রানা। সেটা লক্ষ্য করে ছোঁ মারল মিন। পিস্তল সরিয়ে নিল রানা। মিন ওর কব্জি মুঠোয় নিয়ে মাটিতে চেপে ধরল, খালি হাতের আঙুল চালাল চোখ লক্ষ্য করে।

ঝট করে মাথা নামাল রানা। মিনের ধারাল নখ রক্তাক্ত রেখা তৈরি করল কপালে।

ঘুসি মেরে প্রথমে মিনের নাকটা ভেঙে দিল রানা। মুঠোয় ঢিল পড়তে পিস্তল ধরা হাত মুক্ত করল, মাজল ঠেকাল মিনের পাঁজরে, তারপর ট্রিগার টেনে দিল।

শব্দটা ভোঁতা শোনাল। মাজল ফ্লেয়ার লাশের শার্ট পুড়িয়ে দিয়েছে।

একটা গড়ান দিয়ে মিনের কাছ থেকে সরে এল রানা। পরমুহূর্তেই এক রাশ ধুলো উড়ল, বুলেটটা পড়েছে ওর মাথার মাত্র তিন ইঞ্চি দূরে।

থান্ট দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটার কোণে, দ্বিতীয়বার গুলি করার আগে সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করছে।

শরীরটা রানা অকস্মাৎ উল্টোদিকে গড়িয়ে দিল, ফলে থান্টের দ্বিতীয় গুলিটাও লাগল না। দ্বিতীয় বার ব্যর্থ হয়ে থান্ট বিস্মিত, এই সুযোগে পিস্তল ধরা

হাতটা লম্বা করে ট্রিগার টানল রানা।

পায়ে গুলি খেয়ে হাঁটুর ওপর খাড়া হলো থান্ট। রানার দ্বিতীয় বুলেট তার বুকে লাগল।

পাথরের কড়ি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। রানা জানে থুনপুন আর তুতুপাইয়ের কোন সাহায্য দরকার নেই। ছোট একটা ঘরে গ্রেনেড ফাটার পরও কেউ যদি বেঁচে থাকে, সেটা তার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে।

অগভীর গর্তটা বাড়ির সঙ্গে সমান্তরাল রেখা ধরে এগিয়েছে। ক্রল করে দশ গজ আসার পর মাথা তুলল রানা।

ছ'জন সশস্ত্র লোকের একটা অর্ধবৃত্ত বাড়িটার দিকে এগোচ্ছে। ওরা অ্যাডভান্সড টীম। আক্রমণকারীদের মূল শক্তি দুটো গাড়িতে ভাগ হয়ে আছে। একটা গাড়ি চূড়ায় ওঠার অর্ধেক পথ পার হয়ে এসেছে। দ্বিতীয় গাড়িটা নিচে, উপত্যকায়, একশো পাঁচ নম্বর সাইট সীল করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রানার ব্যাগটা বাড়ির ভেতর। ছ'টা গ্রেনেড আর পিস্তলের জন্যে চারটে স্পেয়ার ক্লিপ আছে তাতে। পিস্তলে এখন মাত্র পাঁচ রাউন্ড গুলি। ছুরিটা ডান বাহুর সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো। খুদে বোমাটা উরুর ভেতর দিকে, টেপ খুললেই চলে আসবে হাতে।

থান্ট আর মিনই শুধু রানাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে।

এদিকে গর্তটা ছাড়া গা ঢাকা দেয়ার মত আর কিছু নেই। নিজের উপস্থিতি প্রকাশ না করে পিছনের ধ্বংসাবশেষ বা দু'পাশের জঙ্গলের দিকে নেমে যাওয়া সম্ভব নয়। শত্রুদের হাতে শুধু হ্যান্ডগান থাকলে দৌড়াবার একটা ঝুঁকি নিতে পারত। কিন্তু ওদের প্রায় সবার হাতেই রাইফেল দেখা যাচ্ছে।

টেপ খুলে উরু থেকে মিনি-গ্রেনেডটা নিয়ে পকেটে রাখল রানা।

জীপটা ওর কাছ থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে। অ্যাডভান্স টীমের কেউই সেদিকে তাকাচ্ছে না। সবার মনোযোগ বাড়ির দিকে, বিস্ফোরণের পরও কেউ বেঁচে থাকতে পারে ভেবে উদ্বিগ্ন।

মিনি-গ্রেনেড বের করে লাল বোতামে চাপ দিল রানা। গর্ত থেকে উঠে জীপ লক্ষ্য করে ছুটছে।

রাইফেলধারীদের একজন চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল। ঝট করে ঘুরে চিৎকার দিয়েই গুলি করল সে।

প্রথম গুলিটা অল্পের জন্যে লাগল না। লোকটা দ্বিতীয়বার গুলি করার আগেই খুদে গ্রেনেডটা ছুঁড়ে দিল রানা। এঁকেবেঁকে ছুটল, বুলেটগুলো কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। একটা বুলেট দুই পায়ের ফাঁকে ধুলোর বিস্ফোরণ ঘটাল।

রানা বাঁক নিল, গড়িয়ে দিল শরীরটা, সিধে হয়ে আরেক দিকে ছুটল। শেষ আরেকবার দিক বদলে পৌঁছে গেল জীপের কাছে।

বুম করে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রানা আর অ্যাডভান্সড টীমের মাঝখানে কালো ধোঁয়ার মেঘ তৈরি হলো।

দেখতে না পেলেও গুলি করছে ওরা।

মাথা নিচু করে জীপে চড়ল রানা। ড্যাশবোর্ডের তলাটা হাতড়াল, ইগনিশন ওয়্যারগুলো পেয়ে ছিঁড়ে বের করে আনল বাইরে।

বোকার মত সাহস দেখাতে গিয়ে কালো ধোঁয়া থেকে ছুটে বেরিয়ে এল এক লোক। কাশছে, বলা যায় আধ কানা, গুলি করছে শূন্যে।

তার লোকেরা ধোঁয়ার ভেতর থেকে গুলি করছে, ছুটে আসা একটা গুলির পথ আটকাল সে। পড়ে গেল, তবে মারা যায়নি। মারা গেল রানার গুলিতে।

আবরণ থেকে বেরিয়ে আসা তামার দুটো তার এক করল রানা। আগুনের ফুলকি ছুটল ঠিকই, কিন্তু ওই পর্যন্তই।

হোঁচট খেয়ে আরেক লোক ধোঁয়া থেকে বেরুল। রানার গুলি খেয়ে ছিটকে পড়ল, গোঙাচ্ছে আর মোচড় খাচ্ছে।

তার দুটো আবার এক করল রানা। এঞ্জিন স্টার্ট না নিলে লাফিয়ে নেমে ঝেড়ে দৌড় দেবে।

এঞ্জিন কাশল। রানা থ্রটল খুলতে জ্যান্ত হয়ে উঠল মোটর। গিয়ার দিয়েই ক্লাচ ছেড়ে দিল ও। লাফ দিয়ে ছুটল জীপ।

পিছন থেকে গুলি হলো। রিয়ার প্যানেলে কয়েকটা ফুটো তৈরি হলো।

পেঁচানো রাস্তা থেকে সমতল চূড়ায় উঠে এল শত্রুপক্ষের গাড়ি, নাক বরাবর জীপের দিকে আসছে। এক হাতে স্টিয়ারিং, রানার অপর হাতে পিস্তল। সামনের গাড়ি এত কাছে, ফ্রন্ট সীটের আরোহীদের হাঁ করা মুখ দেখা যাচ্ছে। দু'বার ট্রিগার টানল রানা।

একটা গুলি লাগল। উইন্ডশীল্ড ভেদ করে ড্রাইভারের কপাল ফুটো করে দিয়েছে। পরমুহূর্তে গাড়িটা যেন খেপে গেল।

রাস্তাটা চূড়ার কিনারা ঘেঁষা। ড্রাইভারের পাশের লোকটা হুইল ধরে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে চাইল। কিন্তু পারল না।

কিনারা থেকে লাফ দিল গাড়িটা। কয়েক মুহূর্ত শূন্যে থাকার পর ঢালের ওপর পড়ল সেটা, তারপর ডিগবাজি খেতে খেতে তিনশো ফুট নিচের জঙ্গলে নেমে গেল, যাবার পথে যেখানে খুশি ফেলে দিয়ে গেছে আরোহীদের।

পিস্তল হোলস্টারে রেখে দু'হাতে হুইল ধরল রানা। আর মাত্র একটা বুলেট আছে।

পাহাড় পেঁচানো সরু রাস্তা ধরে নিচে নামছে জীপ।

পাহাড়ের নিচে অপেক্ষা করছে প্রকাণ্ড একটা কালো মার্সিডিজ। ওটার পাশেই অপেক্ষা করছে পাঁচজন সশস্ত্র খুনী। অর্ধেক পথও নামেনি জীপ, টার্গেট প্র্যাকটিস শুরু করে দিল তারা।

রানাকে নিচের রাস্তাতে নামতে হবে, তবে এমন কোন কথা নেই যে রাস্তা দিয়েই। পুরো এক পাক বাকি থাকতে রাস্তা ছেড়ে ঘাস মোড়া ঢালে নেমে এল জীপ, ঘন ঘন জোর ঝাঁকি দিয়ে রানাকে ফেলে দিতে চাইল, নিজেও উল্টে পড়ার উপক্রম করল। ভাগ্য ভাল যে কোনরকম দুর্ঘটনা ঘটার আগেই নিচের রাস্তায়,

কালো মার্সিডিজের কাছ থেকে ত্রিশ গজ দূরে, প্রায় একটা প্লেনের ভঙ্গিতে ল্যান্ড করল জীপ। নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে যা দেরি, পুবদিকে ছুটল রানা। ম্যাপ দেখা আছে, কাজেই জানে যে ওদিকে ইরাবতী নদী পড়বে। তা পড়ুক, নদীর ওপর গত বছর একটা ব্রিজও বানানো হয়েছে।

কালো মার্সিডিজ ধাওয়া করল জীপটাকে।

পনেরো

রাস্তা কাঁচা, তবে জীপটা খুবই শক্ত আর মজবুত। তাছাড়া, মার্সিডিজটা এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। রানা খুব একটা চিন্তিত নয়।

কিন্তু তারপরই গ্যাসের গন্ধ ঢুকল নাকে।

আধঘণ্টা জীপ ছুটিয়ে কয়েকটা পাহাড়কে পাশ কাটিয়েছে রানা, সামনে এখন খোলা উপত্যকা। আরও সামনে নদী। নদীর ওপারে ছোট একটা শহর, শহরের এক ধারে লম্বা রেললাইন।

ট্রেনটা এত দূরে, খেলনার মত লাগছে। অলস গতিতে এগিয়ে আসছে শহরের দিকে।

গ্যাসের ঝাঁঝ আরও বাড়ছে। এঞ্জিনে ছন্দপতন ঘটল, যেন কাশতে চায়।

পিছন দিকে তাকাল রানা। গ্যাস ট্যাংক ফুটো হয়নি, চিড় ধরেছে সামান্য। চুইয়ে চুইয়ে বেরুচ্ছে।

দূরের মার্সিডিজ কাছে চলে আসছে।

ঘাড় সোজা করে ব্রিজের দিকে তাকাল রানা। সরু, কাঠের ব্রিজ; এত সরু যে প্রতিবার মাত্র একটা গাড়ি পার হতে পারবে।

ব্রিজের ঠিক মাঝখানে জীপ থামিয়ে নেমে পড়ল রানা।

স্টেশনটা ব্রিজের কাছ থেকে বেশি দূরে নয়। একদল দেহাতী নারী-পুরুষ কৌতূহলী চোখে দেখছে ওকে। শার্টের নিচের দিকটা টেনে ছিঁড়ে ফেলল রানা। টুকরোটা ফুয়েলে ভেজাল, তারপর গ্যাস ট্যাংকের ক্যাপ খুলে গুঁজে দিল ভেতরে।

মার্সিডিজ আর মাত্র একশো গজ দূরে।

লাইটার জ্বালল রানা। শার্টের ছেঁড়া টুকরোয় আগুন ধরাল। দপ করে জ্বলে উঠল ওটা। রানা ছুটছে।

তিনবার হুইসেল দিল ট্রেন, স্টেশনে পৌঁছাতে যাচ্ছে।

ব্রিজে উঠল মার্সিডিজ, ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আগুনটা গ্যাস ট্যাংকের ভেতর পৌঁছাল। খুব বেশি ফুয়েল নেই, কাজেই দর্শনীয় কোন বিস্ফোরণ ঘটল না। তবে জীপটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সেই সঙ্গে ব্রিজের পাটাতনেও ধরে গেল আগুন।

মার্সিডিজের কেউ একজন চিৎকার করে এগোবার হুকুম দিল, কিন্তু আর

সবাই রাজি হলো না। গাড়ি থেকে নেমে রানাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে তারা।

ব্রিজ পার হয়ে একটা চওড়া গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিল রানা, উঁকি দিয়ে মার্সিডিজের দিকে তাকাল। গাড়িটার পাশে পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছে ওরা। দু'জনকে চিনতে পারল ও।

হ্নিনান ফো আর চো মাউং।

আগুন দেখে হাসছে মাউং। দলকে পিছনে ফেলে জ্বলন্ত জীপের দিকে এগোল সে। কেউ কোন প্রশ্ন করল না বা বাধাও দিল না।

জীপের পাশে ফাঁকা জায়গা খুব সামান্যই, পাটাতনে আগুন লাগায় সেটাকে এখন আর ফাঁকাও বলা চলে না।

সোজা হেঁটে এসে আগুনের ভেতর লাফ দিল মাউং। জীপের পাশে নাচানাচি করছে কমলা অগ্নিশিখা, তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল লম্বা-চওড়া, দৈত্যাকার খুনীটাকে। মার্সিডিজের আশপাশ থেকে প্রশংসাসূচক ধ্বনি ভেসে এল।

মাউঙের এক হাতে পিস্তল। খালি হাত দিয়ে শার্ট ও ট্রাউজারে চাপড় মারল সে। সামান্য ধোঁয়া বেরুচ্ছিল, এখন আর বেরুচ্ছে না।

মাউং যখন মাত্র পনেরো গজ দূরে, গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করল রানা। এই একটাই বুলেট আছে, কাজেই মিস করা চলবে না।

হাসছিল মাউং, রানাকে দেখে গুলি না করে ধরার জন্যে ছুটল। হাসিটা আরও যেন চওড়া হলো তার। লম্বা কিলিং মেশিনটাকে যেন মরণ-নেশায় পেয়েছে।

ট্রিগার টেনে দিল রানা।

মেকানিজম কোথাও জ্যাম হয়ে গেছে। দ্রুত আরও কয়েকবার ট্রিগার টেনেও গুলিটাকে বের করা গেল না।

পিস্তল ছুঁড়ে ফেলে দিল রানা।

ব্রিজ থেকে নেমে এল মাউং। রানার দেখাদেখি সে-ও একপাশে ফেলে দিল হাতের পিস্তল। 'তোমার সঙ্গে আমি খালি হাতে লড়ব,' বলে হেসে উঠল সে।

ব্রিজের পাশে নরম ঘাসজমি। আক্রমণাত্মক ভঙ্গি নিয়ে তৈরি হলো রানা। আবছাভাবে খেয়াল করল স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্রেন।

'মারি, হ্যাঁ?' বলেই ছুটে এল মাউং। হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিল সে, যেন রানার গলা ধরাই তার উদ্দেশ্য।

হাত দুটোকে এড়াবার জন্যে এক পাশে লাফ দিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু ঠিক সেদিকেই পা চালাল মাউং।

লাথিটা খেয়ে পাঁচ হাত দূরে ছিটকে পড়ল রানা। চোখে সর্ষে ফুল দেখছে। যদিও বিস্ময়ের আঘাতটাই বেশি অনুভব করছে।

'হে-হে,' হাসতে হাসতে আঙুল নাচাল মাউং, খাড়া হয়ে আবার লড়াইয়ে ফিরে আসতে বলছে রানাকে।

দুর্বল বা আহত নয়, এটা বোঝাবার জন্যে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে সিধে

হলো রানা।

আবার সেই একই ভঙ্গিতে, দুই হাত সামনে বাড়িয়ে ছুটে আসছে মাউং।

এবার রানা সরল না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। মাউঙের বোকা বোকা হাসিটা সামান্য হলেও বিরক্ত করছে ওকে।

হাত দুটোর লক্ষ্য গলা, বুঝতে পেরে একেবারে শেষ মুহূর্তে কুঁজো হয়ে গেল রানা, ইচ্ছা মাথা দিয়ে শত্রুর পেটে গুঁতো মারবে।

অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সাথে চোখের পলকে একপাশে সরে গেল মাউং; টার্গেট হারিয়ে রানা যখন হোঁচট খেয়ে পড়তে যাচ্ছে, পিছন থেকে আর একটা লাথি কষল ওর নিতম্বে।

ভাল করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই রানা দেখল ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে ও। এভাবে উড়ে এসে পড়ার পরও হাড়গোড় কেন ভাঙেনি সেটাই আশ্চর্য। লোকটা বোকামি করেই হোক বা অলস বলেই হোক, পড়ে যাবার পর রানার ওপর চড়াও হচ্ছে না; হলে কি ঘটত বলা যায় না।

আবার সেই আগের মত আঙুল বাঁকা করে লড়াইয়ে রানাকে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছে মাউং।

ধীরেসুস্থে সিধে হলো রানা। প্রচণ্ড রাগে শরীর থেকে যেন ভাপ বেরুচ্ছে।

প্রচলিত পদ্ধতিতে কাজ হবে না, এই লোকের সঙ্গে অন্যভাবে লড়তে হবে।

আক্রান্ত হবার জন্যে অপেক্ষায় না থেকে এবার নিজেই রানা আক্রমণ করল। মাউং হাত দুটো সারাক্ষণ সামনে রাখায় ঘুসি মারার সুযোগ নেই। ছুটে এসে লাফ দিল রানা, জোড়া পা মাউংয়ের তলপেটে নামাবে।

পিছিয়ে গেল মাউং, দক্ষ গোলকীপারের মত বুকে টেনে নিল রানাকে, তারপর স্বেচ্ছায় ঢলে পড়ল পিছনদিকে।

মাটিতে শুয়ে আছে মাউং, রানা তার বুকের ওপর।

দমাদম কয়েকটা ঘুসি মেরে মাউঙের নাকটা ফাটিয়ে দিল রানা, হঠাৎ শিউরে উঠে অনুভব করল ওর গলাটা দু'হাতে পেঁচাবার চেষ্টা করছে সে।

মাউঙের আঙুল অস্বাভাবিক লম্বা। গলাটা রক্ষা করার চেষ্টায় সেই আঙুলের ভেতর নিজের আঙুল জড়াল রানা, অকস্মাৎ বাইরের দিকে প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়ে দুই হাতের অন্তত চারটে আঙুল ভেঙে দিল। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল মাউং, প্রচণ্ড আক্রোশে গলা ছেড়ে দিয়ে রানার একটা চোখে কনুই গাঁথার চেষ্টা করল।

গলায় ঢিল পড়তে ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত লাফ দিল রানা। কিন্তু চোখের পলক ফেলারও সময় পেল না, লাফ দিয়ে সিধে হলো মাউংও। হাত দুটো বাতাসে ঝাড়ছে সে। মুখের সেই হাসিটা নেই। তবে আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে এগিয়ে আসছে আবার।

দীর্ঘ হুইসেল। স্টেশন ছেড়ে রওনা হলো ট্রেন।

মাউঙের পাশ ঘেঁষে রানার দৃষ্টি ব্রিজের দিকে চলে গেল। জীপের আগুন নিভে আসছে। মার্সিডিজের আরোহীরা সেটাকে এড়িয়ে ব্রিজের এপারে আসার চেষ্টা করছে।

দুটো লাথি খেয়ে রানার শরীরের জয়েন্টগুলো প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়েছে। নেহাত ভাগ্যই বলতে হবে যে কোনও হাড় ভাঙেনি। তবে ওরকম আরও একটা লাথি খেলে কি ঘটবে বলা যায় না। তাছাড়া, এই লোকের সঙ্গে খালি হাতে লড়তে যাওয়াটা বোধহয় বোকামিই হচ্ছে।

রানার সঙ্গে ছুরি আছে। কিন্তু মাউং এত কাছে চলে এসেছে যে সেটা বের করার সময় নেই। এরকম পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার জন্যে একটা কাজই করার থাকে।

ঝট করে ঘুরেই ছুটল রানা।

কেউ যদি বলে পালাচ্ছে, রানা স্বীকার করবে না। হ্যাঁ, এ-কথা সত্যি যে চো মাউঙের সঙ্গে গায়ের জোরে পারা কঠিন, প্রায় অসম্ভবই বলা যায়, তবে দলের আরও লোকজন তাকে সাহায্য করতে আসছে দেখে শক্তি পরীক্ষার সুযোগ থেকে বাধ্য হয়েই নিজেকে বঞ্চিত করল রানা। এমন কি একে রণে ভঙ্গ দেয়া বলতেও রাজি নয় ও। বড় জোর কৌশল বদল। চো মাউং সত্যি জড়বুদ্ধি বা হাবাগোবা কিনা, এই সুযোগে পরীক্ষা করে দেখতে চায়।

ট্রেন লাইন বদল করে উত্তর দিকে রওনা হয়েছে। রেললাইন আর নদী পাশাপাশি এগিয়েছে, দুটোর মাঝখানে পায়ে চলা সরু একটা পথ দেখা যাচ্ছে। ওই পথ ধরে ছুটল রানা। ওই রকম আরও একটা সরু পথ ট্রেনের উল্টোদিকেও আছে।

পিছিয়ে পড়ার ভান করতে হলো না, ঝড়ের বেগে ধাওয়া করে রানার ঠিক পিছনে চলে এল মাউং। রানা তার নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে।

ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল রানা। ট্রেনটা মালগাড়ি, প্রথমে হেলেদুলে ছুটলেও, গতি এখন ধীরে ধীরে বাড়ছে। কে কার আগে যেতে পারে, ট্রেনের সঙ্গে সেই প্রতিযোগিতা চলছে রানার।

তারপর ট্রেন ও রানাকে একসঙ্গে ছুটতে দেখা গেল, কেউ কারও চেয়ে পিছিয়ে নেই।

এদিকে রানার নাগাল পেতে যাচ্ছে মাউং। ভাঙা আঙুলের ব্যথা ভুলে আবার হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে সে। কিভাবে যেন মুখের সেই হাসিটাও ফিরে পেয়েছে বোকাটা। আর মাত্র এক গজ দূরত্ব কমিয়ে আনতে পারলেই রানার নাগাল পেয়ে যাবে।

ট্রেনকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল রানা। ও সামনে বাড়ছে, ট্রেন পিছিয়ে পড়ছে। রানার দেখাদেখি মাউংকেও গতি বাড়াতে হলো।

হঠাৎ দিক বদলে ট্রেনের সামনে, লাইনে উঠে পড়ল রানা। উঠে থামেনি, একলাফে লাইন টপকে অপর দিকে চলে এসেছে। রানার পিছু না ছেড়ে একই কাজ করতে গেল মাউং।

রানার সময়ের হিসাবটা ছিল চুলচেরা। লাইন টপকাতে ও যদি এক সেকেন্ড দেরি করত, ওকে পিষে ফেলত ট্রেন।

রানার চেয়ে এক সেকেন্ড পরে লাইনে উঠল মাউং। সংঘর্ষের শব্দ যদি হয়েও থাকে, এঞ্জিনের গর্জন আর চাকার ঘর্ষণ সেটাকে চাপা দিল।

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে রানার মনে হলো, লাইনের ওপর দ্বিখণ্ডিত, রক্তাক্ত, থেঁতলানো যে মাংসপিণ্ডটা পড়ে আছে সেটাকে মাউং বলে শনাক্ত করা অসম্ভব।

তার সঙ্গীরা কোথায় বা কি করছে দেখার জন্যে অপেক্ষা করল না রানা। আবার ছুটতে শুরু করে লাফ দিয়ে ট্রেনের একটা কার-এ উঠে পড়ল ও।

একটা ব্রিজ পার হয়ে ফালামে ঢুকল ট্রেন। আধঘণ্টা পর সামনে পড়ল ছোট একটা শহর। শহরে ঢোকার মুখে, একশো গজ দূরে রাস্তার ওপর কালো মার্সিডিজটাকে আবার দেখতে পেল রানা। হিনান ফো তার ডান হাতকে ট্রেনে কাটা পড়তে দেখেছে। এর জন্যে নির্ঘাত রানাকেই দায়ী ভাবছে সে। কাজেই প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

পাঁচশো গজ সামনে, একটা বাঁক ঘোরার পরই, দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন। কি ব্যাপার? না, লাল একটা পিকআপ ট্রাক লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

বাদামী রঙের পাজেরোটাকেও দেখতে পেল রানা। ওটা অপেক্ষা করছে ক্রসিং-এ। হাতুড়ির লোকজন পৌঁছে গেছে সদলবলে।

ট্রেনের ড্রাইভার ক্যাব থেকে মাথা বের করে তাকাল, বিরতিহীন হুইসেল বাজাচ্ছে। উত্তরে হাতুড়ির একজন সদস্য তার উদ্দেশে হাতের অস্ত্র নাড়ল।

মাথাটা ঝট করে ভেতরে টেনে নিল ড্রাইভার।

সশস্ত্র লোকজন লাইনের দু'ধারে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের একজন দেখতে পেল রানাকে।

পুরো দলটা ছুটে এল ওর দিকে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। কালো মার্সিডিজ রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এক মুহূর্ত পর ইউ টার্ন নিয়ে ফিরতি পথ ধরল সেটা।

ষোলো

এমনকি চূড়ান্ত বিশ্লেষণেও এ-দ্বন্দ্বের নিরসন হওয়া সম্ভব নয় যে জীবনে ভালর সংখ্যা বেশি নাকি মন্দের। আবার ভাল ও মন্দের সংজ্ঞা নিয়েও প্রবল মত-পার্থক্য আছে। তবে কেউ যদি মাসুদ রানাকে প্রশ্ন করে সুন্দরী নারী ও সুরা সম্পর্কে ওর কি ধারণা, সুরার প্রতি ওর অত্যাসক্তি না থাকা সত্ত্বেও নির্দ্বিধায় জবাব দেবে ও–জীবনকে দেয়া প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উপহার এ-দুটিই।

কাজেই গভীর বনভূমির ভেতর প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার অন্দরমহলে ওর হাতে সুরার পাত্র ধরিয়ে দিয়ে বনদেবীর মতই অপরূপ এক নারী যখন বলল, 'আসুন, আমরা অলিন্দে বসে পান করি,' রানা তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারল না।

তার আগে শ্বেতপাথরের বিশাল ডাইনিং রূমে অবগুণ্ঠিত একদল তরুণী রাজকীয় ডিনার পরিবেশন করেছে। প্রশ্ন না করা সত্ত্বেও রানাকে জানানো হয়েছে, চোখ বাদে কালো কাপড়ে ঢাকা এই তরুণীরা সবাই দস্যুদল হাতুড়ির সদস্যা।

'আপনার ধৈর্যের প্রশংসা করতে হয়,' ডিনারের শেষ পর্যায়ে মন্তব্যটা শুনতে হলো রানাকে।

'সুস্বাদু ও উপাদেয় এত সব ডিশ এমন যত্নের সঙ্গে পরিবেশন করা হচ্ছে, এখন প্রশ্ন করাটা রীতিমত অন্যায় হবে,' জবাবে মনের কথাই বলেছে রানা।

সব শেষে ছোট পেস্ট্রি আর কড়া কফি ছিল। আরেকদল তরুণী এসে টেবিল পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। লম্বা টেবিলের এক প্রান্তে রানা, অপরপ্রান্তে ওর মেজবান। শ্যাম্পেন ও ব্র্যান্ডি দিয়ে গেছে একজন পুরুষ ডাকাত। তবে গ্লাস ভরেছে ওর মেজবান, ব্র্যান্ডির গ্লাসটা ওর হাতে ধরিয়েও দিয়েছে সে নিজে।

এই মুহূর্তে খোলা টেরেসে দুটো ইজি চেয়ারে বসে আছে ওরা।

বনদেবীর মতই রহস্যময়ী সে। বয়স নিশ্চয়ই চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে। তবে রূপ আর লাবণ্যের কোন অভাব নেই। একহারা, যথেষ্ট লম্বা, চোখ দুটো যেমন মায়াভরা তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত। কালো চুলে মস্ত খোপা, খোপায় একটা রূপোর চিরুনি গাঁথা। গলা পর্যন্ত ঢাকা কালো একটা ড্রেস পরেছে, আস্তিন কব্জি পর্যন্ত লম্বা।

রানার এই মেজবানই মায়া মায়া মালহার। ভারত-মায়ানমার সীমান্ত ঘেঁষা দুর্গম বনভূমির ভেতর অট্টালিকাটার সে-ই মালিক এখন। হাতুড়ির সদস্যরা এখানেই নিয়ে এসেছে রানাকে।

উঁচু টেরেস থেকে ছোট একটা লেক দেখা যাচ্ছে, ওপার থেকে আকাশে উঠে আসছে থালার মত চাঁদ।

'আমি অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছি।' শ্যাম্পেনে মাত্র একটা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নিচু টেবিলে নামিয়ে রেখেছে মায়া মালহার। 'আজ দশ বছর। সব সময় মনে হয়েছে, কেউ একজন আসবে। শেষ পর্যন্ত সত্যি আপনি এলেন, মি. রানা।'

'আপনি শুধু রানা বলুন।'

'ধন্যবাদ। হ্যাঁ, নাম ধরতেই আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব। বয়সে আপনি আমার চেয়ে ছোট। আপনিও ম্যাডাম না বলে শুধু মায়া বলুন। তো যা বলছিলাম, রানা। আমি ভুলিনি।'

'কি ভোলেননি, মায়া?'

'ড. হায়দারকে। মুহিত হায়দারকে।'

'তাঁর এবং আপনার, আমি আপনাদের দু'জনের কথাই শুনতে চাই।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মায়া মালহার। 'প্রেমটা প্রথমে এক তরফাই ছিল। সেটা লন্ডনে থাকতে। তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন। এমন আদর্শপুরুষ আমার জীবনে আর আসেনি। ভালবাসলাম নিজের অজান্তেই। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করতে পারেন এই ভয়ে তাঁকে জানাতেই পারলাম না। লেখাপড়া শেষ করে ফিরে এলাম দেশে, চেষ্টা করলাম তাঁকে ভুলে যাবার। ভুলে হয়তো যেতামও, কিন্তু নিয়তির যোগসাজসেই আবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। মায়ানমারে এলেন

তিনি, বললেন আমাকে তাঁর দোভাষী হিসেবে দরকার। ব্যস, সব বাঁধ ভেঙে গেল আমার। চাকরি ছেড়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে ফালামে চলে এলাম। স্বভাবতই সম্পর্কটা ছাত্র-শিক্ষকের থাকল না। আমি তো আগেই মজেছিলাম, এবার তিনিও ডুবলেন।'

রানা অপেক্ষা করছে।

'পরস্পরকে আমরা এতই ভালবাসলাম-তিনি আমার জন্যে সব করতে পারেন, আমিও তাই। আর শেষ পর্যন্ত তিনি তা প্রমাণও করলেন-আমার জন্যে মারা গেলেন।'

'কেন?'

'উত্তরটা আপনার ধারণার সঙ্গে মিলবে না, রানা।'

'ড. হায়দার নিখোঁজ হবার দু'দিন আগে গায়েব হয়ে যান আপনি।'

'আমি গায়েব হইনি। আমাকে গায়েব করা হয়েছিল।'

'কে করেছিল? কেন?'

'আমি আপনার সব প্রশ্নেরই উত্তর দেব, রানা। তবে কাহিনীটা আপনি আমাকে আমার নিজস্ব ঢঙে বলতে দিন। আর, বিনিময়ে আপনাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।'

এমন কিছু রানা বলল না যাতে কথা দেয়া হয়ে যায়। 'গভীর জঙ্গলের ভেতর ভারি সুন্দর আপনার এই বাড়ি। আপনার সঙ্গে এখানে আর কে থাকে?'

'বাড়িটা আমার স্বামী তৈরি করেছিলেন। তিনি মারা গেছেন। আশপাশের প্রায় ত্রিশ মাইল এলাকা সরকারের কাছ থেকে লীজ নেন তিনি। তখন নো ম্যানস ল্যান্ড ছিল, পরে আমরা অনুমতি দেয়ায় কিছু লোক ঘর-বাড়ি তুলে চাষাবাদ শুরু করে। তারা সবাই এখন আমার প্রজা। বাড়িতে? আর কেউ থাকে না, আমি একা। তবে আমার দেখাশোনা করার জন্যে পঞ্চাশ ষাট জন ছেলেমেয়ে আছে। আর মাঝে-মধ্যে হাতুড়ির ওরাও বেড়াতে এসে দু'চারদিন কাটিয়ে যায়। তবে বিশেষ কোন কারণ বা উপলক্ষ ছাড়া সাধারণত ওরা আসে না। আজ এসেছে, আপনার আগমনটাই উপলক্ষ।'

'আপনার স্বামী ভদ্রলোক বেপরোয়া মানুষ ছিলেন, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'শুনেছি ইয়ানগনে তাঁর গোপন আস্তানায় প্রতিদিন লাখ লাখ কিয়াতের জুয়া খেলা হত।'

ক্ষীণ হাসি ফুটল মায়া মালহারের ঠোঁটে। 'আপনি কৌশলী হবার চেষ্টা করছেন, রানা। জুয়ার আসর বসালেও আমার স্বামী থিরি হাটাইক জুয়াড়ী ছিলেন না। তাঁর জন্ম হয় নোংরা বস্তিতে, খেতে না পেয়ে অপরাধে হাতেখড়ি, সেই অপরাধকে পুঁজি করেই নিজের বিশাল এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। হ্যাঁ, তিনি দুর্ধর্ষ গ্যাঙলীডার ছিলেন, ছিলেন পাষণ্ড ও খুনী-তবু বলব ওই জাতের লোকদের মধ্যে তিনি ছিলেন আশ্চর্য এক ব্যতিক্রম। সারা জীবনে যা কিছু তিনি অর্জন ও সঞ্চয় করেছেন, আমার জন্যে তার এক আনা রেখে পনেরো আনাই দান করে গেছেন নিজের হাতে গড়া দল হাতুড়ির উদ্দেশে।'

'হাতুড়ি। নামটা অদ্ভুত, তাই না? শুনেছি তার জুয়ার টেবিলে কেউ চুরি

করলে তার আঙুলে হাতুড়ি মারা হত, সেই থেকেই দলের নাম হয়ে যায় হাতুড়ি।'

মাথা ঝাঁকাল মায়া মালহার। 'তবে, আগেই বলেছি, থিরি হাটাইক জুয়াড়ী ছিলেন না। তিনি জিতবেন নিশ্চিত হয়ে বাজি ধরতেন। জীবনে মাত্র একবারই জুয়া খেলেন তিনি। আমাকে নিয়ে।'

'মানে?'

'দশ বছর আগে একজনকে কিডন্যাপ করার দায়িত্ব পান তিনি। আমাকে।'

'আর তাই নিঃশব্দে দৃশ্যপট থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন আপনি?'

'খেলাটায় আমি ছিলাম নগণ্য একটা ঘুঁটি মাত্র। ড. হায়দারকে ব্ল্যাকমেইল করার জন্যে আমাকে জিম্মি করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্যই আমার জানা ছিল না, কিন্তু দুই বিলিয়ন ডলারের আর্টিফ্যাক্ট কারা আত্মসাৎ করতে চাইছে ড. হায়দার তা ভাল করেই জানতেন। তাঁকে শর্ত দেয়া হয়, তিনি বোবা হয়ে থাকলে আমাকে খুন করা হবে না।'

'আরেকটু ব্যাখ্যা করুন, প্লীজ।'

'আপনাকে তো বললামই, ড. হায়দার আমার জন্যে যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করতে পারতেন। এমনকি নিজের মর্যাদাও। আমার প্রাণরক্ষার জন্যে নিজেকে তিনি দূষিত করলেন। কিন্তু তাঁর আত্মত্যাগ কোন কাজে লাগল না। সব বৃথা গেল।

'ড. হায়দার মারা গেলেন। খুন হয়ে গেলেন তিনি। তিনি চলে যাবার পর লুটেরাদের কাছে আমার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেল। থিরি হাটাইককে তারা আমাকে মেরে ফেলার নির্দেশ দিল। হাটাইক তাদেরকে জানালেন, নির্দেশ পালিত হয়েছে। কিন্তু তিনি মিথ্যে কথা বলেছিলেন। তারা অবশ্য কোনদিনই তা জানতে পারেনি।

'ব্যাপারটা হলো, রানা, থিরি আমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। আমাকে খুন না করে গোপনে লুকিয়ে রাখলেন। আমার চেহারা কিছুটা বদল করা হলো। নতুন পরিচয় দেয়া হলো। তারপর গোপনে তিনি আমাকে বিয়ে করলেন। মায়া মায়া মালহার নামে এখন আর কেউ আমাকে চিনবে না। গত দশ বছর ধরে সবাই জানে আমার নাম সুশীলা থং-ভারতীয় বাবা, বার্মীজ মা।'

'আপনাদের দাম্পত্য জীবন কেমন ছিল?'

'সময় লেগেছে, তবে একসময় আমি তাঁর লক্ষ্মী বউ হয়ে উঠি। আমাকে পেয়ে থিরি সুখী হয়েছিলেন। আমি তাঁকে অপরাধজগৎ থেকে ফিরিয়ে আনি।'

'জীবনের প্রথম ও শেষ জুয়া খেলায় সত্যিকার লাভবান হয়েছিলেন থিরি হাটাইক।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, রানা। ইউ আর কাইন্ড।'

'তারপর কি হলো, সুশীলা?'

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুশীলা ওরফে মায়া মালহার। 'বেশিরভাগ গ্যাঙলীডার অ্যামবিশাস শিষ্যের হাতে মারা যায়। থিরির স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। এ থেকেই বোঝা যায় শিষ্যরা কি রকম বিশ্বস্ত আর অনুগত ছিল তার। থিরি ছিল তাদের কাছে দেবতা। তিনি মারা যাবার পর আমাকে ওরা দেবীর

আসনে বসাল। কিন্তু ওদের শত অনুরোধেও দলের নেতৃত্ব হাতে নিতে আমি রাজি হইনি। থিরি নিজে অপরাধজগৎ থেকে সরে এসেছিলেন, কিন্তু দলের লোকদের কখনও বলেননি এ-সব ছেড়ে দাও। আমি প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ওরা ছাড়তে পারবে না। সে যাই হোক, আমিও ওদেরকে অযাচিতভাবে কোন পরামর্শ দিইনি। তবে আমি কখনও ওদের সাহায্যও নিইনি। শুধু একবার নিতে হলো–ড. হায়দারের প্লেনটা পাওয়ার পর।'

'পর্দার আড়ালে আপনিই তাহলে কাজ করছিলেন।'

'হ্যাঁ। ব্যবসায়ীদের বিশেষ একটা মহল সামরিক স্বৈরশাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, রানা। এই বিশেষ মহলের সদস্যরা তাদের ব্যবসার পুঁজি যোগাড় করেছে ফালাম আর্কিওলজিকাল সাইট থেকে পাওয়া আর্টিফ্যাক্ট বিক্রি করে। এদের ক্ষমতা আর প্রভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাধ্য কারও নেই। প্লেনটা সনাক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠে তারা। অ্যারোনটিক্স-এর ইন্সপেক্টর গাইয়ো সানকে ঘুষ দিয়ে প্রথম রিপোর্ট বাতিল করানো হয়, দ্বিতীয় রিপোর্টে বলা হয় ওটা দশ বছর আগে নিখোঁজ ড. হায়দারের প্লেন নয়, তিন বছর আগে হারিয়ে যাওয়া একটা সার্ভে প্লেন।'

'মিথ্যে রিপোর্টটা লিখিয়ে নিয়ে গাইয়ো সানকে খুন করেছে তারা, তাই না?'

'না,' মায়া মালহার বললেন। 'তারাই খুনটা করত, কিন্তু তাদের আগে অন্য একদল সরিয়ে দিয়েছে তাকে।'

'অন্য একদল মানে?'

'হুঁ-হুঁ, এখানেই আপনার ভূমিকার কথা ওঠে, রানা। আর্টিফ্যাক্ট লুট আর ড্যাম উড়িয়ে দেয়ার সঙ্গে একাধিক গোষ্ঠি জড়িত ছিল। নিজেদের অপরাধ গোপন রাখার জন্যে সবাই তারা প্রয়োজনে খুন করবে। ইন্সপেক্টরকে খুন করেছে পাকিস্তানী আইএসআই। দৈনিক মায়ানমারের তিনজন স্টাফকেও খুন করা হয়েছে, আমার পাঠানো তথ্য ওদের অফিসে পৌঁছাবার পরপরই।'

'ওদেরকে হিনান ফো খুন করে।'

'ও তো স্রেফ ভাড়াটে খুনী। সাবধান কিন্তু, রানা! মাউঙের মৃত্যুতে মারাত্মক চোট পেলেও, সঙ্গীকে হারিয়ে প্রায় পঙ্গুই হয়ে গেছে, তারপরও হিনান ফো আপনার জন্যে ভয়ঙ্কর একটা বিপদ।'

'এ-ধরনের বিপদ আমি সামলাতে জানি।'

'হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস জানেন।'

'কিন্তু ফোর পিছনের লোকটা কে?'

'বলব, তবে তার আগে আপনাকে একটা কথা দিতে হবে।'

'কি কথা?'

'আমি চাই আপনি একটা লোককে খুন করবেন।'

মায়া মালহারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা। অবশেষে বলল, 'আপনার নিজের ক্ষমতা বা লোকবলের তো কোন অভাব নেই। আমাকে দিয়ে কেন করাতে চাইছেন কাজটা?'

'যোগ্যতার বিচারে তারা কেউ আপনার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারবে না। তাছাড়া, এ-ধরনের কোন কাজ ওদেরকে দিয়ে আমি করাতে চাই না। তা চাইলে অনেক আগেই করাতে পারতাম। আপনাকে তাহলে সত্যি কথাটাই বলি। ওদেরকে দিয়ে এ-ধরনের কোন কাজ করাতে আমার স্বামী আমাকে নিষেধ করে গেছেন।'

'হুঁ।' চিন্তা করছে রানা।

'আপনাকে অনুরোধ করার পিছনে আরেকটা কারণ আছে, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কাকে খুন করতে হবে শোনার পর কারণটা আপনি বুঝতে পারবেন।'

'কাকে?'

নামটা বলল মায়া মালহার।

তার কারণ ব্যাখ্যা শেষ হতে রাত গভীর হয়ে উঠল। জঙ্গলের ভেতর, বাড়ির ঘেরা চৌহদ্দির বাইরে, একটা বাঘের সগর্জন ঘোরাফেরা শুরু হয়েছে।

একসময় রানা নিস্তব্ধতা ভেঙে বলল, 'আর একটা প্রশ্ন, সুশীলা। আপনি জানেন, ড. মুহিত হায়দারকে কে খুন করেছিল?'

'জানি।'

'কে?'

খুনীর নাম বলল মায়া মালহার।

শিউরে উঠল রানা।

ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়ল মায়া মালহার। 'চলুন, অনেক রাত হলো—আপনাকে আপনার কামরায় পৌঁছে দিই।'

সতেরো

বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত। বার্মীজ শহর পুতাপাইয়ে সূর্য উঠল। প্রায় ওই একই সময়ে রানাও উদয় হলো শহরে।

পুতাপাইয়ে একাই এসেছে রানা। ওর কাজে হাতুড়ির সদস্যরা কোন ভূমিকা রাখবে না। মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে তারা।

যতটুকু সম্ভব করেছে মায়া মালহার। অবশ্য আরও অনেক কিছুই করার ইচ্ছে ছিল তার। তা করতে গেলে স্বামীর রেখে যাওয়া প্রিয় দলটার মারাত্মক ক্ষতি করা হবে। সামরিক স্বৈরশাসকদের তরফ থেকে সেই হুমকিই দেয়া হয়েছে তাকে। বলা হয়েছে, 'বেশি বাড় বেড়ো না। আর যদি নাক গলাও, বনভূমির লীজ বাতিল করে ভিটেছাড়া করা হবে তোমাকে, ধরে ধরে হাতুড়ির সব কজনকে খুনও করা হবে।'

ওরা তা পারে।

তবে রানাকে বিদায় দেয়ার সময় মায়া মালহার রুদ্ধকণ্ঠে বলেছে, 'আমি

আপনার জন্যে প্রার্থনা করব।'

ধীর পায়ে শহরে ঢুকল রানা। ওকে নামিয়ে দিয়ে অনেক আগেই চলে গেছে ট্যাক্সিটা। কে জানে ড্রাইভার তার কথা রাখবে কিনা। সন্ধের মধ্যে সে যদি না ফেরে, ইয়ানগনে ফেরার অন্য কোন ব্যবস্থা করতে হবে রানাকে।

গ্রামের পথে এক লোককে দেখা গেল। সামনে ছোট একটা হাট। অল্প কিছু লোকজন পসরা সাজিয়ে বসেছে। সীমান্তের কাছাকাছি, তাই বাংলাদেশী পণ্যের কোন অভাব নেই। ওই হাট থেকেই ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসছে লোকটা।

'আবার তাহলে আমাদের দেখা হলো, সুব্রত বাবু,' বলে হাসল লোকটা।

'গুড মর্নিং, মেজর আউং।'

'মর্নিং। পুতাপাইয়ে কিন্তু দেখার মত কিছু নেই, সুব্রত বাবু। ট্যুরিস্টের ছদ্মবেশে স্মাগলাররা আসে বটে, কিন্তু আপনাকে আমি স্মাগলার বলে ছোট করতে রাজি নই।'

'চোখ থাকলে দেখার অনেক কিছুই এখানে পাওয়া যাবে, মেজর আউং,' বলল রানা।

'তাই?'

'তাছাড়া, দেখার কিছু না থাকলে আপনিই বা এখানে আসবেন কেন!'

'আমি এসেছি কাজে। প্রশ্নটা আপনাকে নিয়ে।'

'জবাব আপনি পেয়েছেনও—আমার চোখ আছে।'

'ভারি মজার জবাব।'

'চেহারা কিন্তু বলছে না যে আপনি মজা পেয়েছেন।'

'বলছে না? তাহলে হয়তো মজা পাইনি। আপনি একটা সময় পর্যন্ত খুব কাজ দিয়েছেন, সুব্রত বাবু। নিশ্চিহ্ন হওয়া উচিত ছিল এমন কিছু বদ লোককে আপনি নিশ্চিহ্ন করেছেন। সেজন্যে আপনার লাগাম আমি টেনে ধরিনি।'

'কিন্তু এখন আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে?'

'অন্তত লাগাম টেনে ধরার সময় তো অবশ্যই হয়েছে।'

'সে চেষ্টা অনেকবার করা হয়েছে।'

'আমার দ্বারা নয়।'

'মাউং চেষ্টা করেছিল। সে বেঁচে নেই।'

'হোয়াট! ওহ্! হাউ নাইস। এতে আমার কথারই সত্যতা প্রমাণিত হয়, সুব্রত বাবু—আপনি আমার একটা উদ্দেশ্য পূরণ করেছেন।'

'তবে হিনান ফো এখনও বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'আপনার সঙ্গে যে-কোন মুহূর্তে তার দেখা হয়ে যেতে পারে। লম্বা তালগাছটাকে সন্তানের মত ভালবাসত সে। শুভেচ্ছা রইল, সুব্রত বাবু।' ঘুরে শহরের দিকে হাঁটা ধরল মেজর আউং।

'পরে আবার দেখা হবে, মি. আউং।'

'গুডবাই, সুব্রত বাবু।'

লোকজনের ভিড়ে মেজর আউং হারিয়ে যাবার আরও খানিক পর পিস্তল

থেকে হাত সরাল রানা।

গ্রাম্যপথের ধারে ঝুলন্ত তার দেখা যাচ্ছে। রানা আন্দাজ করল, মেজর আউং কাউকে টেলিফোন করার জন্যেই তাড়াহুড়ো করে চলে গেল।

শহর বা গ্রাম যাই বলা হোক, পুতাপাইয়ে যে-ক'টা রেস্তোরাঁ আছে সবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নাস্তা সেরে সোজা মিশনারি স্কুলে চলে এল রানা, উদ্দেশ্য স্কুলের অধ্যক্ষ বেঞ্জামিন উইন সেইন-এর সঙ্গে দেখা করা।

স্কুল থেকে বলা হলো, ফাদার বেঞ্জামিন চ্যানসেলরিতে আছেন।

ছোট, পরিপাটি ভাবে সাজানো অফিসে রানাকে অভ্যর্থনা জানালেন ফাদার। স্কুলের অধ্যক্ষ, সেইন। ওই চার্চের যাজকও তিনি।

'সাক্ষাৎ দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, ফাদার।'

'ইউ আর ভেরি ওয়েলকাম। পুতাপাইয়ে ভিজিটর খুব কম আসেন। আপনি আসায় আমি খুশি হয়েছি।'

'আপনি বোধহয় সাম্প্রতিক সময়ের কথা বলছেন না।'

'ও, আচ্ছা, নিখোঁজ প্লেনটার কথা বলছেন আপনি। আসলে বলা উচিত খুঁজে পাওয়া প্লেনটা। হ্যাঁ, ঘটনাটা বেশ উত্তেজনা ছড়িয়েছিল এলাকায়। তবে দু'এক হপ্তা পরই আবার সব শান্ত হয়ে গেছে।' রানার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন ফাদার। 'এ-ব্যাপারে আপনার কি বিশেষ কোন আগ্রহ আছে?'

'আছে বৈকি। আমি কোলকাতার একটা দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টার।' ফাদারের দিকে একটা প্রেস কার্ড বাড়িয়ে ধরল রানা। 'প্লেনটা সম্পর্কে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে এসেছি।'

কার্ড দেখে ফেরত দিলেন ফাদার বেঞ্জামিন। 'যতটুকু জানি বলতে আমার আপত্তি নেই। আপনি কি লিখবেন?'

'ধন্যবাদ, ফাদার। না, লিখতে হবে না, আমার মনে থাকবে। শুনেছি প্লেনটা নাকি অ্যাক্সিডেন্টালি আলোর মুখ দেখে–সত্যি নাকি?'

'অনেকেই ব্যাপারটাকে মিরাকল বলবে,' হাসিমুখে বললেন ফাদার। 'এখান থেকে বেশ ক'মাইল দূরে ছোট্ট একটা লেক আছে। ভূমিকম্পে সেই লেকের তলায় একটা ফাটল তৈরি হয়। ওই ফাটল দিয়ে সমস্ত পানি বেরিয়ে গেলে তলায় পড়ে থাকতে দেখা যায় প্লেনটাকে।'

'প্লেনটা এখন কোথায়?'

'আমার জানামতে ওখানেই পড়ে আছে–লেকের শুকনো তলায়।'

'প্লেন থেকে কোন লগবুক, রেকর্ড বা ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র উদ্ধার করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, কিছু কিছু জিনিস তো বের করা হয়েছেই।'

'সেগুলো এখন কোথায়?'

'সরকারী এক ভদ্রলোক উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন। তিনিই বলতে পারবেন কোথায় আছে।'

'সরকারী লোক মানে কি ব্যুরো অভ-অ্যারোনটিক্স-এর ইন্সপেক্টর গাইয়ো সান?'

'না,' মাথা নেড়ে বললেন যাজক। 'অন্য এক ভদ্রলোক নিয়ে গেছেন। নামটা জিভে আছে, ঠোঁটে আসছে না। একটু পর হয়তো মনে পড়বে।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা।

'ইয়ে!' হঠাৎ গলা চড়ালেন ফাদার। 'মনে পড়েছে। ইয়ে আউং। ভদ্রলোকের নাম...'

'মেজর আউং?' রানা হাসল। 'তিনি তো পুতাপাইয়ে আবার ফিরে এসেছেন।'

'তিনিই তো ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছিলেন। হয়তো আলগা সুতোগুলো জোড়া লাগাবার জন্যে ফিরে এসেছেন।'

'হয়তো।'

'তাঁর কাজে আমি খুব আন্তরিকতা লক্ষ করেছি। হাসিখুশি অমায়িক ভদ্রলোক।'

'হ্যাঁ। লাশগুলোর কি হলো, ফাদার?'

'সারকামসাইজ করা লাশ, কাজেই হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে পারে না। হয় মুসলমান, নাহয় খ্রিস্টান—এদিকে ইহুদি তো একেবারেই নেই। তারপর কে যেন বলল একজনের নাম জানা গেছে—পিটার। এ-কথা শুনে এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব বললেন, তাহলে দ্বিতীয় লাশটাও খ্রিস্টানেরই হবে। কাজেই লোক পাঠিয়ে লাশ দুটো এখানে আনিয়ে আমাদের কবরস্থানে মর্যাদার সঙ্গে মাটি দেয়া হলো। কেউ যখন ক্লেইম করেনি, কি আর করা!'

'আপনি দু'জনের কথা বলছেন, ফাদার।'

'হ্যাঁ।'

'দু'জন?'

'কবর দুটো আপনি দেখতে চান?' জিজ্ঞেস করলেন ফাদার। 'চার্চের পিছনেই আমাদের কবরস্থান।'

ফাদারের পিছু নিয়ে কবরস্থানে চলে এল রানা। গেট দিয়ে ঢুকবে, হঠাৎ লক্ষ করল, এক লোক ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

লোকটা কোত্থেকে এল বলা মুশকিল। চার্চ, স্কুল ও কবরস্থান একই কমপাউন্ডের ভেতর, চার্চ ও স্কুলের মাঝখানে শুধু নিচু একটা পাঁচিল আছে। রাস্তা থেকে চার্চে ঢোকার একটাই গেট, তবে সেটা বন্ধ।

আগন্তুক কাছে আসতে রানার চিন্তাধারা বদলে গেল। লোক নয়, ভদ্রলোক মনে করা উচিত তাঁকে। সাধারণ প্যান্ট-শার্ট পরে আছেন, কিন্তু চেহারায় দরবেশ বা দার্শনিক সুলভ একটা ভাব। মুখে চাপ দাড়ি, প্রায় সবই সাদা।

তাঁকে দেখে ফাদারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আগন্তুক বললেন, 'আপনি স্কুলে আসছেন না দেখে আমিই চলে এলাম, ফাদার বেঞ্জামিন। সকালের কফিটা অন্তত একসঙ্গে বসে না খেলে কি করে হয়!'

হাসছেন তিনি। তারপর রানার দিকে ফিরে বললেন, 'এনাকে তো চিনলাম না!'

একটু অবাকই হলো রানা। আগন্তুক বা ফাদার কেউই শ্বেতাঙ্গ নন, এবং পরিষ্কার বোঝা যায় দু'জনেই তাঁরা স্থানীয়। অথচ আগন্তুক কথাগুলো ইংরেজিতে বললেন।

'আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই,' বললেন ফাদার। 'মি. সুব্রত, ইনি আমাদের মিশনারি স্কুলের হেডমাস্টার, মি. গুডফেলো।' মি. গুডফেলো, ইনি একটি ভারতীয় দৈনিকের রিপোর্টার, মি. সুব্রত।'

হেডমাস্টারের সঙ্গে করমর্দন করল রানা।

ফাদার বললেন, 'যেতে পারিনি বলে দুঃখিত, মি. গুডফেলো। আজ সকালে আমাকে মাফ করতে হবে, কথা দিলাম বিকেলের কফিটা মিস করব না।'

'যাননি দেখে ভাবলাম আপনার বাতের ব্যথাটা আবার বাড়ল কিনা। ঠিক আছে, আমার আবার ক্লাস নিতে হবে–বিকেলে কিন্তু আসছেনই, কেমন?'

কবরস্থানের গেট থেকেই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন হেডমাস্টার গুডফেলো।

রানাকে ভুরু কুঁচকে থাকতে দেখে ফাদার বেঞ্জামিন জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার, মি. সুব্রত? আপনাকে হঠাৎ চিন্তিত মনে হচ্ছে!'

'না···মানে, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আপনাদের হেডমাস্টারকে আগে কোথাও দেখেছি। কিন্তু মনে করতে পারছি না ঠিক কোথায়।'

'আপনি নিশ্চয়ই ভুল করছেন, মি. সুব্রত। আমি এখানে অনেক বছর ধরে আছি, মি. গুডফেলোকে পুতাপাই ছেড়ে কখনও কোথাও যেতে দেখিনি। আমি এখানে যাজক হয়ে আসার অনেক আগে থেকে এই মিশনারি স্কুলের হেডমাস্টারি করছেন উনি। অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি, ছাত্র-ছাত্রীরা তো বটেই, শিক্ষকরাও তাঁকে গুরুজ্ঞানে সম্মান করেন। ভদ্রলোক চিরকুমার, এই স্কুল তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান। ঈশ্বর ওঁর মঙ্গল করুন।'

'বলা হয় ঈশ্বরের মঙ্গল বড় বিচিত্র পথে আসে, ফাদার।'

'সত্যি তাই। আসুন, কবর দুটো আপনাকে দেখাই।'

ফাদারের পিছু নিয়ে কবরস্থানে ঢুকল রানা, এখনও অন্যমনস্ক। চিন্তাটা মাথা থেকে সরাতে পারছে না।

কবর দুটো গোরস্তানের এক প্রান্তে। আঙুল তুলে দেখালেন ফাদার, বললেন, 'কেউ যেহেতু সনাক্ত করেনি, তাই এপিটাফে কিছু লেখাও যায়নি।'

'ধন্যবাদ, ফাদার।'

'আপনার কৌতূহল মিটেছে, মি. সুব্রত?'

'জী, মিটেছে। আপনি আমার অনেক বড় একটা উপকার করলেন।'

ফাদারকে সন্তুষ্ট দেখাল। 'চলুন, আপনাকে আমি চৌরাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিই–হাঁটাহাঁটি করলে বাতের ব্যথাটা কমবে।'

'আপনার সঙ্গ পেলে খুশি হই, ফাদার।'

কবরস্থান থেকে চার্চের সামনেটা হয়ে গেট দিয়ে চৌরাস্তায় বেরুবে ওরা। চার্চের সামনে আসার পর হেডমাস্টার গুডফেলোকে আবার দেখতে পেল রানা,

চার্চ ও স্কুলের মাঝখানে নিচু পাঁচিলটার কাছে দাঁড়িয়ে দু'জন সিস্টারের সঙ্গে আলাপ করছেন। ও বুঝতে পারল, ওই নিচু পাঁচিল টপকেই স্কুল থেকে এদিকে এসেছিলেন ভদ্রলোক।

গেট খুলে রাস্তায় বেরিয়েই থমকে দাঁড়ালেন ফাদার বেঞ্জামিন, পাকা ভুরু দুটো কুঁচকে উঠেছে। 'ওই গাড়ির মতলবটা কি?'

ছেড়ে দেয়া তীরের বেগে শহরে ঢুকছে একটা গাড়ি। ওটার পথ থেকে ছিটকে সরে যাচ্ছে লোকজন। বাচ্চাকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে ছুটল এক মা, মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্যে অ্যাক্সিডেন্টটা হলো না। চারচাকার এঞ্জিনবিহীন একটা ভ্যানগাড়ি, ওপরে মুরগিভর্তি খাঁচা, রাস্তার একেবারে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার ভ্যান ও মুরগির মায়া ত্যাগ করে পালাতে চেষ্টা করল। কালো মার্সিডিজ তাকে নয়, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল খাঁচাসহ ভ্যানটাকে, ওগুলোর নিচে চাপা পড়ল ড্রাইভার।

'ড্রাইভার নির্ঘাত পাগল হয়ে গেছে!' অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন ফাদার।

মার্সিডিজ সগর্জনে চৌরাস্তায় পৌঁছাল। এঞ্জিনের আওয়াজ আশপাশের দালানে লেগে প্রতিধ্বনি তুলছে। ফাদার আঁতকে উঠলেন। গাড়িটা সোজা চার্চের দিকে ছুটে আসছে।

'দৌড়ান!' ফাদারের হাত ধরে টান দিল রানা, চার্চের সামনের ধাপে তুলে আনল।

'কিন্তু কি…কে?'

'ওরা খুনী, ফাদার!'

বাকি তিনটে ধাপ টপকে চার্চের উঠানে ঢুকে পড়লেন ফাদার। বিশ গজ সামনে আরও কয়েকটা ধাপ, তারপর, মূল চার্চে ঢোকার দরজা। সেদিকে ফাদার ও রানাকে দৌড়াতে দেখে নিচু পাঁচিলের কাছ থেকে হেডমাস্টার গুডফেলোও ছুটে এলেন।

'কি ব্যাপার? কি হলো?'

দরজা খুলে দালানে ঢুকলেন ফাদার, তাঁর পিছনে রানা ও হেডমাস্টার।

'কোন কথা নয়,' রুদ্ধশ্বাসে বলল রানা। 'আপনারা চার্চের পিছন দিয়ে বেরিয়ে যান। আমি ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখব। যান!'

রাস্তার সঙ্গে চাকা ঘষে চার্চের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল মার্সিডিজ। দু'দিকের দরজা খুলে লাফ দিয়ে নিচে নামল দু'জন খুনী। বাকি চারজন উঠানে ঢুকল। আগেই নেমে পড়া দু'জন চার্চের পিছন দিকে চলে গেল।

উঠানে একটা গাছের পিছনে কাভার নিল হিনান ফো। পাঁজরের পাশে মেশিন গান বাগিয়ে ধরে গুলি শুরু করল সে।

ডাইভ দিয়ে মেঝেতে পড়ল রানা, শরীরটা গড়িয়ে দিল। চার্চের পাথুরে দেয়ালে সারি সারি গর্ত তৈরি করছে ইস্পাতের জ্যাকেট পরানো .৪৫ ক্যালিবারের বুলেট।

আরেক গাছের পিছনে কাভার নিয়েছে বামপন্থী কমিউনিস্ট কবি মায়াতকা

থুয়ে, হাতে হাইপাওয়ারড্ রাইফেল। ওই রাইফেলের বুলেট একটা খেপা হাতিকেও থামিয়ে দিতে পারবে।

মোটাসোটা আরেক লোকের হাতে শটগান। চারজনের মধ্যে একজন কিশোর, মাথায় লাল পট্টি, দু'হাতে একটা করে পিস্তল। গাছের আড়াল থেকে সবাই তারা চার্চ লক্ষ্য করে গুলি করছে।

কাঠের দরজা টুকরো টুকরো হয়ে অস্তিত্ব হারাল। দালানের সামনেটা ধুলো আর ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

চার্চের যথেষ্ট ক্ষতি হলেও, রানার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি। পাথরের একটা স্তম্ভের পিছনে দাঁড়িয়ে সুযোগের অপেক্ষায় আছে ও।

ফাদার বেঞ্জামিন বুড়ো মানুষ, গুডফেলো তাঁর হাত ধরে দৌড়াচ্ছেন। দরজা খুলে চার্চের পিছন দিকে বেরিয়ে এলেন ওঁরা।

বাঁক ঘুরল আয়ে মোয়ে, ফাদার আর হেডমাস্টারকে দেখতে পেয়ে ব্যারেল কাটা শটগানটা তুলল।

ফাদারের কলারের পিছনটা খামচে ধরে টান দিলেন গুডফেলো, পিছিয়ে দালানের ভেতর ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

শটগানের গুলি লেগে দরজা ঝাঁঝরা হয়ে গেল। কাঠের ছিটকে আসা টুকরো গায়ে লাগলেও গুডফেলো আহত হননি। ফাদারকে তিনি দরজার পাশের দেয়াল ঘেঁষে বসিয়ে দিয়েছেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা খালি টেবিল ছাড়া কিছুই তিনি দেখতে পেলেন না। অবশ্য দেরাজের ভেতর একটা হাতুড়ি, একটা টর্চ, আর বড় একটা ছেনি রয়েছে।

শটগানের দ্বিতীয় গুলি কবাটের গায়ে বড় একটা ফাঁক তৈরি করল, ফাঁকটা দিয়ে দিনের আলো ঢুকছে ভেতরে।

ডাবল ব্যারেলড্ অস্ত্রটা ভাঁজ করল আয়ে মোয়ে, খরচ হওয়া কার্তুজ লাফিয়ে বেরিয়ে যেতেই সে জায়গায় নতুন কার্তুজ ভরল। এই ফাঁকে তার সঙ্গী দরজার কবাটে ছ'টা গুলি করল রাইফেল দিয়ে। তাতেও দরজা ভেঙে পড়ছে না দেখে ছুটে এল সে, রাইফেলটা উল্টো করে ধরে কবাটে পরপর বাড়ি মারল কয়েকটা। একটা ফাঁক তৈরি হতে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বোল্ট খুঁজছে।

সেই হাতে ছেনির কিনারা দিয়ে প্রচণ্ড বাড়ি মারলেন গুডফেলো। সরাসরি আঙুলে লাগায় দু'তিনটে সরু হাড় প্রায় গুঁড়ো হয়ে গেল। 'বাপরে!' বলে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল সে।

'ফাদার, টাওয়ারে!' বৃদ্ধের হাত ধরে আইল-এর মাঝখান দিয়ে ছুটলেন গুডফেলো। বেল টাওয়ার একশো ফুট লম্বা। কাঠের সিঁড়ি চৌকো শ্যাফট ধরে উঠে গেছে। টাওয়ারের মাথায় বেল থেকে ঝুলছে মোটা একটা রশি।

সিঁড়ি বেয়ে টাওয়ারে উঠে এলেন ওঁরা, আর ঠিক তখনই দরজা ভেঙে চার্চের ভেতর ঢুকে পড়ল আয়ে মোয়ে।

দূর থেকে গুলি করে কোন লাভ নেই, বুঝতে পেরে বীরত্ব দেখাবার একটা ঝোঁক

চাপল মাথায় লাল পট্টি বাঁধা কিশোর কমিউনিস্ট ক্যাডারের। চার্চের সামনের ধাপ লক্ষ্য করে ছুটল সে, দুটো পিস্তল থেকেই গুলি করছে।

রানা তাকে দালানের ভেতর ঢুকতে দিল। মাত্র একটা গুলিতেই কাজ হলো। মুখ থুবড়ে পড়ার পর ছেলেটা আর নড়ছে না।

হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে পরিবেশটা। হিনান ফো'র মেশিন গান আওয়াজ করছে না।

বাইরে এখনও গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে মায়াতকা থুয়ে। এখন পর্যন্ত একটা গুলিও করেনি সে। মোটা লোকটার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সং সেজে দাঁড়িয়ে আছ যে? যাও, ভেতরে ঢুকে লোকটাকে মারো।'

'একা?'

'পিছনের ওরা কি করছে দেখতে গেছে ফো। তোমরা চারজন মিলে একটা লোককে খতম করতে পারবে না!'

'আমি টার্গেট দেখতে পাওয়ার অপেক্ষায় আছি।'

'ও-সব ধুনপুন ছাড়ো!' বলে মোটা লোকটার দিকে রাইফেল তুলল থুয়ে। 'এখুনি তোমাকে চার্চের ভেতর ঢুকতে হবে।'

একটা ঢোক গিলে গাছের আড়াল থেকে বেরুল লোকটা। ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে এসে দালানের দেয়াল ঘেঁষে দরজার দিকে এগোচ্ছে।

মুখে হাত চাপা দিয়ে একটু হাসল থুয়ে, তারপর লোকটার পায়ের কাছে এক রাউন্ড গুলি করল। 'মুভ! মুভ!'

থুয়ের ভয়েই অস্থির হয়ে গুলি করতে করতে দালানের ভেতর ঢুকে পড়ল লোকটা। ছুটছিল, লাশের গায়ে পা লাগায় আছাড় খেলো। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে সিধে হলো, হাতের অস্ত্র ঘুরিয়ে টার্গেট খুঁজছে।

দৃষ্টিসীমার ভেতর রানাকে দেখা যাচ্ছে না।

লম্বা চার্চের শেষ প্রান্তে ঝাপসা একটা নড়াচড়া লক্ষ করল লোকটা। ট্রিগার টানতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল হিনান ফো।

বেল টাওয়ারের দিকে ছুটল যেন।

শার্টের আস্তিন দিয়ে চোখে নেমে আসা ঘাম মুছল মোটা লোকটা। উঁচু বেদির কাছে একটা শব্দ হতে প্রায় লাফিয়ে উঠল সে। কেউ কোথাও নেই। তাড়াতাড়ি, একটা দেয়ালের পিছনে চলে এল। উঁকি দিয়ে সারি সারি আসন, বেদি, ক্রস ইত্যাদির ওপর সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে। রানাকে সে দেখতে না পেলেও, কনফেশনাল-এর বন্ধ দ্বিতীয় দরজার তলা থেকে ধূসর রঙের সামান্য একটু কাপড় বেরিয়ে থাকতে দেখে হাসি ফুটল মুখে।

লোকটা দেখেছে, ওদের টার্গেট ধূসর রঙের ট্রাউজার পরে আছে।

দম আটকে রেখে কনফেশনালের দিকে এগোল সে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রায়ট গান তুলে গুলি করল একের পর এক।

কাঠের দরজা বিস্ফোরিত হলো। ছোট্ট বুদটা খালি, ভেতরে কেউ নেই।

কে যেন শিস দিল।
মোটা লোকটা দিশেহারার মত চোখ ঘোরাচ্ছে। এক সারি আসনের পিছন থেকে সিধে হয়ে তার মাথায় গুলি করল রানা।

টাওয়ারের মাথার কাছাকাছি পৌঁছে দম নেয়ার জন্যে থামল আয়ে মোয়ে। বেশি সিগারেট খেলে যা হয়, সিঁড়ি বেয়ে খানিকটা উঠলেই হাঁপাতে থাকে। আওয়াজ শুনে নিচে তাকাল সে, দেখল ফো-ও উঠে আসছে।

তবে খর্বকায় ফো এখনও অনেক নিচে, সে উঠে আসার আগেই আয়ে মোয়ে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলবে। রেইলে হেলান দিল সে, দম ফিরে পেতে সময় লাগায় রেগে উঠছে নিজের ওপর। হাঁ করে বাতাস টানছিল, আরেকটু ঝুঁকে নিচে তাকাতে নতুন একটা উপদ্রব শুরু হলো—মাথাটা ঘুরছে। মনেই ছিল না যে তার ভার্টিগো আছে—ওপর থেকে নিচে তাকালেই অসুস্থবোধ করে।

আয়ে মোয়ে চোখ বন্ধ করল।

নিঃশব্দ পায়ে পিছনে এসে ভারী ছেনিটা সজোরে তার মাথায় নামিয়ে আনলেন গুডফেলো। দ্বিতীয় আঘাতটা আরও জোরাল হলো, তারপরই আয়ে মোয়ের পিঠে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিলেন। কাঠের রেইল ভেঙে গেল, শ্যাফটের ওপর থেকে আয়ে মোয়ের পতন শুরু হলো।

মাত্র আধ সেকেন্ডের জন্যে থমকাল ফো, আয়ে মোয়ের পতনটা দেখল, তারপর আবার আগের মতই ধাপ বেয়ে উঠতে লাগল।

গুডফেলো পিছিয়ে টাওয়ারের ভেতর দিকে সরে এলেন। লোহা-লক্কড়, কাঠ, রশি, হার্ডবোর্ডের বাক্স ইত্যাদি জিনিসে ভেতরটা ঠাসা।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে আয়ে মোয়ে যে ভুল করেছিল, ফো তা করতে রাজি নয়। ছোটখাট শরীর নিয়ে ধীরেসুস্থে উঠছে সে।

সিঁড়ির মাথায়, ল্যান্ডিঙে থামল ফো।

টাওয়ারের মাথা চারদিক খোলা। ওপরে অনেকগুলো কাঠের বীম আড়াআড়িভাবে ঝুলছে। প্রকাণ্ড ব্রোঞ্জের ঘণ্টাটা ঝুলছে সবচেয়ে মোটা বীম থেকে।

বাতাসে একটা দুর্গন্ধ। বাসা ছেড়ে শূন্যে ডানা মেলল এক ঝাঁক পাখি। ওগুলোকে লক্ষ্য করে এক পশলা গুলি করল ফো।

ছিন্নভিন্ন পাখির একরাশ রক্তাক্ত পালক শ্যাফট বেয়ে নিচে নামছে।

ঝাপসা কি যেন একটা ছুটে এল তার দিকে। বিদ্যুৎবেগে মাথাটা সরিয়ে নিল ফো। লোহার ছেনিটা তার মাথায় লাগাতে পারলেন না গুডফেলো। ওটা তাঁর আসলে ছোঁড়াই উচিত হয়নি। দেয়ালে বাড়ি খেলো ছেনি, শ্যাফটের নিচে নেমে গেল।

মৃদু হাসি ফোর ঠোঁটে।

রশি আর কাঠের স্তূপের ওদিকে গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছেন ফাদার ও হেডমাস্টার। ওদেরকে ঝাঁঝরা করা ফোর জন্যে কোন সমস্যাই নয়। তবে তার

আগে শিকারী বিড়ালের মত একটু মজা করতে ইচ্ছে হচ্ছে তার।

প্ল্যাটফর্ম ত্যাগ করল ফো, শ্যাফটের ওপর সেতুর মত লম্বা হয়ে থাকা একটা ক্যাটওয়াকে দৃঢ় পায়ে হাঁটছে। মাঝখানে পৌঁছে একবার থামল, পিঠে ঘষা খাচ্ছে ঠাণ্ডা ব্রোঞ্জের ঘণ্টা। ফাদার আর হেডমাস্টারের লুকিয়ে থাকা কোন কাজে এলো না, এখান থেকে ওদেরকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে, গুলি করলে সরাসরি লাগবে।

বেল টাওয়ারের নিচে পৌঁছে মুখ তুলে ওপরে তাকাল রানা। দেখতে পেল ফোকে। মার্কসম্যান হিসেবে প্রথম সারির হলেও, ওর মনে হলো এখান থেকে গুলি করা ঠিক হবে না। করলে খুব বাজে একটা জায়গায় গিয়ে ঢুকবে বুলেট। আর কি বিকল্প আছে খুঁজতে গিয়ে চোখে পড়ল চার্চ-বেলের দড়িটা।

প্রৌঢ় হেডমাস্টার গুডফেলো বৃদ্ধ ফাদার বেঞ্জামিনকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা করছেন।

পরিস্থিতির নির্মম বাস্তবতা উপভোগ করছে ফো। 'ছি, ছি! তুমি যাজক হয়ে, ঈশ্বরের পেয়ারা বান্দা হয়ে মৃত্যুভয়ে কাঁপছ ঠকঠক করে! আরে ব্যাটা বুড়ঢা, এত লম্বা জীবনে চুপিচুপি কিছু পাপ তো করেছিসই, ঈশ্বরের কাছে তাড়াতাড়ি মাফ চেয়ে নে।'

'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করবেন!' বিড় বিড় করলেন ফাদার।

'তোমার ঈশ্বরের এই ঘরে আমি আগুন দেব, পাদ্রি ব্যাটা।'

বেল টাওয়ারের নিচে, মেঝে থেকে ওপর দিকে লাফ দিল রানা। ঝুলন্ত মোটা রশিটা দু'হাতের ভেতর চলে এল। শরীরের সব শক্তি এক করে টান দিল তাতে।

অকস্মাৎ সচল হলো প্রকাণ্ড বেল।

ওটার দোল খাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফো। এক ধাক্কায় ক্যাটওয়াক থেকে খসিয়ে দিল তাকে চার্চের ঘণ্টা।

শ্যাফটের মধ্য দিয়ে নিচে টেনে নিচ্ছে এবার মাধ্যাকর্ষণ।

গোলাগুলি থেমে যাওয়ায় পরিবেশটা নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল।

ফোর রোমহর্ষক আর্তনাদ আর পতনের শব্দ সেই নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিল।

চার্চের কোণ ঘুরে কে যেন টলতে টলতে আসছে। নিজের দলের লোক, চিনতে পেরে ট্রিগারের আঙুলটায় ঢিল দিল মায়াতকা থুয়ে।

ওর নাম পুয়ে, রাইফেলম্যান; ছেনি দিয়ে যার হাতটা গুঁড়িয়ে দিয়েছেন গুডফেলো। গোঙাচ্ছে, চোখে পানি, কোন রকমে নিজেকে টেনে আনছে গেটের দিকে। 'চলুন! পালাই!'

'আর সবাই?'

'নেই! কেউ নেই! এখনও সময় আছে, চলুন। এই, তোমরা কি চাও এখানে?'

পুয়ের আতঙ্কিত দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ফেরাল থুয়ে। গেট দিয়ে পিলপিল করে ভেতরে ঢুকছে শহরের মানুষ। সব মিলিয়ে একশোর কম হবে না। থুয়ে আর পুয়ের বিস্ময়ের ধাক্কা কাটল না, লোকগুলো ঘিরে ধরল তাদেরকে।

লোকগুলো উত্তেজিত নয়। অন্তত তাদের চেহারায় রাগ বা আক্রোশের কোন প্রকাশ নেই। চোখে মুখে দৃঢ় একটা ভাবই শুধু লক্ষ করা গেল।

রাইফেল, পিস্তল কোন কাজেই এল না। থুয়েকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিল জনতা। আরেক দল লোক পুয়ের পা ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

শহরের উপকণ্ঠে পাশাপাশি অনেকগুলো কুয়া আছে। চোর-ডাকাতদের ধরতে পারলে এলাকার লোকজন তাদেরকে এই কুয়ায় ফেলে। প্রতিটি কুয়ার ভেতর বিষাক্ত সাপ আছে।

বামপন্থী কবি মায়াতকা থুয়ে আর তার শিষ্য হাপুস নয়নে কান্নাকাটি করলেও জনতার হৃদয়ে এতটুকু করুণার উদ্রেক হলো না। ডাকাতদের বেলায় যা করা হয় না, অতিরিক্ত সাবধানতা হিসেবে এদের দু'জনের বেলায় তা করা হলো। কুয়ায় ফেলার আগে দু'জনের হাত ও পা এক করে রশি দিয়ে বেঁধে নিল তারা।

দালান থেকে বেরিয়ে এসে চার্চের ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে রানা। জনতার মিছিল থুয়ে আর পুয়েকে কি রকম জামাই আদরের সঙ্গে তুলে নিয়ে গেল দেখেছে ও। ওদেরকে নিয়ে কি করা হবে ওর জানা নেই, তবে এ ব্যাপারে মনে কোন সন্দেহ নেই যে জনতার বিচার নির্মম হলেও অযৌক্তিক হবার সম্ভাবনা খুব কম।

খরচ হওয়া ক্লিপ ফেলে দিয়ে ল্যুগারে নতুন একটা ভরতে যাচ্ছে, কিন্তু সুযোগ পেল না।

'ওটা এখন আর আপনার দরকার নেই, সুব্রত বাবু।'

ধীরে ধীরে ঘুরল রানা, একহাতে ল্যুগার, অপরহাতে ক্লিপ।

চার্চের ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে মেজর আউং, হাতের অস্ত্র রানার দিকে তাক করা। 'আমারটা লোড করা।'

'আপনার সুহৃদরা কাজটা লেজেগোবরে করে ফেলেছে, মেজর আউং।'

'ত্রুটি-বিচ্যুতি সব আমি শুধরে নেব। না, ওদেরকে আমার বন্ধু বলবেন না, প্লীজ। ওরা দুষ্কৃতকারী–গুণ্ডা-বদমাশ-খুনী ও কমিউনিস্ট। ওদের বাঁচার কোন অধিকার নেই।'

'তবু ভাল যে অন্তত একটি বিষয়ে আমরা একমত হতে পারছি।'

'আমার জানা ছিল ওরা আপনার হাতে নিশ্চিহ্ন হবে। সেজন্যেই ওদেরকে জানিয়ে দিই কোথায় আপনাকে পাওয়া যাবে। সত্যি কথা বলতে কি, আপনি আমার খুব উপকারী হাতিয়ার হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন। কি জানেন, আন্তরিকভাবে কারও প্রশংসা করার ভান করা যায় না। যে কথাটা বলতে চাই–মাসুদ রানা নিজের সুনামের প্রতি অবিচার করেনি। আপনি আমাদেরকে ঋণী করে রাখলেন।'

'আমাদেরকে?'

‘সরকারী, প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক আর কূটনৈতিক মহলে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান এক দল মানুষ, যাদের নাম আপনার কাছে অর্থহীন। তারা কোন অবস্থাতেই চান না পুরনো ক্ষত খোঁচানো হোক।’

‘আরও চায় না দেশের মানুষ জানুক মাটি খুঁড়ে পাওয়া প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট বিক্রি করে কোটি কোটি ডলার ওরা নিজেদের পকেটে ভরেছে, আর সেই গোপন তথ্য গোপন রাখার জন্যে একের পর এক মানুষ খুন করতেও তাদের বাধেনি।’

‘হ্যাঁ, আমি তাঁদের কথাই বলছি।’ মাথা ঝাঁকাল মেজর আউং। ‘তাঁরা আপনার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন, মি. মাসুদ রানা। এক অর্থে দুঃখজনক অপচয়, স্বীকার করছি; এসপিওনাজ জগতে আরেকজন মাসুদ রানা আবার কবে জন্মাবে, আদৌ জন্মাবে কিনা, কে জানে! আবার আরেক অর্থে, নেসেসারি; তা না হলে তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না।’

‘আপনার কৌতুক আপনি একা উপভোগ না করে রস আস্বাদনের সুযোগ আমাকেও একটু দিন না, মেজর।’

‘গোটা ব্যাপারটার মধ্যে শুধু কৌতুক নয়, খানিকটা প্রহসনও আছে, মি. রানা। দশ বছর পর আপনি এখানে এসেছেন ড. মুহিত হায়দার নামক ধাঁধার সমাধান করতে। হয়তো আজ থেকে দশ বছর পর অন্য কেউ একজন আসবে মাসুদ রানার অন্তর্ধান রহস্য মীমাংসা করার জন্যে।’

‘ধাঁধাটা এখন আর ধাঁধা নেই, মেজর আউং,’ বলল রানা। ‘আমি তার সমাধান পেয়ে গেছি।’

‘আমি জানতাম আপনি পাবেন।’

‘সমাধানটা আপনিও আন্দাজ করতে পেরেছেন। সেজন্যেই আবার ফিরে এসেছেন পুতাপাইয়ে।’

‘ব্যাপারটা বুঝতে সময় লেগেছে আমার। দুটো কবর, এর কোন তাৎপর্য প্রথমে আমার কাছে ধরা পড়েনি। তারপর রেকর্ড চেক করতে গিয়ে দেখি প্লেনে মানুষ ছিল দু'জন নয়, তিনজন। তিনজন মানুষ—পাইলট, কো-পাইলট, এবং ড. মুহিত হায়দার। এবং এখন আমি জানি কবর দুটোয় শুয়ে আছে পাইলট আর কো-পাইলট।’

‘তাহলে আপনি এ-ও জানেন যে ড. মুহিত হায়দারের কপালে কি ঘটেছে।’

‘হ্যাঁ, জানি। তাঁকে আবার হারিয়ে যেতে হবে। তাঁর সঙ্গে আপনিও হারিয়ে যাবেন।’

চার্চের ভেতর থেকে কাদের যেন গলা ভেসে এল। ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাল মেজর আউং। তারপর রানার দিকে ফিরে বলল, ‘ওঁরা আসছেন··না, নড়বেন না! আর মাত্র এক মিনিট আয়ু আছে আপনার। বোকার মত কিছু করে সেটাকে আরও কমাবেন না।’

‘চাইলেও কি আমার কিছু করার আছে? আমার অস্ত্র যে খালি সে তো আপনি জানেনই।’

‘ইউনিক—আপনার এই ল্যুগার। আমার ট্রফি কেসে অত্যন্ত মর্যাদার আসন

দেয়া হবে ওটাকে।'

'এটা এখন আর আমার কোন কাজে আসছে না,' বলে ল্যুগার ও ক্লিপ ফেলে দিল রানা। ছুঁড়ল না, স্রেফ ছেড়ে দিল।

কাজটায় কোন হুমকি নেই, কাজেই গুলি করল না আউং। তবে তার মনোযোগ বিচ্যুত হয়েছে।

যেই মাত্র তার দৃষ্টি ল্যুগারের দিকে ছুটে গেল, অমনি কব্জি ঝাঁকিয়ে স্প্রিং লাগানো খাপ থেকে ছুরিটা হাতে নিল রানা। হাতে আধ সেকেন্ডও থাকল না ওটা, ছুটে গেল আউঙের দিকে।

আউঙের ভুরু বিস্ময়ে একজোড়া ধনুক হয়ে গেল। চোখ নামিয়ে তাকাতে দেখতে পেল, ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর বুক থেকে একটা ছুরির হাতল বেরিয়ে আছে। যেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই দড়াম করে পড়ল সে মেঝেতে। তারপর বার কয়েক হাত-পা ছুঁড়ে স্থির হয়ে গেল।

মায়া মালহারকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল রানা। ফালাম আর্কিওলজিকাল প্রজেক্ট থেকে লাভবান দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মকর্তাদের সম্ভাব্য বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করছিল ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের পুলিস অফিসার মেজর ইয়ে আউং।

ধাপের ওপর ঢলে পড়ছে আউং, এই সময় দালান থেকে বেরিয়ে এলেন ফাদার বেঞ্জামিন ও হেডমাস্টার গুডফেলো।

রানা এখন বুঝতে পারছে হেডমাস্টার ভদ্রলোককে এর আগে কোথায় দেখেছে। পাকা দাড়ি, লম্বা চুল ও দশটা বছর বিয়োগ করে তাঁর অবয়ব কল্পনা করতেই লন্ডনে ঋণীর দেখানো ফটোর সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া গেল।

ফাদার বেঞ্জামিন থরথর করে কাঁপছেন আতঙ্কে। বেসুরো কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি, 'কে আপনি? আমাদের কাছে কি চান?'

'আমি ড. মুহিত হায়দারকে নিতে এসেছি,' বলল রানা।

ফাদার বিমূঢ় ও দিশেহারা। রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বার কয়েক চোখ মিটমিট করলেন হেডমাস্টার। তারপর তিনি ম্লান একটু হাসলেন।

আঠারো

মিনহাজ চৌধুরী ফুঁসছেন আর তারিক মোস্তফা ফুলছেন।

'আপনাদের ক্যারিয়ার শেষ!' চিৎকার করছেন মিনহাজ। 'নিজেদের পায়ে কুড়ল মেরেছেন! জেল খাটতে না হলে মনে করতে হবে নেহাতই আপনাদের ভাগ্যের জোর!'

'এ স্রেফ পাগলামি! চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। গ্রহণযোগ্য একটাই ব্যাখ্যা আমি অফার করতে পারি–দু'জনেই আপনারা বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছেন,' রাষ্ট্রদত

তারিক মোস্তফা বললেন।

'শাট আপ,' বৃষ্টির গলা শান্ত।

তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু একটা আছে, দু'জনেই ওরা চুপ করে গেলেন।

ডিবির অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ও রাষ্ট্রদূতকে ইয়ানগনের বাংলাদেশ দূতাবাসের ছোট একটা কামরায় অন্তরীণ করা হয়েছে। মিলিটারি অ্যাটাশেই-এর দু'জন সশস্ত্র সহকারী দরজার বাইরে পাহারায় দাঁড়িয়ে আছে। মিলিটারি অ্যাটাশেইকে দেখা না গেলেও, আশপাশেই কোথাও আছেন তিনি–ঢাকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ নির্দেশ পাবার পর তাঁর অন্তত এই মুহূর্তে দূতাবাস ছেড়ে কোথাও যাবার কথা নয়।

'আপনাদের কারণেই আমার দু'জন লোককে কফিনে ভরে ঢাকায় ফেরত পাঠাতে হলো,' ঠাণ্ডা সুরে বলল বৃষ্টি। 'ব্যাপারটা যদি আমার ওপর নির্ভর করত, আপনাদেরকে আমি ফাঁসিতে ঝোলাতাম। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, আপনাদেরকে বাঁচিয়ে রাখাতেই দেশের লাভ। তবে ভাগ্যের ওপর খুব একটা ভরসা রাখতে নিষেধ করি আমি।'

রাষ্ট্রদূত তার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলেন, রক্তশূন্য ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাঁকে। 'বৃষ্টি, কার সঙ্গে কথা বলছেন আপনি জানেন?'

'জানি বৈকি। দু'জন বেঈমানের সঙ্গে। যারা গত দশ বছর ধরে দেশের গোপন তথ্য শত্রুরাষ্ট্রে পাচার করছে।'

'আর কোন কথাই বলবেন না,' রাষ্ট্রদূতকে বললেন ডিবির অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। 'ওদেরকে নিজেদের কবর খুঁড়তে দিন। আমি দেখতে চাই, চড় খেয়ে হুঁশ ফেরার আগে কত বাড় বাড়ে ওরা।'

রানা হেসে উঠল। 'আমি ভাবছি পাঁচ মিনিট পর কেমন দেখাবে আপনাদের।'

'ও, তাই?' চোখ গরম করে তাকালেন মিনহাজ। 'পাঁচ মিনিট পর কি ঘটবে?'

'ধরুন আপনাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে।'

'রাবিশ!'

'আপনি শুধু আবর্জনা নন, চৌধুরী, আপনি আসলে দূষিত বর্জ্য। আইন, পুলিস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়–তিন তিনটে বিভাগে ঢোকার সুযোগ করে নিয়ে যেখানে যত গোপন তথ্য আছে সব আপনি দশ বছর ধরে পাকিস্তানে পাচার করেছেন। তবে এবার আপনার ভাগ্য বেঁকে বসেছে।'

'সময় থাকতে হেসে নিন, রানা। আপনার শেষ তো আমি দেখবই।'

'মরা মানুষ কিন্তু সব সময় কবরে থাকে না, চৌধুরী।'

'আপনার এ-কথার মানে কি, রানা?' কর্কশ গলায় জানতে চাইলেন তারিক মোস্তফা।

'চলুন, দশ বছর অতীতে ফিরে যাই,' শুরু করল রানা। 'ফালাম আর্কিওলজিকাল প্রজেক্ট থেকে পাওয়া গেল প্রায় দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের

প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট। সেগুলো মেরে দিয়ে একদল সরকারী কর্মচারী ধনকুবের বনে গেল। তাদের নাম ও পরিচয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ-দেশে সামরিক কর্মকর্তারা দেশ চালাচ্ছে, তারাও নব্বই ভাগ অসৎ, কাজেই ওই ধনকুবেররা অংসান সুকি বা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মাথাব্যথা। গুরুত্বপূর্ণ হলো, প্রাচীন ওই আর্টিফ্যাক্ট কারও সাহায্য ছাড়া তারা লুট করতে পারত না। প্রথম বাধা হয়ে দেখা দেন ড. মুহিত হায়দার। লুটের ভাগ নিয়ে মায়ানমারের জনগণের সঙ্গে বেঈমানী করতে তাঁকে রাজি করা যাচ্ছিল না। সমস্যা আরও ছিল। তারা লুট করতে চাইল কোন প্রমাণ না রেখে।

'তাদেরকে সাহায্য করল ফালাম ড্যাম প্রজেক্টের পাকিস্তানী এঞ্জিনিয়ার এবং রোহিঙ্গা গেরিলা বাহিনীর ট্রেনার ও উপদেষ্টা আইএসআই এজেন্টরা। পাকিস্তানী ও রোহিঙ্গাদের রাজনৈতিক স্বার্থ তো ছিলই, উপরি হিসেবে লুটেরও ভাগ পাবার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

'টাকার গন্ধ পেয়ে এবার আমাদের তরফের লোকজনও হাজির হলো ফালামে। ইচ্ছে করলে সরকারী গ্রুপ, রোহিঙ্গা গেরিলা আর আইএসআইকে লুটপাট করতে বাধা দিতে পারত তারা, কিন্তু বাধা দেয়া তো দূরের কথা, তারা সাহায্য করার বিনিময়ে লুটের ভাগ চেয়ে বসল। সেই সঙ্গে হুমকি দিল, ভাগ না পেলে সব তারা ফাঁস করে দেবে।

'দুটো শর্ত দিয়ে আমাদের লোকের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল আইএসআই। প্রথম শর্ত, প্রথম বাধা অপসারণ অর্থাৎ ড. মুহিত হায়দারের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত, বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইএসআই-এর দু'জন চর ঢোকাতে হবে। আমাদের, বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রতিনিধিরা মেনে নিল তাদের শর্ত।

'আমাদের লোকেরা এরপর উঠে পড়ে লাগল আইএসআইকে সাহায্য করতে। থিরি হাটাইক নামে দুর্ধর্ষ এক ডাকাত সর্দারকে ভাড়া করল তারা ড. হায়দারের প্রেমিকা মায়া মায়া মালহারকে কিডন্যাপ করার জন্যে। মায়া মালহার খুন হয়ে যাবে, এটা বোঝানো গেলে ড. হায়দার লুটের সময় চোখ বুজে থাকতে রাজি হবেন। তাদের সময় দরকার ছিল মাত্র দু'একটা দিন। আইএসআই নির্দেশ দিতে যা দেরি, রোহিঙ্গা গেরিলারা ডিনামাইট ফাটিয়ে উড়িয়ে দেবে ড্যামটা। ঘটনাটা ঘটলেই বলার সুযোগ পাওয়া যাবে—যদি কোন আর্টিফ্যাক্ট আবিষ্কৃত হয়েও থাকে, বাঁধ ভাঙা পানির তোড়ে সব ভেসে গেছে। লুটপাটের কাজটা তো আগে নির্বিঘ্নে শেষ হোক, তারপর ড. হায়দার আর মায়া মালহারের স্থায়ী ব্যবস্থা করা যাবে।

'প্রেমিকার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে লুটেরাদের সামনে বসে মিথ্যে একটা রিপোর্ট লিখলেন ড. হায়দার। রিপোর্টে তিনি স্বীকার করলেন, যদিও আলামত দেখে তাঁর মনে হয়েছিল ফালাম থেকে প্রাচীন মং সাম্রাজ্য ও প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার বিপুল আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া যাবে, কিন্তু বাস্তবে কিছুই তিনি আবিষ্কার করতে পারেননি। লুটেরারা তাঁকে এই রিপোর্ট ইয়ানগনের সরকারী দফতরে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ

দেয়।

'এখানেই ভাগ্য তাদের অনুকূলে চলে আসে। এরপর এমন একটা ঘটনা ঘটল, যা তাদের প্ল্যানে ছিল না। মিথ্যে রিপোর্টটা ইয়ানগনে নিয়ে যাবার সময় ড. মুহিত হায়দারের প্লেন ক্র্যাশ করল।

'মায়া মালহারের প্রয়োজন ফুরাল, কাজেই তাকে আর বাঁচিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। তাকে খুন করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হলো থিরি হ্যাটাইককে। সে আর ড. হায়দার পথ থেকে সরে যেতে বাকি থাকল রোহিঙ্গা গেরিলাদের ফাঁকি দেয়ার কাজ। পাঁচ ট্রাক ভর্তি আর্টিফ্যাক্ট দেয়া হলো তাদের, বলা হলো ট্রাক নিজেদের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে কাঠের বাক্স নামাবে তারা, এবং তার আগে ডিনামাইট ফাটিয়ে ড্যামটা উড়িয়ে দিতে হবে।

গেরিলারা যথাসময়েই উড়িয়ে দিল ড্যাম। তার আগে লুটেরারা সমস্ত আর্টিফ্যাক্ট সরিয়ে এনে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে। ড্যাম উড়িয়ে দেয়ার পর গেরিলারা দেখল ট্রাকের মাত্র দু'চারটে বাক্সে সামান্য কিছু আর্টিফ্যাক্ট আছে, বাকি সব বাক্সে পাথর ভরা। বেশ কিছু দিন ধরেই আইএসআই-এর সঙ্গে স্থানীয় কিছু গেরিলা নেতার বিরোধ চলছিল, তারা অভিযোগ করল ওই নেতারাই চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছে। রাগে অন্ধ গেরিলারা তাদের কয়েকজন নেতাকে গণপিটুনি দিয়ে মেরেই ফেলল। এই হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দিল গেরিলাদের মধ্যে কমিউনিস্ট বলে পরিচিত ম্যায়াতকা থুয়ে ও আয়ে মোয়ে।'

কফির কাপে চুমুক দেয়ার জন্যে থামল রানা। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তবু গলা ভেজাবার কাজে লাগল।

রাষ্ট্রদূতকে মনে হচ্ছে একঘেয়েমির শিকার। মিনহাজ চৌধুরী চেহারায় স্তম্ভিত একটা ভাব নিয়ে বসে আছেন, যেন এরকম অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য কাহিনী জীবনে আগে কখনও শোনেননি তিনি।

'আমার কাহিনী প্রায় শেষ,' আবার বলল রানা। 'উপসংহার টানার আগে দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আইএসআই বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ডিবিতে নিজেদের দু'জন লোক ঢোকানোর পর অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে আমাদের। বৈদেশিক নীতি, সিদ্ধান্ত ও তথ্য, সবই দশ বছর ধরে নিয়মিত পাচার হয়ে গেছে। আরও ফাঁস হয়েছে দেশের আইনশৃংখলা সম্পর্কে পুলিস বিভাগের পরিকল্পনা, টপটেররদের গোপন তালিকা ইত্যাদি।'

'ওদের নাম বলুন, মাসুদ ভাই,' তাগাদা দিল বৃষ্টি। 'আইএসআই এজেন্ট কারা?'

'তারিক মোস্তফা আর মিনহাজ চৌধুরী।'

দু'জনেই ওঁরা একযোগে বিস্ফোরিত হলেন, প্রতিবাদ আর অস্বীকারের ঝড় বইয়ে দিচ্ছেন।

এক পা পিছিয়ে এসে বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। কয়েক মিনিট ওঁদেরকে প্রলাপ বকার সুযোগ দিল ও, তারপর বৃষ্টিকে জিজ্ঞেস করল, 'ওদের মুখ থেকে আর কিছু শুনতে বাকি আছে তোমার?'

'প্রয়োজনের চেয়ে বেশি শোনা হয়ে গেছে,' জবাব দিল বৃষ্টি।

'তাহলে আমাদের সারপ্রাইজ গেস্টদের ভেতরে আনো, প্লীজ।'

'স্রেফ ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, মিথ্যে অভিযোগ!' তারিক মোস্তফা এখনও বলে চলেছেন। 'আমার নিষ্কলুষ চরিত্রে কালিমা লেপনের নোংরা একটা ষড়যন্ত্র মাত্র। স্বার্থান্বেষী মহল...'

মিনহাজ চৌধুরীও চালিয়ে যাচ্ছেন, 'এর জন্যে তোমাকে চড়া মূল্য দিতে হবে, রানা। খোদার কসম বলছি, তোমার আমি বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব!'

বৃষ্টি কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, এখন সে ফিরে আসছে। তবে একা নয়। তার পিছু নিয়ে অপরূপ সুন্দরী এক ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন। তাঁর পরনে কালো ড্রেস।

কেউ যেন বোতাম টিপে দু'জনের চিৎকার-চেঁচামেচি থামিয়ে দিল। দু'জনেই তারা হাঁ করে জ্যান্ত হয়ে ওঠা মৃত অতীতের দিকে তাকিয়ে আছেন।

'বোঝা গেল আপনারা দু'জন মায়া মায়া মালহারকে ভুলে যাননি,' বৃষ্টির গলা একটু তীক্ষ্ণ শোনাল।

'না-না। এ অসম্ভব! তুমি মারা গেছো!' মিনহাজ হাঁপাচ্ছেন।

ঝট করে তার দিকে ফিরে গর্জে উঠলেন তারিক মোস্তফা, 'শাট আপ, ইউ ফূল!'

ঘরে আরেকজন ঢুকল।

তিনি পুতাপাই মিশনারি স্কুলের হেডমাস্টার গুডফেলো। তাঁর লম্বা চুল কেটে ছোট করা হয়েছে। দাড়ি নেই, নিখুঁত ভাবে কামানো গাল। টাই ও সুট পরে আছেন।

'ড. হায়দার!' কুঁকড়ে চেয়ারের পিছন দিকে সরে গেলেন তারিক মোস্তফা, যেন অকস্মাৎ ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। 'অসম্ভব! এ সত্যি নয়। এ সত্যি নয়!'

মায়া মালহার ও ড. হায়দারকে দেখার জন্যে ওই বেঈমানকে মাত্র এক মিনিট সময় দিল রানা।

বৃষ্টির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ও। মায়া মালহার আর ড. হায়দারকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে। মায়া মালহার বা ড. হায়দার, কেউ কোন কথা বললেন না।

সশস্ত্র প্রহরীরা মিনহাজ চৌধুরী আর তারিক মোস্তফাকে দুটো আলাদা কামরায় নিয়ে গেল, সামরিক অ্যাটাশেই আর তার সহকারীরা ওদেরকে ইন্টরোগেট করবেন।

দুই বেঈমান নিজেদের সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে জবানবন্দী দিতে রাজি হলো। তাদের স্বীকারোক্তি শেষ হতে রাত প্রায় কাবার হয়ে যাবে।

বৃষ্টি আর থুইন গাড়ি করে রানাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিচ্ছে।

'মজার ব্যাপার হলো,' বলল রানা, 'নিজেদের দাবিতে শেষ পর্যন্ত অটল

থাকতে পারলে মিনহাজ ও মোস্তফাকে কাঠগড়ায় তোলা সম্ভব হত না। মায়া মালহার দু'জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি ছাড়া তাঁর পক্ষে কোন সাক্ষী নেই। ডিবির একজন জাঁদরেল কর্মকর্তা আর মর্যাদাবান একজন রাষ্ট্রদূতের বিরুদ্ধে এক ডাকাত সর্দারের স্ত্রীর কথা কে বিশ্বাস করত।'

'তা ঠিক, কিন্তু ড. হায়দার?' জিজ্ঞেস করল বৃষ্টি। 'মায়া মালহারের প্রতিটি অভিযোগ সত্য বলে সাক্ষ্য দিতে পারতেন তিনি।'

রানা প্রশ্ন করল, 'ড. হায়দারের মত একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি বিদেশের অখ্যাত এক মিশনারি স্কুলে দশ বছর ধরে মাস্টারি করছেন কেন?'

'এটা আমার কাছে বিরাট একটা রহস্য!'

'কারণ হলো, নিজের পরিচয়ই তিনি জানেন না। প্লেন ক্র্যাশে শারীরিকভাবে বেঁচে গেলেও, মানসিক দিক থেকে ভদ্রলোক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। দুর্ঘটনার সময় মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন, সেই থেকে অ্যামনেযিয়ায় ভুগছেন। অতীতের কোন ঘটনাই তাঁর মনে নেই, নিজের পরিচয় যদিও জানেন না, লেখাপড়া মোটেও ভোলেননি। স্থানীয় বার্মীজরা তাঁকে বন-জঙ্গলে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াতে দেখে ধরে এনে পাদ্রীর হাতে তুলে দেয়। পুতাপাই চার্চে সে-সময় পাদ্রী ছিলেন একজন শ্বেতাঙ্গ। তিনিই নাম রাখেন গুডফেলো। অস্বাভাবিক ধারাল ব্রেন, অল্প দিনেই বার্মীজ ভাষা শিখে ফেললেন ড. হায়দার। ইংরেজি সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি সাবজেক্টে রীতিমত পণ্ডিত মনে হলো তাঁকে। পাদ্রী তাঁকে স্কুলে পড়াবার দায়িত্ব দিলেন। অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করলেন তিনি। দু'বছরের মাথায় ওই স্কুলের হেডমাস্টার করা হলো তাঁকে।'

'অবিশ্বাস্য!' বলল বৃষ্টি। 'কিন্তু আপনি তাঁর আসল পরিচয় উদ্ধার করলেন কিভাবে?'

'কাজটা সহজ হয়নি।' হাসল রানা। 'হেডমাস্টারকে প্রথমবার দেখে আমার মনে হলো, ভদ্রলোককে আগে যেন কোথাও দেখেছি। কিন্তু মনে করতে পারিনি। প্রথম সূত্র পেলাম চার্চের কবরস্থান থেকে। প্লেনে লোক ছিল তিনজন, কিন্তু কবর মাত্র দুটো। ঠিক, সনাক্ত ও পোস্টমর্টেম ছাড়া কবর দেয়ায় কোন দু'জনকে কবর দেয়া হয়েছে তা বোঝার উপায় নেই, তবে একজন যে বেঁচে গেছে এটা তো ঠিক। ভাবতে শুরু করলাম, কে সে? এই একই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যে মেজর আউংকেও আবার পুতাপাইয়ে আসতে হলো।'

'কিন্তু আপনি তাঁকে চিনতে পারলেন কিভাবে?'

'গুডফেলো নামে ওই ব্যক্তির সাবেক জীবন সম্পর্কে সচেতন কোন স্মৃতি ছিল না। কিন্তু অবচেতন? সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। ওরা যখন চার্চে হামলা চালাল, নিজের এবং ফাদার বেঞ্জামিনের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে কোত্থেকে জানি না ড. হায়দার একটা ছেনি যোগাড় করলেন। অস্ত্র হিসেবে ছেনি খুব একটা কাজের জিনিস নয়, তাহলে ওটাই কেন বেছে নিলেন তিনি? আমরা সবাই জানি, একজন আর্কিওলজিস্টকে সাইটে ছেনি হাতেই কাজ করতে হয়। আসলে পুরনো অভ্যাসটা তাঁর অবচেতন মন ভোলেনি, দেখামাত্র ওই ছেনিটাই তাঁকে দিয়ে

তুলিয়েছে। তাঁর হাতে ছেনি দেখেই আরও খুঁটিয়ে তাকাই আমি। তখনই চিনে ফেলি। ড. হায়দারের মেয়ে ঋণী বাবার ফটো দেখিয়েছিল আমাকে, চেনার পর সেই ফটোর সঙ্গে মিল খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হলো না।'

'শেষ একটা প্রশ্ন, মাসুদ ভাই,' বলল বৃষ্টি। 'প্লেনটা তো স্যাবোটাজ করা হয়েছিল, তাই না? যেই করে থাকুক, তার উদ্দেশ্য ছিল ড. হায়দারকে খুন করা। নাকি ব্যাপারটা স্রেফ দুর্ঘটনাই ছিল?'

'না, হত্যা প্রচেষ্টাই ছিল ওটা। এই রহস্যের সমাধান অনেক আগেই করেছিলেন মায়া মালহার।'

'কে? কে ড. হায়দারকে খুন করতে চেয়েছিল?'

'রায়হান সিদ্দিকী।' বলল রানা। 'ড. হায়দারের অতি বিশ্বস্ত ও অনুগত সহকারী।'

'রায়হান সিদ্দিকী...কিন্তু, মাসুদ ভাই, তা কি করে হয়! রায়হান সিদ্দিকী ড. হায়দারকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত, সে তাঁর ছাত্র ছিল...'

'রায়হান চায়নি তার শিক্ষক অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করুন। তার ধারণা ছিল সে ড. হায়দারের উপকার করছে। খুন হয়ে গেলে তো আর তিনি অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে পারবেন না। রায়হান সবই জানত। মায়া মালহারকে বাঁচাবার জন্যে ড. হায়দার মিথ্যে রিপোর্ট লিখে ইয়ানগনে নিয়ে যাচ্ছিলেন, আইএসআই যে শেষ পর্যন্ত ড. হায়দার ও মায়া মালহারকে খুন করবে, তা-ও সে আন্দাজ করতে পেরেছিল। সংক্ষেপে, সে দেখতে চায়নি তার আদর্শ শিক্ষক একটা মেয়ের জন্যে এত বড় অপরাধ করে বসেন।'

'রায়হানই তাহলে এয়ারস্ট্রিপে মেকানিককে প্লেন স্যাবটাজ করার জন্যে ভাড়া করেছিল?'

'হ্যাঁ। নিজের জন্যে ভালই একটা অ্যালিবাই তৈরি করেছিল রায়হান। এয়ারস্ট্রিপের কাছাকাছি এক শুঁড়ির দোকানে গিয়ে মদ খেয়ে মাতলামি শুরু করে সে, সবাই যাতে বিশেষভাবে লক্ষ করে তাকে। বাড়াবাড়ি করায় পুলিস তাকে গ্রেফতার করে। পরদিন হাজত থেকে ছাড়া পেয়েই ও মেকানিক লোকটাকে খুন করে।'

'ওহ্, গড!'

'যা বললাম তার বেশির ভাগই আন্দাজ করে বলা। এ-সব সত্যি বা মিথ্যে বলে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তবে মায়া মালহার নিশ্চিত। তিনি আমাকে যা বলেছেন আমি তা ভুলি কি করে। বলেছেন, ইচ্ছে করলেই নিজের লোকজনকে দিয়ে রায়হানকে খুন করাতে পারতেন, কিন্তু অপরাধবোধ নিয়ে বেঁচে থাকতে দেয়াটাই তার উপযুক্ত শাস্তি বলে মনে করেন তিনি।'

'রায়হান এখন কোথায়, মাসুদ ভাই?'

'ওই মদই তাকে শেষ করেছে। শেষ দিকে ভাত, পানি কিছুই ছুঁতো না, সারাক্ষণ মদ খেত। দেশেও কোনদিন ফেরেনি। লিভার সিরোসিসে দু'বছর হলো মারা গেছে।'

অনেকক্ষণ আর কোন কথা হলো না। দু'জনেই যে যার ব্যক্তিগত চিন্তায় ডুবে থাকল।

অনেকক্ষণ পর নিস্তব্ধতা ভেঙে রানা বলল, 'একটা কাজের কথা ভুলে যাব। সেই মেয়েটাকে, রুজকে, বলবে সময়ের অভাবে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। বলবে, যারা তার জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারত তারা কেউ বেঁচে নেই। এখন সে সেফ হাউস থেকে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে যেতে পারে।'

'ঠিক আছে, বলব।' মাথা ঝাঁকাল বৃষ্টি। 'আপনি কিন্তু লন্ডনে পৌঁছেই রিপ্লেসমেন্টের ব্যবস্থা করবেন। আমি একা সব দিক সামলাতে পারব না।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' হঠাৎ হাসল রানা। 'আরেকটা কথা, বৃষ্টি। এবার যাদেরকে পাঠাব তারা তোমার বয়স, রুচি, শিক্ষা ও যোগ্যতার সঙ্গে বেমানান হবে না। আমি বলতে চাইছি, তাদেরকে অন্তত একটা সুযোগ দিয়ে দেখো। কে জানে, একজনকে হয়তো তোমার মনে ধরবে।'

'ধন্যবাদ, মাসুদ ভাই।' হেসে উঠল বৃষ্টি। সেটা জোর করে কিনা বলা মুশকিল। 'এড়িয়ে যাবার আপনার এই কৌশলটা শিখে রাখলাম, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।'

রানা কিছু বলতে গিয়েও বলল না। ওর আসলে কিছু বলার নেইও।

***